রত্নাকর

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ত্তিক, ১৩২৭

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

সাধনা লাইব্রেরী

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর শেঠ
২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

ভারতের অদ্বিতীয় সঙ্গিতাচার্য্য
শ্রীদেবু কণ্ঠ সরস্বতী প্রণীত

দেব-বীণা

বাহির হইতেছে
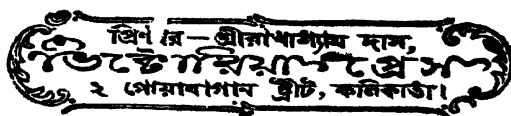
উৎসর্গ

সুপ্রসিদ্ধ তালুকদার, কমলার প্রিয়পুত্র,

সাহিত্য-সেবী, পরোপকার ব্রতধারী,

উন্নতহৃদয়, আদর্শ চরিত্র

আমার পরম সুহৃদ

শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মজুমদারের করকমলে

আমার আন্তরিক ভালবাসার

নিদর্শন স্বরূপ

রম্ভাকুর

উৎসর্গীত

হইল।

গ্রন্থকার।

রত্নাকর

দাদা-ভাই

"ভজন" "পূজন" দুটী ভাই। ভায়ে ভায়ে ভারি ভাব, আন্তরিক ভালবাসা,—এমনটী আজকালের দিনে বড় একটা দেখা যায় না। শয়নে-জাগরণে—আহারে-বিহারে—আমোদে-প্রমোদে—সুখে-দুঃখে—হাটে-মাঠে—পথে-ঘাটে—নিশিদিন কেহ কাহাকেও নিমেষের জন্য চোখের আড়াল করিয়া থাকিতে পারে না। ভাই দুটিকে দেখিলে, কেহ বলিত—"আহা! যেন রামলক্ষ্মণ।' কেহ বলিত—"মরি মরি! যেন গৌরনিতাই।" কেহ বলিত—"যেন জোড়া কার্ত্তিক।" ভাবুকে বলিত—"যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল।" রসিকা রামার মা বলিত—"যেন বেন্দাবোনের রাধাকেষ্টো।" (অবশ্য—এ উপমায় একটু ব্যাকরণদোষ ঘটে, অশিক্ষিতা রামার-মা অত-শত তলাইয়া বুঝিত না, আর রামার মার মুখে কথাটা বড় মিষ্ট লাগিত।) তা' ছাড়া, দুঃ

চারজন পাড়া-প্রতিবাসী "বখা-ছোক্‌রা" বলিত—"যেন পয়সা-জোড়া খাস্তার ক'চুরী !"

রতিকান্ত ঘোষাল একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। রাজগ্রামে তাঁহার আদি নিবাস; কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে কলিকাতায় বাস। রতিকান্তের অবস্থা পূর্ব্বে অত্যন্ত হীন ছিল; কোনও সওদাগরি অফিসে ওজন-সরকারি কার্য্য করিতেন। ক্রমে পাটের দালালীতে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশে জমিদারী কিনিয়া—প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, বাগান, পুষ্করিণী ইত্যাদি ফাঁদিয়া—'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' করিয়া, রাজগ্রামের একজন রীতিমত জমিদার হইয়া বসিয়াছেন। "ভজন পূজন" তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের "যুগল পুত্ররত্ন"। গৃহিণী অনেকগুলি কন্যা প্রসব করিয়াছেন,—রতিকান্তের তাই চিরদিন তাঁহার প্রতি বিরাগ। সতীসাধ্বী শেষ দশায় বৎসর তিনেকের মধ্যে স্বামীর কোলে "ভজন পূজনকে" উপহার দিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বৃদ্ধ রতিকান্ত "ভজন পূজন" বলিতে যেন অজ্ঞান হইয়া প'ড়তেন। তাহারা যে তাঁহার বৃদ্ধবয়সের নয়নমণি! অন্ধের নড়ি!

ধনবান্ রতিকান্ত ইচ্ছা করিয়াই কলিকাতায় কোনও বিষয় আশয় করেন নাই। "সহর বড় খারাপ জ্যায়গা! এখানে লোকে পরের টাকা-কড়ি, বিষয়-আশয় দেখিলেই, যেমন ক'রে হৌক্—একদিন না একদিন ঠকিয়ে ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ ক'রে

নেবে ;—আমাকে না পারুক্, আমার ছেলেদের—কিম্বা তাদের ছেলেদের—কিম্বা তাদের ছেলের ছেলেদের নিশ্চয়ই ঠকাইবে।" বৃদ্ধ যখন তখন এই সকল কথা আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের নিকট বলিতেন। "সহুরে" জুয়াচোরদিগের ভয়ে তিনি কলিকাতায় সামান্য গৃহস্থের মতন একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে মাসিক ২৭॥০ টাকা ভাড়া দিয়া দুইটি পুত্র লইয়া থাকিতেন। "ভজন পূজন" পিতার খুব কড়া-নজরের উপর থাকিত। সমবয়স্ক কোনও বালকের সহিত মিশিতে পাইত না।

স্কুলে দুটী ভাই একত্রে যাইত, ক্লাশে পড়ার সময় পাশাপাশি বসিত, জলখাবারের ছুটী হইলে গলা ধরাধরি করিয়া বেড়াইত, এবং বাড়ী ফিরিত এক সঙ্গেই। ভজন বড়—সুতরাং "দাদা", পূজন দেড় বছরের ছোট,—আদরের "ভাই!" মাষ্টার পণ্ডিত তাহাদের তফাৎ হইয়া বসিতে বলিলেই অগ্রে ছোটটী কাঁদিয়া ফুকারিয়া উঠিত—"দাদা!" সুরে সুর মিশাইয়া বড়টীও ডাকিত—"ভাই!" মাষ্টার পণ্ডিত মহাবিভ্রাটে পড়িতেন।

রতিকান্ত বড় হিসাবী লোক,—একটী পয়সা তাঁহার বাজে খরচ হইবার জো নাই। গৃহিণীর পরলোকগমনের পর—ছেলে দুটীকে মানুষ করিবার জন্য তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক অনাথিনী অবীরা শ্যালিকাকে কলিকাতার বাসায় আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া রতিকান্তের খুড়ী তাঁহার সংসারে রন্ধনকার্য্য, বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া, ঘরনিকানো, জলতোলা প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্য্য করিয়া তবে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেন। রতিকান্ত খতাইয়া দেখিয়াছিলেন,—দাসী-রাঁধুনী প্রভৃতি রাখিলে ইহা অপেক্ষা তিনগুণ ব্যয় হইত; অথচ—তাহাদের উপর জোর খাটিবে না—বিশ্বাস নাই; কলিকাতায় ঝি-চাকর-বামুন আজ আছে, কাল নাই। প্রথম প্রথম রতিকান্তের কন্যাবর্গ যখন তখন শ্বশুরবাটী হইতে পিতৃ-আবাসে আসিয়া থাকিত। রতিকান্ত কিন্তু আদৌ সেটা পছন্দ করিতেন না। তিনি স্পষ্টই কন্যাদের মুখের উপর বলিতেন,—"রাশিরাশি টাকা খরচ করে বিয়ে দিলুম, তা'তেও নিশ্চিন্তি নেই! আবার হুট্ ব'লতেই বাপের বাড়ী এসে থাকা? মেয়েবেটীদের যদি বাপ-মায়ের ওপোর একর'ত্ত দয়ামায়া আছে!" পিতার এরূপ স্পষ্টবাদিতে কোন্ কন্যা সহজে আর পিতৃগৃহে আসিতে চায়? এক বছর দু'বছর অন্তর বাপ-ভাইকে দেখিবার জন্য যখন প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিত—কেবল তখনই দুই এক দিনের জন্য আপনারাই গাড়ী ভাড়া দিয়া—যাচিয়া সাধিয়া পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত। রতিকান্ত তথাপিও অসন্তোষ প্রকাশে বিরত হইতেন না। কিন্তু যে কন্যাজামাতা আসিয়া আপনাদের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সারাসংসারটা চালাইত, তাহারা রতিকান্তের গৃহে একাদিক্রমে

এক বৎসর অতিবাহিত করিলেও তিনি ভুলিয়াও উচ্চবাচ্য করিতেন না—তিলমাত্রও আপত্তি করিতেন না।

"ভজন-পূজন" পুত্র দুইটী তাঁহার নয়নের তারা হইলেও তাহাদের জন্যও রতিকান্তের কোনও ব্যয়বাহুল্য ছিল না। রাজগ্রামে রতিকান্ত একজন বিপুল ধনশালী বলিয়া সর্ব্বজনপরিচিত হইলেও, কলিকাতায় সকলের নিকটেই চালচলনে আচারব্যবহারে পরিচয় দিতেন,—"বড় দুঃখ আমি! আহা! ছেলে দুটীও আমার কাঙ্গাল!" এই মহার্ঘের বাজারে রতিকান্তের দৈনিক বাজারখরচ একটী বাঁধা আধুলী। ইহাতে পরিবারবর্গের এক বেলাই হউক, অথবা আধপেটাই হউক, তিনি সেদিকে ফিরিয়াও দেখিতেন না।

রতিকান্ত সন্ধ্যা হইলেই আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক সদর দরজা অর্গলবদ্ধ করিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া পুত্র দুইটীকে কাছে লইয়া বসিয়া থাকিতেন। সন্ধ্যার পর মাত্র আধ ঘণ্টা প্রদীপ জ্বালিবার হুকুম ছিল। সেই আধঘণ্টার মধ্যেই সাংসারিক সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। রতিকান্তের কাছে একটি দেশলাই থাকিত; বিশেষ আবশ্যক হইলে মাঝে মাঝে একটি কাটি জ্বালিয়া কার্য্যসাধন করিয়া লইতেন। পরিবারবর্গকে তিনি বলিতেন—"ভগবানের উপর কলমবাজী? খোদার উপর খোদ্‌গিরি! তিনি যখন অন্ধকার করিয়াছেন, তখন সে অন্ধ-

কার ঘুচাইয়া আলো করিবার দরকার কি ? তিনি কি আমাদের চেয়ে কম বোঝেন ? রাত্রে যদি আলো জ্বালিয়া কাজকর্ম্ম করা উচিত হইত, তাহা হইলে তিনি কি আর একটা "সূর্য্যি টুর্য্যি" রকমের জিনিষের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না ? খবরদার ! যতক্ষণ তাঁহার দেওয়া আলো থাকিবে—সব কাযকর্ম্ম সারিয়া নাও !" বিজ্ঞ রতিকান্তের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দরুণ সংসারে আলোকের খরচ আদৌ ছিল না। রতিকান্ত তেজারতি কারবার করিতেন, সন্ধ্যার পর কোনও ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার দরজায় মাথা খুঁড়িলেও তিনি বাটীর ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না,—অথবা দরজা খুলিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। তবে যখন বুঝিতেন কোনও ব্যক্তি সুদ দিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া—বাটীর সম্মুখস্থ গ্যাসের আলোকে দাঁড়াইয়া কার্য্য শেষ করিতেন।

এ হেন রতিকান্ত ঘোষালের কনিষ্ঠ জামাতা শশীভূষণ একবার বিজয়ার প্রণাম করিতে রাত্রি প্রায় নয়টার পর শ্বশুরবাটীর দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তা তখন ভজন-পূজন পুত্রদ্বয়কে লইয়া দ্বিতলের কক্ষে অন্ধকারে নামতা পড়াইতেছিলেন এবং মুখে মুখে সুদকসা ইত্যাদি হিসাব শিখাইতেছিলেন। শশীভূষণ সম্বন্ধীদের সাড়া পাইয়া উপরদিকে

চাহিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"ওহে ভায়ারা ? বলি,—ও ভজন, ও পূজন ! একবার দরজাটা খোলো !"

বিবাহের পর দুই একবার শশীভূষণের সহিত ভজন-পূজনের দেখা হইয়াছিল ; তাহারা ভগ্নীপতির গলার আওয়াজ বুঝিতে পারিল না। সহরের "খুনে-বাটপাড়" ভাবিয়া তাহারা ভয়ে দুইজনে পিতাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। রতিকান্ত ধীরে ধীরে জানালার নিকটে আসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?"

শশী। "আজ্ঞে আমি।"

রতি। "এত রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী 'আমি ?'—কে 'আমি' ?"

শশীভূষণ মহা অপ্রস্তুতে পড়িলেন। শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া দরজায় এই বিপত্তি হইবে তাহা তিনি কখনো ভুলেও ধারণা করেন নাই। শ্বশুর মহাশয়ের এরূপ কর্কশ প্রশ্নে হঠাৎ উত্তর করিতে না পারিয়া—মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,—"আজ্ঞে—আমি শশীভূষণ—"

রতিকান্ত পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আরে কে শশীভূষণ-রে বাবু ? ভাল মুস্কিল যা-হোক্ ! যাও—যাও,—এ বাড়ী নয় !" এইরূপ জামাতৃসম্ভাষণ করিয়া রতিকান্ত জানালা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময় সাহসে

ভর করিয়া শশীভূষণ বলিয়া ফেলিলেন—"আজ্ঞে—আপনার ছোট জামাই!" এতক্ষণে জামাইকে চিনিতে পারিয়া রতিকান্ত পুনরায় জানালা খুলিয়া একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—"ওঃ—তুমি? ছোট জামাই? তা এত রাত্রে কি মনে ক'রে? বাড়ীর সব খবর ভাল?" শশীভূষণ কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ—খবর সব ভাল! এ:বার নীচে আস্‌তে হবে—." অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রতিকান্ত নীচে নামিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইলেন। শশীভূষণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্‌ করিতেছে। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব্যাপার বল দিকি বাপু? এত রাত্রে হঠাৎ এ দিকে?" শশীভূষণ বলিলেন—"আজ্ঞে - রাত্রি তো বেশী হয়নি, এই সবে ন'টা বেজেছে!"

রতি। "বল কি বাপু? ন-টা রাত্তির—এক প্রহর রাত্তির, এ সময় লোকের এক ঘুম হবার কথা। তুমি এত রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ? বেয়াই কিছু বোল্লেন্ না?"

শশী। "আজ্ঞে তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন,—বিজয়ার প্রণামটা ক'র্ত্তে!"

রতিকান্ত ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এই জন্যে খামকা আমাকে এতটা ভোগালে? বিজয়া তো চুকে গেছে আজ তিন দিন! আজ তার প্রণাম কি? আর নিতান্তই যদি প্রণাম

কর্ব্বার কোনও বিশেষ আবশ্যক ছিল, নীচে দাঁড়িয়ে একটা প্রণাম করে গেলেই তো পার্ত্তে! নাও,—প্রণাম কর।"

সেই বিকট অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না। যেন ভূতে কথা কহিতেছে, শশীভূষণের এইরূপ মনে হইতে লাগিল। তথাপি তিনি কষ্ট করিয়া এতদূর যখন আসিয়াছেন তখন অনর্থক ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত নহেন। শ্বশুরকে বলিলেন,—"একটা আলো নেই কি? বেজায় অন্ধকার!"

রতিকান্ত এইবার বিশেষরূপে চটিয়া বলিলেন,—"আলো কালো নেই বাপু,—প্রণাম কর্ত্তে হয় কর, না হয়,—আজ ঘরে ফিরে যাও,—আমি কাল দিনের বেলা তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখাশুনো ক'রে আস্‌ব এখন।"

অগত্যা শশীভূষণ সেই অন্ধকারেই শ্বশুরচরণে প্রণত হইবার জন্য দেহ ও মস্তক অবনত করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে একখানি ছোট চৌকী পাতা ছিল। শশীভূষণ যেমন প্রণাম করিবার জন্য মাথা নীচু করিতে যাইবেন—অমনি সেই চৌকীতে বেচারার কপালে ঠকাস্ করিয়া আঘাত লাগিল। শশীভূষণ—"উহু—হু হুঃ—কপালটা ভেঙ্গে গেল বুঝি" বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। রতিকান্ত জামাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক,—তাঁহাকে

ঈষৎ ভৎ´সনা করিয়া বলিলেন,—"এ হে-হে-হে! এই কাঁচা বয়সে তোমার এমন চোক খারাপ হয়েছে! হায় হায়! মেয়েটাকে দেখ্‌ছি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি;—কোথায় আমার পা রইল,—আর কোথায় তুমি প্রণাম ক'ল্লে!"

শশীভূষণ কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"বেশ মশাই—বেশ যা হোক্! আমার চোখের দোষ হ'ল বুঝি? আমি কি বেরাল—যে রাত্রে আমার চোক জ্ব'ল্‌বে!" বলিয়া হতভাগ্য প্রস্থান করিল।

সহরে রতিকান্ত এই চালে চলিতেন। সুতরাং কলিকাতার সকলে তাঁহাকে অতিশয় "কৃপণ—অমামুখো—অযাত্রা" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু রাজগ্রামে রতিকান্ত ঠিক বিপরীতমুর্ত্তি ধারণ করিতেন। নিজদেশে তিনি পুরাদস্তর জমিদারের মতনই থাকিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম দোল দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাটীতে পল্লীগ্রামস্থ বহুলোকের সমাগম হইত—মহা ধুমধাম হইত। শুধু নিজগ্রামের নয়,—আশপাশের গ্রাম হইতে বহুলোকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত। তিনি পরিতোষপূর্ব্বক সকলকে আহারাদি করাইতেন;—কিন্তু সহরের কোনও লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া দেশে লইয়া যাইতেন না। যদি কেহ বলিত—"ঘোষাল মশাই! একদিন আপনার দেশে যাই চলুন!"

রতিকান্ত সে কথায় আমল না দিয়া বলিতেন,—"আরে সে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে,—সাত আট ক্রোশ মেঠো কাদায় রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হবে—আমার সে কুঁড়ে ঘরে তোমরা কোথা যাবে ভাই ?"

ভজন পূজন পুত্রদ্বয়ের যাহাতে বিশেষ রকম সদ্ভাব থাকে বৃদ্ধ রতিকান্তের তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি জানিতেন,—দুই ভাই যদি এক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকে,—তাহা হইলে তাঁহার এত কষ্টের সম্পত্তি নিশ্চয়ই বজায় থাকিবে। তিনি নিক্তির ওজনে পুত্র দুটীকে আদরযত্ন প্রদান করিতেন। কেহ কাহারও প্রতি কোনও কারণে যাহাতে তিলমাত্র ঈর্ষ্যান্বিত না হয়,—রতিকান্তের সেই বিষয়ে অধিকতর লক্ষ্য ছিল। পিতারই শিক্ষা, চেষ্টা ও যত্নে ভজন-পূজন পরস্পরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল।

ভজন-পূজন তেমন লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই। রতিকান্তেরও আদৌ ইচ্ছা নয়—ছেলে দুটী ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া সহুরে লোকের মতন চাল বিগড়াইয়া যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করে! দুই ভাই একই শ্রেণীতে একই বই পড়িত। মাষ্টার পণ্ডিতের নিকট দুই ভাই একই রকম পড়া দিত; অর্থাৎ—"ভজন" যে ভাবে যতটা ভুল করিয়া পড়া বলিত, "পূজনও" সেই ভাবে ততটা ভুল করিয়া দাদার সম্মান রক্ষা করিত। "ভজন"

একটু "হাঁদা-রকমের" ছিল,—কনিষ্ঠ "পূজন" উভয়ের মধ্যে বেশ চালাক-চতুর! সুতরাং স্কুলে পড়া যে ভাবেই হৌক—"ভজন" অপেক্ষা "পূজন" ভিতরে ভিতরে লেখাপড়াটা একটু অধিক শিখিয়াছিল।

রতিকান্ত পুত্র দুইটীকে পাখী পড়ানোর মতন কেবল উপদেশ দিতেন,—"বাপু! এই যে এত কষ্ট করে বিষয় আশয় করেছি,—এ সমস্ত তোমাদের দুটী ভাইয়ের জন্যে। যদি দু'ভায়ে বেশ মিলে মিশে থাকো,—তাহ'লে বিষয় বজায় থাকবে,—আরও বাড়বে বই কমবে না! ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হ'লেই সর্ব্বনাশ! আর এক কথা,—দু' এক বছর পরেই চল ক'ল্‌কাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে বসি; এখানে এত কষ্ট ক'রে আর থাকা চলে না। দেশে গিয়ে দোলদুর্গোৎসব—কাজকর্ম্ম—আমোদ-আহ্লাদ যা খুসী কর, তা'তে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু খবরদার! ক'ল্‌কাতা সহরমুখো কখনও হে'য়োনা—হোয়োনা! এখানকার কোনও ব্যাটার সঙ্গে ভুলেও আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা কোরোনা! আমার কিছু আছে—এখানকার সকল ব্যাটাই টের পেয়েছে, আমি ম'লে এখান থেকে দলে দলে জোচ্চোর গিয়ে তোমাদের ঠকাবার চেষ্টা ক'র্ব্বে। দেখো বাবা,—তাদের সঙ্গে যেন ভুলেও আত্মীয়তা কোরোনা!" পুত্র দুইটীর পড়া হৌক্-না-হৌক্,—রতিকান্ত

ই কয়টী সারবাণী তাহাদের প্রত্যহই শুনাইতেন। ভজন পূজন পিতার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া সেই উপদেশামৃত গলাধঃকরণ করিত।

যাহা হউক্—ভজনপূজন যৌবনে পদার্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রতিকান্ত কলিকাতার বাস উঠাইয়া রাজগ্রামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। তিনি একটু চেষ্টাচরিত করিলে—কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিলে—পুত্র দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী না হউক,—কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারিত। মাত্র ফোর্থ্ ক্ল্যাশ্ পর্য্যন্ত পড়াইয়া তিনি তাহাদের ইংরাজিশিক্ষা খতম করিয়া দিলেন। তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতাত্যাগের আর একটা বিশেষ কারণ এই যে, তিনি ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন—ভজন পূজনের সহরের চালচলনের প্রতি মন আকৃষ্ট হইতেছে। দুই চারিজন সহরের ছেলেদের সহিত পিতাকে লুকাইয়া তাহারা বন্ধুত্ব করে। তিনি যথাসম্ভব তদারক করিলেও, পুত্র দুইটীকে সকল সময়ে বাগাইতে পারেন না; অতএব এ পাপ কলিকাতা পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কলিকাতাত্যাগের দিন পূজন পিতার অলক্ষিতে ভজনকে সখেদে ডাকিল,—"দাদা!"

ভজন সাড়া দিল,—"ভাই!"

পূজন। "এমন সাধের কল্‌কেত্তা ছাড়তে হবে?"

ভজন। "কি কর্ব্ব ভাই—বরাৎ!"

পূজন। "আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে!"

ভজন। "যে ক'টা দিন বরাতে কষ্টভোগ আছে—ক'র্ত্তেই হবে! তারপর তো আমাদেরই হাত—"

পূজন হাসিয়া বলিল,—কেমন এই তো কথা?"

ভজন ভরসা দিয়া বলিল,—"তা আর ব'ল্‌তে?"

দুইজনে আর অধিক কিছু বলাবলি করিল না। মনে মনে একটা সন্তোষজনক কিছু স্থির করিয়া—অতি আনন্দের সহিত পরস্পরে গলাধরাধরি করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

রতিকান্ত ঘোষাল যথাসময়ে পুত্র দুইটীর মহাসমারোহে পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভজনের বিবাহের এক সপ্তাহ পরে পূজনের বিবাহ হইল। পল্লীগ্রামে আমোদ-প্রমোদ যতদূর সম্ভব—ততদূরই হইয়াছিল। ভজন-পূজনের ইঙ্গিতে রতিকান্তের কোন আত্মীয় কলিকাতা হইতে বাই-খ্যাম্‌টাওয়ালী আনাইবার জন্য কর্ত্তাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রতিকান্ত দুই মাস তাঁহার মুখদর্শন করেন নাই। যাহা হউক,—সুন্দরী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া রতিকান্ত মনে মনে ভারি খুসী হইয়াছিলেন। ভাবিলেন,—"ছেলে দুটীর সম্বন্ধে আর আমার ভাবিবার অথবা ভয় করিবার কোনও কারণ নাই।"

যথাকালে মহাকালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য রতিকান্ত অজানারাজ্যে প্রত্যাপ্রস্থান করিলেন। দুটি ভাই ভজন পূজন

গলাজড়াজড়ী করিয়া কাঁদিয়া আকুল ! কিন্তু শোক তো আর চিরকাল থাকে না। একদিন গেল—দুদিন গেল—তিন দিনের দিন দুটি ভাই পরস্পরের দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করিয়া—পিতার বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে তৎপর হইলেন। নগদ কোম্পানির কাগজ—উঃ—এত ছিল ? হীরে জহরৎ রতিকান্ত এত পাইলেন কোথা ? দুটি ভাই যত দেখে তত কাঁদে ! হায় হায়, - এমন বড়লোকের ছেলে হইয়া কিনা অজ্ পাড়াগাঁয়ে ছাইচাপা আগুনের মতন পড়িয়া রহিয়াছে ?

ভজন ডাকিল,—"ভাই !"

পূজন বলিল,—"দাদা !"

ভজন। "বাবা তো গেলেন ভাই।"

পূজন। "গেলেন বই কি দাদা।"

ভজন। "আমরা এখানে কা'র মুখ চেয়ে পড়ে থাকি ভাই ?"

পূজন। "আর কেউ নেই দাদা—কেউ নেই। পাড়াগাঁ নিবান্ধাপুরী। চাদ্দিকে গেঁয়ো চাষাভূষো।"

ভজন। "চল্—কালই ক'ল্কাতায় রওনা হই। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি সব হবে !"

পূজন। "তা আর ব'ল্তে ? আমাদের অমন রাজাবাবা মারা গেলেন,—সহরে একটা তোলপাড় হবে না ?"

ভজন। "সহরে তোলপাড় হওয়াও যা, পৃথিবীতে তোল-পাড় হওয়াও তাই।"

যেমন কথা তেমনি কাজ! তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় লোক ছুটিল—একখানা বড় বাড়ী ঠিক করিতে! দেশের লোক আত্মীয়-কুটুম্ব বাধা দিয়া বলিল,—"কর্ত্তার কাজ দেশে করাই উচিত!"

দুই ভাই মহাদর্পে বলিল,—"কর্ত্তার কাজে দেশশুদ্ধ ক'ল-কাতায় তুলে নিয়ে যাব। একটা কীর্ত্তি—একটা নাম থেকে যাবে।"

হায় রতিকান্ত! এখনও বুঝি তোমার চিতা ঠাণ্ডা হয় নাই! শ্রাদ্ধ খুব জাঁকালো রকমেরই হইল। কলিকাতা সহরের কেহই নিমন্ত্রিত হইতে বাকি রহিলেন না! বেশীর ভাগ নামজাদা বড়-লোক,—উকীল, ডাক্তার, দালাল, ইত্যাদি বড় বড় জুড়ী মোটর হাঁকাইয়া স্বর্গীয় জমীদার রতিকান্ত ঘোষালের "ছেরাদ্দ" করিতে আসিলেন। সহরের সেরা কীর্ত্তনউলী কোকিলকণ্ঠে কীর্ত্তন গাহিয়া রতিকান্তকে একেবারে সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে ভজনপূজন এখন সহরের নামজাদা "বড়-বাবু" "ছোটবাবু" হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ কনট্রাকটর ছয়-মাসের মধ্যে সদর রাস্তার উপর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিল। দুই ভাই শুভদিনে শুভক্ষণে সপরিবারে—সবান্ধবে মহাসমারোহে গৃহে প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকার নাম হইল—

"রতি-নিবাস।" বড় বড় জুড়ী আসিল-চৌঘুড়ী আসিল,—মোটরকার কেনা হইল; ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্—ফ্যান্ বাড়ী ছাইয়া ফেলিল। শনিবার রবিবার দুই ভাই বৈটকখানায় মজ্‌লিস বসাইতে লাগিলেন। হার্ম্মোনিয়মে সুর চড়িল,—তবলায় চাঁটি পড়িল,—বামাকণ্ঠে মধুর আওয়াজের সঙ্গে জোড়া-পায়ের ঘুমুরের আওয়াজ মিশিল,—"বাহবা—বাহবা" ধ্বনিতে বাড়ী—পাড়া গুল্‌জার হইল!

পূজন টানা সুরে ড্যাকিল—"দাদা!"

ভজন বলিল—"ভাই!"

দুটী ভাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভ্রাতৃস্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

দেশের কথা দুই ভাইয়ের আর মনে নাই। যাহা হউক, ভায়ে ভায়ে কিন্তু গলায় গলায় ভাব! বিষয়-আশয় বোঝাপড়া, দেখাশুনা,—"ভজন" সমস্তই করিয়া থাকেন; "পূজন" তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না। কেন করিবে? তাহার যখন যাহা আবশ্যক, মুখে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই সে পাইয়া থাকে। দোলদুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম এখন আর রাজগ্রামে হয় না। কলিকাতার "রতিনিবাসের" সাতফুকুরে মার্ব্বেল বসানো বৃহৎ দালানে এবং বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেই হইয়া থাকে। "পাড়াগেঁয়ে" লোকেদের নিমন্ত্রণ করা হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা "এ বড় বিষম ঠাঁয়ে" আর তেমন আমল পান না।

সহরে একবার "পয়সা-ওয়ালা" লোকের গন্ধ পাইলে হয়! আর রক্ষা নাই! দলে দলে—ঝাঁকে ঝাঁকে "মধুগন্ধে অলি-কুলের" মতন—ভদ্রবেশী হরেক রকমের বাবুরা আসিয়া "বড়বাবু ছোটবাবুর" সহিত রীতিমত বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিল।

বলিয়াছি, "ভজন" একটু "হাঁদাগোছের" এবং "পূজন" উভয়ের মধ্যে বেশ একটু চালাক চতুর। শুধু তাহাই নয়,—পূজন তাহার দাদার অপেক্ষা লেখাপড়া কিঞ্চিৎ অধিক শিখিয়াছিল। মাথার উপর পিতা খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান,—স্বতরাং দুই-জনকে বাধ্য হইয়া (ভিন্নপ্রকৃতি হইলেও) একই পথে চলিতে হইয়াছিল এবং আপন আপন মনোবৃত্তি যথাসম্ভব একই পথে চালাইতে হইয়াছিল; কারণ, একই শিকলে একই রকমে উভয়ের হস্তপদাদি আবদ্ধ ছিল। পিতার পরলোকগমনে উভয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন; স্বতরাং, ক্রমশঃ উভয়ের যথার্থ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

"বড়বাবু" আচারব্যবহারে চালচলনে বাঙ্গালী জমিদারবাবুর মতন; "ছোটবাবু" কিন্তু অন্যরকম,—একটু ইংরাজী ধরণের। এইখানে দাদা-ভায়ে একটু যেন পৃথক্ ভাবে গিয়া পড়িল। "ভজন" মিহি কালাপেড়ে দিশি ধুতির বাহার দেন, গিলেকরা ফাইন্ পাঞ্জাবী অঙ্গে চড়ান, পাম্প শু পরেন,—"পূজন" হ্যাট্-কোট্-পেণ্টলুন নেক্‌টাই কলার—(কখনো) সোলার টুপী, (কখনো)

ট্র হ্যাট্ চড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া চলে। "ভজনের" ইয়ার—রাম মিত্র, গকুল সিংহ, দয়াল চাটুর্য্যে, রাধু মুখুয্যে, গোষ্ঠ বসু ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালী। "পূজনের" ফ্রেণ্ড্—মিঃ বসু, ডক্‌টার রে, এণ্ড্ মিটার স্কোয়ার ইত্যাদি "বাঙ্গালীজাতীয়" সাহেব! "দাদা" হাজার হউক বয়সে বড়,—মান্যে বড়,—তাঁহার সহিত ছোট "ভাই" কেমন করিয়াই বা এক বৈঠকখানায় বসিয়া প্রাণ খুলিয়া ইয়ারকি দেয়! অজ্ঞান অবস্থায় ছেলেবেলায় যা' হইয়াছে—তা' হইয়াছে! এখন "বড়" হইয়া সেটা কি ভাল দেখায়? হাজার হউক্—বয়সের সঙ্গে একটু একটু বিজ্ঞও তো হইয়াছে! সুতরাং দুই ভায়ের দুটী পৃথক্ বৈঠকখানাও হইল! বৈঠকখানা পৃথক্ হইলই বা,—প্রাণে প্রাণে তো "দাদা-ভাই" এক হইয়া আছে!

একই জুড়ীতে—একই মোটরে "দাদা-ভাই" বাহির হইতেন! কিন্তু "পূজনের" স্ত্রী বলে,—"আমিও তোমাদের সঙ্গে বিকেল বেলা হাওয়া খেতে যাব!" অতএব "দাদা" কেমন করিয়া "ভাদ্রবধূর" সহিত একগাড়ীতে যাইবেন? সুতরাং আলাদা জুড়ী মোটর টম্‌টম্ ইত্যাদি না হইলেই বা চলে কি প্রকারে? আর "বড়বৌ" কেমন করিয়া "ছোট বৌয়ের" সহিত "ঠাকুর-পোর" সহিত এক গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইবেন? "ছোট বাবু" সাহেব সাজিয়া "বৌকে" লইয়া পুরাদস্তুর মেম্ না হোক—নিদেন পার্শী লেডি সাজাইয়া সহরের রাস্তায় খোলা গাড়ীতে দিনের বেলায়

হাওয়া খায় যে! "বড়বৌ"য়ের তাহাতে ভারি লজ্জা! ছিঃ! "বড় বাবু" গলা ছাড়িয়া চাকরবাকরদের হাঁক দিয়া ডাকেন,—"ওরে হরে! রামা! নিধে! তামাক দিয়ে যা"! "ছোট বাবু" ঘণ্টা টিপিয়া আওয়াজ করেন, "কিড়িং কিড়িং!" তাহাতেও যদি কোন চাকরের সাড়া না পান—তাহা হইলে বাঁকা উচ্চারণে সরুমোটা খাপা আওয়াজে ডাকেন,—"বয়ই!" নিদেন বলেন,—"বে'রা"

বড় বাবু ইয়ার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিলেন—পোলাও—কালিয়া চপ্—কাট্‌লেট্—গল্‌দা চিংড়ীর দাল্‌না—মুড়ী ঘণ্ট ইত্যাদি! ছোটবাবু ফ্রেণ্ডদের "ডিনার" দিলেন,—খানা মায় খানসামা আসিল "পেলিটীর" বাড়ী হইতে! ক্রমে "মিঃ গ্যো-শ্যালের" অর্থাৎ "ঘোষালের" অর্থাৎ কিনা "ছোটবাবু"পূজনের দুটী একটী করিয়া শ্বেতকায় পুরুষ এবং ধবলকায়া নারী-বন্ধু জুটিতে লাগিল।

"ভাইটি" বড় খরচপাতি করিতেছে দেখিয়া "দাদা" একদিন বলিলেন,—"ভাই! খরচা একটু বেশী হ'চ্ছে না?"

"ভাই" বলিলেন—"হ্যাঁ দাদা! একটু হ'চ্ছে—কিন্তু Can't help!"

"দাদা" নরম হইয়া বুঝাইয়া বলিলেন,—"একটু কমিয়ে দিলে হয় না?"

"ভাই" বলিলেন,—"Exactly so। আমিও অনেক দিন থেকে

ঐ বিষয় তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্ব্ব মনে ক'চ্ছিলুম! বাজে খরচ-গুলো for nothing কেন? দোল-দুর্গোৎসব-রাস বাপের শ্রাদ্ধ বছর বছর,—damned superstitions!—ক্রমে বন্ধ ক'রে দাও!"

"দাদা" আর খরচ কমাইবার নামটী করিলেন না! দীনু মল্লিক বড় বাবুর বড় হিতৈষি কিনা,—তাই যখন তখন বৈঠক-খানায় তাঁহার তাকিয়ার কাছে বসিয়া একটু গা ঘেঁসিয়া চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া সৎপরামর্শ দিয়া বলেন,—"কি ক'চ্ছেন বড় কর্ত্তা? ছোট ভায়ের জন্যে কি নিজের যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে এত নাম সম্ভ্রম ডুবিয়ে দেবেন? উনিতো কিছুতেই শুন্‌ছেন না। এ রকম বাড়াবাড়ী ক'ল্লে ক'দিন বিষয় বজায় রাখ্‌তে পার্ব্বেন? এখনও সাবধান হোন্!"

গম্ভীরভাবে নল হইতে মুখ সরাইয়া তামাকের ধোঁয়া বক্র-ভাবে পরিত্যাগ করিয়া বড় বাবু বলিলেন,—"তা—কি ক'র্ব্ব বল! ও যে ছোট "ভাই"—আমি যে "দাদা!" বুঝিয়ে তো ব'লে দেখিছি,—তা'তে উলটা কথা কয়!"

বিনোদ বক্সি বলিলেন,—"অত শিবতুলা কাদার ড্যালা হবেন না বড় বাবু—বুঝ্‌লেন? এর পর ভারি বদ্‌নামে প'ড়্‌তে হবে—বুঝ্‌লেন? আপনার গণ্ডা একটু চেয়ে দেখ্‌বেন—বুঝ্‌লেন?"

বড় বাবু একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব'ল্লে? ব'দ্‌নামে পোড়তে হবে? আমাকে? কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া নিতাই ঘোষ বলিয়া উঠিল,—"যা ব'লেছ ক'ব্রেজ! একেবারে মাটীর মানুষ!"

বিনোদ বড় বাবুর কাছে আরও একটু সরিয়া গিয়া হাত মুখ নাড়িয়া গলার আওয়াজ চাপিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন,—"আরে, বুঝ্তে পাচ্ছেন না? বিষয়-আশয় সবই আপনার হাতে! আপনার হাত দিয়ে তো খরচ হ'চ্ছে? সব যদি (ঈশ্বর না করুন) নষ্ট হ'য়ে যায়,--ঐ ছোট কর্ত্তাই শেষে ব'ল্বেন—'আমি কিছুই দেখিনি শুনিনি! দাদা'ই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন! যথাসর্ব্বস্ব ওঁর হাতে গচ্ছিত ছিল; কি করেছেন উনিই জানেন!' শুধু তাই নয়—চোর অপবাদ দেবে! ব'ল্বে,—গ্যাঁড়া দিয়ে সরিয়ে রেখে ব'ল্ছে, আমার খরচার জন্যে সব নষ্ট হয়েছে।"

বৈদ্যরাজের কথাগুলি বড় বাবুর মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন।

মতি হালদার স্পষ্ট বলিলেন,—"যে যার আপনার আপনার বিষয়-আশয় বুঝে প'ড়ে নেওয়াই ভাল! ভবিষ্যতে তা'হ'লে কোন গোল থাক্বে না। আমার কাছে এই সোজা কথা!"

এই ভাবের আন্দোলন বড় বাবুর মজ্‌লিসে এখন প্রত্যহই চলিতে লাগিল।

ছোট বাবু একটু মেজাজী লোক। সকল জিনিষেই তাঁহার একটু কায়দা থাকা চাই। পান থেকে চুণটুকু খসিলেই তিনি

মহা গণ্ডগোল লাগাইয়া দেন। আজকাল প্রতিপদেই যেন তাঁহার কেমন অসুবিধা বোধ হয়। হাজার হৌক্,—বয়স হইয়াছে, একটা মান্যগন্য লোক হইয়াছেন ;—একটু একটু করিয়া বিস্তর মান বাড়িয়া উঠিয়াছে! কাঁহাতক্ই বা প্রত্যেক কথায় দাদার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠান? এই সেদিন তিন জোড়া সাহেব মেম বাড়ীতে দেখা করিতে আসিলেন! "বয়কে" হুকুম করা হইল,—"আইস্‌ক্রীম্ সোডা বরফ লে আও!"

বেটা চাকর অম্লানবদনে আসিয়া সকলের সাম্‌নে বলিল কিনা,—"আইস্‌ক্রীম্ সোডা তো হ্যায় নেই! সরকার বাবু পয়সা দিয়া নেই—হম্ কেস্‌তেরে লে আওয়েগা?"

প্রসিদ্ধ ধনবান্ "মিঃ গো-শ্যাল্" এই রকম পরমুখাপেক্ষী হইয়া কেমন করিয়া মান-সম্ভ্রম বজায় রাখেন?

সুতরাং এরূপ অবস্থায় পরম বন্ধুবর ব্যারিষ্টারপ্রবর বি, সেট্ ছোট বাট বাবুকে বলিতে বাধ্য কিনা,—"পার্টিশান্ স্যুট্ করে বিষয় নিজের হাতে নাও! নইলে, your wealth and honour are both at stake!"

অপমানিত ছোট বাবুও রাগের মাথায় ইহার প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—"Of course,—নইলে আমার চ'ল্‌বে কিসে?"

এইরূপে একটু একটু করিয়া দুই দিক হইতে আগুনের ধোঁয়া দেখা দিল। ক্রমে আরও উত্তাপ বাড়িতে লাগিল; শেষে এক দিন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আর "দাদা-ভাই" এক নাই; এখন সেই পুরাতন কথা—"ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই!"

পার্টিশন্ স্যুট্ লাগিয়া গেল;—দুই ভাই চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিয়া লইলেন। যেমন তেমন ভাগ নয়,—ঘটী বাটী পর্য্যন্ত আধখানা আধখানা করিয়া ওজোন করানো হইল।

"রতিনিবাসের" ঘরদোর সমান ভাবে দুই ভাই দখল করিলেন। ঠাকুরদালান উঠান পর্য্যন্ত সমান বখরা হইল! যতদিন না প্রাচীর উঠে—ততদিন দড়ী এবং খড়ীর দাগ দিয়া পৃথক্ করা হইল। কেহ ভুলেও কাহারও নাম ধরেন না; দৈবাৎ দুইজনে মুখোমুখি হইয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ "পশ্চাৎভাগ দেখহ"-ভাবে বিপরীত দিকে চলিয়া যান। কেহ কাহারও ভাগে ভুলিয়া পদার্পণ করিলে, অথবা একজনের চাকর-নফর, বন্ধুবান্ধব অপরের "ভাগে" অন্যমনে আসিয়া পড়িলে রীতিমত দাঙ্গা বাঁধিয়া যায়।

দুর্গাপূজার সময় রতি-নিবাসে" ভীষণ ব্যাপার! মাত্র মাস খানেক পূর্ব্বে "ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়াছে,—তখনও প্রাচীর দেওয়া হয় নাই! ঠাকুরদালানে একদিকে বড় বাবু "ভজনের"

অংশে মা দশভূজার মূর্ত্তি,—মহাষ্টমী পূজার উপকরণ সজ্জিত,—ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজার মন্ত্রপাঠে নিযুক্ত; বড় বাবু পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দময়ীর প্রতিমার সম্মুখে ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান! প্রাঙ্গণে বড় বাবুর সীমানার মধ্যে বড় বাবুরই অনুগত লোকজন, বাদ্যকর প্রভৃতি আনন্দে মগ্ন! সেই ঠাকুরদালানের অপর পার্শ্বে ছোট বাবুর "অংশে"—ছোটকর্ত্তা মিঃ গোশ্বাল্ তাঁহার বন্ধু সাহেবমেম—অহিন্দু বাঙ্গালীসাহেব—স্বাধীনা শিক্ষিতা মহিলাগণকে লইয়া ডিনার টেবিল পাতিয়া খানসামা-সেবিত অখাদ্যভক্ষণে সুরাদেবীর পূজনে মাতোয়ারা হইয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন! ভদ্রলোকে কেহ বড় বাবুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া "রতিনিবাসে" নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে না! কি জানি—যদি ভুলিয়া ছোটকর্ত্তার দাগের মধ্যে পা পড়িয়া যায়,—তাহ'লে আহার করিতে গিয়া শেষে প্রহার খাইয়া আসিবে? সকলেরই মনে এই ভয়!

শুধু তাই নয়! দুই ভায়ে বিষম "টক্কা-টক্কি"ও চলিতে লাগিল! বড় বাবু যদি একখানা গাড়ী ক্রয় করিলেন,—ছোট বাবু অমনি দুইখানা কিনিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বাবু যদি কোথাও চাঁদা দেন পাঁচশত টাকা,—বড় বাবু সেখানে নগদ দিলেন দুই হাজার! ব্যবসাদারগণ ইহাতে বেশ আপনাদের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিল।

পৈতৃক গুরু "বিদ্যানিধি" ঠাকুরের বয়স প্রায় সোত্তরের কাছাকাছি। বৎসরান্তে পূজার পর ঘোষালবংশে একবার পদধূলি দিতে আসেন এবং কিছু পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ হইতে বড় আশা করিয়া "রতিনিবাসে" আসিতেছিলেন। "ভজন" বারান্দা হইতে গুরুকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একেবারে ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "দাদা" কি বাহাদুরী করিবার জন্য তাড়াতাড়ী নীচে নামিয়া আসিলেন জানিবার জন্য "পূজন" নিজের বৈঠকখানা হইতে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন পৈতৃক "গুরু" আসিতেছেন! তবে তো "দাদা" নিজের সুনামটা ফাঁকি দিয়া বজায় করিয়া লইবে! মুহূর্ত্তমধ্যে পূজনও ফটকের সম্মুখে আসিয়া গুরুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। "বিদ্যানিধি" ঠাকুর ফটকের সম্মুখে আসিবামাত্রই "ভজন" ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং "পূজনও" দেখাদেখি প্যাণ্ট কামিজশোভিত দেহে "গুরুচরণে" সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। গুরু "বিদ্যানিধি" সহাস্যবদনে উভয় ভ্রাতাকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভজনের সহিত যেই ভজনের অংশে পদার্পণ করিতে যাইবেন—অমনি "পূজন" হাত বাড়াইয়া "বিদ্যানিধির" একখানি চরণ গ্রেপ্তার করিয়া বলিলেন,—"কি বাবা! তুমি পৈতৃক গুরু, তা কি মনে নেই? **Partiality**

ক'রে চ'ল্‌বে কেন বাবা? আমি কি বাপের ব্যাটা নই?" বিদ্যানিধি আকস্মিক এই পদাকর্ষণ সামলাইতে না পারিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন; "ভজন" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"আপনি আসুন—আসুন! শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আপনি,—খবরদার, ম্লেচ্ছ মাতালের দিকে যাবেন না!"

পূজন তখন যথার্থই একটু "রংএ" ছিলেন, তিনি ভজনের এই কথা শুনিয়া গুরুর চরণ দুটী আরও জোরে দুই হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা! দেখি বাবা বিদ্যেনিধি! কোন্ শালা আজ আমার হাত থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়!" বিদ্যানিধি ঠাকুরের অবস্থা তখন সঙ্গীন! তাঁহার ধড়টী বড় ভাই "ভজনের" করলে,—এবং চরণ দুটী ছোট ভাই "পূজনের" বাহুপাশে বদ্ধ! দুইজনেই সমভাবে আকর্ষণ করিতেছেন! ব্রাহ্মণ ভীত চকিত বিস্মিত ব্যথিত অর্দ্ধমৃত হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'ত্রাহি ত্রাহি! ব্রহ্মহত্যা করিস্‌নে—বুড়োকে খুন করিস্‌নে! ওরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—গেলুম—গেলুম!" ব্রাহ্মণ যত চীৎকার করেন, দুই ভাই উন্মত্ত হইয়া ততই তাঁহার দেহ লইয়া টানাটানি করিতে থাকেন।

বাড়ীশুদ্ধ লোক আসিয়া জুটিল,—চীৎকারের চোটে পাড়ার লোকেরা ছুটিয়া আসিল; "বড় বাবুর" দল "বড় বাবুকে" বুঝাইয়া

বলেন,—"আহা—বড় কর্ত্তা! আপনি না হয় ছেড়ে দিন! বুড়ো বামুনটার প্রাণ গেল!"

ছোট বাবুর লোকজন "ছোট বাবুকে" অনুনয়বিনয় করিয়া বলেন,—"ছোটকর্ত্তা! ছাড়ুন—ছাড়ুন। নইলে এখুনি বুড়ো মেরে খুনের দায়ে প'ড়বেন।" কিন্তু হায়! কে বা কাহার কথা শোনে?

"দাদা" বলেন,—"কি? আমাব গুরুদেবকে আমি ম্লেচ্ছের ঘরে যেতে দোবো? কখনই না।"

"ভাই" বলেন,—"পৈতৃক গুরু—চালাকি নয় বাবা। আমারও সমান Right of inheritance আছে।' আমি ছাড়ব?" দুই ভাইয়ের তখন ভয়ঙ্কর বোখ্ চাপিযাছে' ক্রমে টানাটানিতে বিদ্যানিধির দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গলা শুকাইয়া ক্রমে স্বরবদ্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের আর সাড়াও নাই, শব্দও নাই! দুই চারিজন বিজ্ঞ প্রতিবাসী তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর পাঠাইয়া—পাহারাওযালা ইন্‌স্‌পেক্টর্‌কে ডাকিয়া আনিয়া যমরূপী ভ্রাতৃদ্বয়ের করালকবল হইতে মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের উদ্ধারসাধন করিলেন। পুলিশ দুইপক্ষ হইতেই কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া গুরুহত্যা-উদ্যোগ পর্ব্বটা চাপা দিয়া ফেলিলেন।

এইবার আদালতপর্ব্ব আরম্ভ! পুজন দুরমতের দাবী দিয়া Defamation suit আনিল। মামলা তো প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক

তাঁহার ধড়টী বড় ভাই ভজনের কবলে এবং চরণ দুটী ছোট ভাই পূজনের বাহুপাশে আবদ্ধ !

(রত্নাকর—২৭ পৃষ্ঠা

Mohila Press, Cal

সাধনা লাইব্রেরী ।

ব্যাপার ; ক্রমে জমিদারী বিষয়-আশয় লইয়া সাঙ্ঘাতিক মকদ্দমা রুজু হইল ! হাইকোর্টে একটা মহা হুলস্থূল পড়িল ! যত বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার কৌনৃস্থলি উভয় পক্ষে নিযুক্ত হইয়া "দাদা-ভাইয়ের" মকদ্দমা লইয়া ব্যতিব্যস্ত পড়িলেন। জলস্রোতের মতন উভয়েরই অর্থব্যয় হইতে লাগিল। মকদ্দমা আর শেষ হয় না !

কলসীর জল ক্রমাগত গড়াইলে শূন্য হইতে আর কতক্ষণ লাগে ? রতিকান্ত ঘোষালের বিষয় তো আর "যতই করিবে ব্যয় তত যাবে বেড়ে"—নয় ! নগদ টাকা নিঃশেষ হইতে অধিক দিন লাগে নাই ; ক্রমে জমিদারী গেল—কলিকাতার বাড়ী গেল—গাড়ী গেল—মোটর গেল,—সোণারূপার অলঙ্কারাদি গেল ! রতিকান্তের বড় কষ্টের সম্পত্তি "দাদা-ভাই" দুইজনে যেন লুটাইয়া দিলেন ! তবু মকদ্দমার নিষ্পত্তি তো হইল না !

আর উকীল ব্যারিষ্টার কেহ দাঁড়াইতে চাহেন না ; খরচ দিবে কে ? আর সাক্ষীরা আসিতে চাহে না,—পয়সা কোথায় ? কি দেখিয়া তাহারা আসিবে—আদালতে যাইবে—এত কষ্ট করিবে ? আর বন্ধুবান্ধবের দেখাসাক্ষাৎ নাই ! "রতি-নিবাস" যে বহুদিন পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে !

রাজগ্রামের লোকেরা আর "বড়বাবু" "ছোটবাবুর" দিকে ফিরিয়া চাহে না ! পাড়াগেঁয়ে লোক বলিয়া—দুই ভাইয়ের কাছে যেরূপ অপমানিত হইয়াছে,—তাহা কি কখনও তাহারা

জীবনে ভুলিবে? তাহার প্রতিশোধ লইবার এই তো উপযুক্ত অবসর!

আরও কিছু দেখিতে চান? ঐ দেখুন—মলিন সাজে, শুষ্ক-মুখে,—অনাহারে "দাদা-ভাই" হাইকোর্টের ফটকে দাঁড়াইয়া দুইজনে পরস্পরের প্রতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে! হঠাৎ দুই ভাইয়ের চক্ষু দিয়া অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল; পূজন জ্যেষ্ঠের কাছে গিয়া ডাকিলেন,—"দাদা!"

"ভজন" বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া সহোদরকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"ভাই!"

পূজন।—"বাবা ঠিক বলেছিলেন! চল, আর ক'ল্‌কাতায় আস্‌ব না!"

ভজন।—"আর নয়! চল!"

দুইজনে রাজগ্রামে পদব্রজে চলিলেন।

ভজন বলিলেন,—"বিষয়আশয় কি শত্রু! আমাদের দু'ভাইকে পর ক'রে দিয়েছিল!"

পূজন বলিলেন,—"শত্রুর হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পেলুম—আর কখনো আমরা ছাড়াছাড়ী হবনা!"

গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

পূজন বলিলেন,—"দাদা! কি ক'রে খাব?"

ভজন বলিলেন,—"ভাই! গতর খাটাব!"

পূজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসে ?"

ভজন।—"লাঙ্গল ঠেলে !"

পূজন মহানন্দে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেন,—"দাদা !"

ভজন স্নেহস্বরে উত্তর দিলেন,—"ভাই !"

প্রতিধ্বনি উত্তর দিল,—"দাদা—ভাই !"

সমস্যা

১

"এখন কেমন আছেন?"

বীণাবিনিন্দিত সুরে কথা কয়টী আমার কর্ণে ধ্বনিত হইল।

"বড় সুবিধা রকম নয়, ডাক্তার বিবি!"

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই মধুর হাসির একটা প্রবল বিদ্যুৎতরঙ্গ যেন সমস্ত ঘরখানিকে আলোড়িত করিল। আবার জীবন্ত বীণা ঝঙ্কারিত হইল,—"হা—হা—হা—আমি ডাক্তার নই, বিবিও নই! আমি ডাক্তার রায় সাহেবের মেয়ে বটে!"

"রায় সাহেব?" একটু বিস্মিত হইয়া কথাটা উচ্চারণ করিলাম।

"আপনি কোথায় আছেন জানেন না কি?"

আমি বলিলাম,—"আমার সমস্ত গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে!"

মনে পড়িল বটে,—আমার বিপদের পর সকলে আমাকে ট্রেণে করিয়া কোথায় লইয়া আসিয়াছিল এবং কোন একস্থানে আনিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক ধরাধরি করিয়া কাহার বাটীতে লইয়া আসিয়া আমাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মনে পড়িল, একটী কোমল পদ্মহস্ত আমার যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত চক্ষু দুইটীর সেবা করিয়া যেন

অনেকটা বেদনার উপশম করিয়াছিল! কিন্তু সে অবস্থায় তখন কাহাকে জিজ্ঞাসাও করি নাই অথবা বলিবার ইচ্ছাও হয় নাই—আমি কোথায়! বদ্ধচক্ষুর অন্ধকার এবং তাহার ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা সমগ্র বিশ্বসংসারের প্রতি আমাকে অমনোযোগী করিয়া রাখিয়াছিল।

অপরিচিতা এবং অদৃষ্টপূর্ব্বা সেবিকা বালিকা—(কিশোরীই সম্ভব--কিন্তু পূর্ণযুবতী নহে,—ইহা আমি না দেখিয়াও স্থির বুঝিয়াছিলাম,—) আমাকে নীরব ও বিস্মিত দেখিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"আপনি এখন হুগলীর বিখ্যাত চক্ষুরোগের ডাক্তার রায় সাহেবের বাড়ীতেই আছেন। ডাক্তার রায় সাহেব দেবীপুরের জমীদার রমানাথ রায় মহাশয়ের যমজ ভ্রাতা। যে সময় আপনার এই বিপদ হয়, সেই সময় ডাক্তার সাহেব বাড়ীতেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার মনে প'ড়ছে কি,—দেবীপুরে আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে শিকার ক'রতে গিয়েছিলেন? বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ চোঙ্গা ফেটে যাওয়াতে আপনার চক্ষু দুটী পুড়ে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল,--মনে আছে কি?"

উপক্রম হইয়াছিল? তাহা হইলে চক্ষুরত্ন দুটী এখনও ফিরিয়া পাইবার আশা আছে? আমি স্থির বুঝিয়াছিলাম,—বন্দুকাহত নিরীহ পক্ষীগণের মৃত্যুকালীন অভিসম্পাতে জন্মের মত বুঝি আমাকে অন্ধ—জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে! শাকান্নভোজী

বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া লক্ষ লক্ষ সরল আমোদ উপভোগ বর্জ্জন করিয়া বন্দুক ঘাড়ে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া দেবীপুরে আসিলাম শিকার করিতে! শিকার করিতে আসিয়া দুরদৃষ্টক্রমে নিজেই শিকার হইয়া পড়িলাম! এ সমস্ত বিধিবিড়ম্বনা বটে! আমি অস্থিরতার মাত্রা আরও একটু অধিক বৃদ্ধি করিয়া বলিলাম,—"আর ত এ রকম চক্ষু বেঁধে কাণা হয়ে বসে থাক্‌তে পারিনা!"

সকরুণস্বরে ডাক্তার সাহেবের কন্যা বলিলেন, "এখনও কি আপনার পূর্ব্বের মতই কষ্ট হ'চ্ছে?"

"যতক্ষণ আপনি থাকেন—এই তা'র মানে—যতক্ষণ আপনার সঙ্গে কি অন্য কা'রও সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে অন্যমনস্ক হই, ততক্ষণ যন্ত্রণা তত মনে হয়না বটে! তা' আমি এখানে এলুম কেন?"

বালিকা সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন,—"জ্যাঠামশাই আপনার সেই বন্ধুকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অদৃষ্টক্রমে বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখে শুনে বল্লেন, 'দেবীপুরে রেখে এরকম কঠিন চক্ষু-রোগের চিকিৎসার বড় সুবিধে হবে না'—তাই আপনার বন্ধু হরেনকে বলে হুগলীতে আপনাকে নিয়ে এসে নিজের কাছেই রাখ্‌লেন।"

"আপনাদের এ বাড়ী কি হাঁসপাতাল?"

"ঠিক না হোক্—অনেকটা বটে! অনেক রোগীকে এখানে রেখে ঔষধ পথ্য দেওয়া হয়; মাইনে করা পাঁচ সাতজন (নার্শ্) ধাত্রী আছে।"

"আপনিও তো দেখ্ছি হাঁসপাতালের নার্শ্ হয়েছেন! আপনার এতে লাভ?"

"আমার সখ! তা যাক্—আপনার কি কষ্ট হ'চ্ছে বলুন দেখি!"

"বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে!"

"এখনও?"

"হ্যাঁ,—আগে এত কষ্ট ছিলনা। আপনার বাবা চোখের চিকিৎসা বড় সুন্দর করেন,—বোধ হয় এমনটী আর কোথাও হয় না! কিন্তু যত চোখের যন্ত্রণা ক'মছে. প্রাণের যন্ত্রণা ততই যেন বাড়ছে!"

"কেন? বাড়ীর জন্যে? আপনার বাবা ত প্রত্যহই এসে দেখে যাচ্ছেন। আমার বাবা ব'ল্লেন, 'যতদিন না চক্ষু একেবারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চক্ষের বন্ধন যেন খোলা না হয়। যেন খুব তদারকে রাখা হয়,—যেন কোন রকমে না চক্ষে আলো লাগে!' তাইতে আপনার বাবা ব'লে গেলেন, যতদিন ডাক্তার সাহেব না ছাড়বেন, ততদিন তিনিও আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন না! এ সমস্ত কথা ত আপনি জানেন!"

"প্রাণের যন্ত্রণা কিসে তা আপনি বুঝতে পার্ব্বেন না!" একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলাম।

"বুঝি না বুঝি, শুন্‌তে দোষ কি? একবার বলুনই না!" বোধ হয় একটু সুধার হাসি হাসিয়া বালিকা কথাগুলি বলিলেন।

"চক্ষুটা যদি শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়ে যায়, তা'হ'লে আপনাকে দেখে চক্ষুটাও জুড়ায়, প্রাণটাও শীতল হয়। এ অন্ধকারে ডুবে থেকে কেবল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি!"

"চক্ষু বাঁধা রয়েছে তা'তে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না বটে, কিন্তু চক্ষু খুল্‌লেও ত আমাকে দেখতে পাবেন না!" এইবার কিন্তু হাসিটার খুব জোর হইল শুনিলাম। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! কেন?"

"চোখ খুল্‌লেই আপনাকে আপনার বাপ বাড়ী নিয়ে যাবেন!" বলিয়া পঞ্চমসংবাদিনী সেই বাণীর ঈশ্বরী কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি "যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

২

পাঠকপাঠিকা! বুঝিতেছেন কি, এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা খুব একটা বিচিত্র ঔপন্যাসিক রকমের দাঁড়াইয়াছে? অন্ধকারময় কক্ষে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রণয়দেবতা আসিয়া অভাগার স্কন্ধে ভর করিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে—অতি ধীরে হতভাগ্যের

ব্যথিত হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল। কিন্তু এ প্রেম প্রথমদর্শনে নয়,—প্রথম মধুর স্বরশ্রবণে! প্রেম চক্ষে নয়, প্রেম কর্ণে! নূতন বটে! প্রতি পলকে—প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতিক্ষণেই ডাক্তার সাহেবের কন্যা কিরণময়ীর সেই বীণাঝঙ্কারবৎ মধুর স্বরলহরী আমার কর্ণে প্রবাহিত হইতে লাগিল! সে সুরের—সে মোহন সঙ্গীতের যেন বিরাম নাই! যখনই সে আসিয়া কথা কয়, শুনিয়া আমি যেন তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হই,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলি! মনে ভাবি,—ইন্দ্রালয়ে অপ্সরীকলকণ্ঠোত্থিত তালমানলয়শুদ্ধ অমৃতবর্ষী সঙ্গীতও বুঝি ইহার নিকট সুরবিহীন কর্কশ কঠোর! আহা - সে কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! কি মধুর কথাগুলি—কি উচ্চারণবিশুদ্ধ, স্পষ্ট, ধীর,—কি হৃদয়গ্রাহী! কি সহানুভূতিসূচক! কি স্নেহপূর্ণ! কিরণময়ী যদি উপনিষদখানা আনিয়া আমার নিকট তাহার ব্যাখ্যা করিতে বসিত, তাহাও আমার বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ শৈবলিনীর সন্তরণপরিচ্ছেদের ন্যায় চিত্তাকর্ষক মনে হইত! কিরণময়ী নিকটে আসিলে আমি তাহাকে যতগুলি প্রশ্ন করিতাম, তন্মধ্যে অধিকাংশই সম্বন্ধবিহীন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ, নিরর্থক! কিরণময়ীও যথাসাধ্য তাহার উত্তর প্রদান করিয়া আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিত! আহা! প্রাচীন কবি কি কথাই লিখিয়াছেন,—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

বিশেষতঃ—যে কোন প্রকারে হৌক্,—দৃষ্টিশক্তির গতিরোধ হইলে,—শ্রবণশক্তির প্রাখর্য্য কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—দায়ে পড়িয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের এই একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমার মনে একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল। কিরণময়ী প্রায় সমস্ত দিনই আমার নিকটে বসিয়া থাকিত, কত গল্প করিত,—তথাপি মাঝে মাঝে তাহার প্রতি আমার অভিমান হইত,—কেন সে স্নানাহার অথবা অন্য কোন আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়? অনতিবিলম্বেই কিরণ আসিয়া তাহার অনুপস্থিতির জন্য আমার নিকট যেন কত অপরাধিনীর মত মার্জ্জনা চাহিত—আমার মানভঞ্জন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত।

একদিন ব'ললাম, "আরত পারিনা,—যথার্থই প্রাণটা গেল! আর যে কত্‌কাল এ'রকম করে "দগ্ধে দগ্ধে" ম'রতে হবে—তাওতো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

কিরণ একটু রহস্য করিয়া (বোধ হয় সেই সঙ্গে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল),—"মানুষ কি অনেককাল ধ'রে মরে বিজয় বাবু? আমিত বরাবর জানতুম [illegible]ণ একবারই হয়!"

"আমার সবই অদ্ভুত বৈকি কিরণ! [illegible]আমার মরণটাও নূতন

রকম! বাস্তবিক তুমি বল দেখি, এই যে তোমার সঙ্গে আমার এত ভাব, এত আলাপ, এত ঘনিষ্ঠতা,—এত কথাবার্ত্তা কইছি—অথচ তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, জান্‌তে পাচ্ছি না, তুমি কত সৌন্দর্য্যময়ী,—একি কম কষ্ট? তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শুনে কল্পনায় তোমার যে এক ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করে রেখেছি,—একবার মিলিয়ে দেখ্‌তুম্‌—বাস্তব ও কল্পনায় কতটা প্রভেদ!"

কিরণ্ময়ী খুব হাসিয়া উঠিল!

"ঐ সুধাময় হাসিটুকু যে মুখের, হায়! না জানি সে মুখখানিও কত সুধামাখা!"

অকস্মাৎ কিরণকে নীরব ও নিরুত্তর দেখিয়া আমার মনে হইল যেন খুব একটা গাম্ভীর্য্য আসিয়া কিরণকে আশ্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। একটা ছোটখাটো রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিরণ বলিল,—"ছি ছি বিজয়বাবু! আপনার কল্পনা আপনাকে খুব প্রতারিত ক'রেছে! যখন আমাকে স্বচক্ষে সম্মুখে দেখ্‌বেন,—তখন মনে হবে, কেন চোখ খুলে দেখেছিলুম? তখন দেখ্‌বেন, নিমেষে আপনার কল্পনারাজ্যের সে সুন্দর মূর্ত্তিটা ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে গেছে।"

বুকে একটা বিষম বেদনা অনুভব করিলাম! একবার মনে হইল, "অদৃষ্টে যা হয় হোক্‌,—দূর ক'রে টেনে চক্ষের বন্ধনটা খুলে ফেলে দিই!" কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সম্বরণ করিয়া লইলাম।

অত্যন্ত কাতরস্বরে আমি কিরণকে বলিলাম,—"কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ছলনা ক'চ্ছ ? তুমি যেমনই হও, যত কুৎসিতাই হও,—তবু তুমি আমার চক্ষে স্বর্গের অপ্সরী,—তুমি আমার উপাস্য দেবী ! আমি দিব্যচক্ষে তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি ! কেন আমার সঙ্গে এমন প্রতারণা কর ?"

একটু সান্ত্বনাসূচকস্বরে কিরণ আমাকে বলিল,—"আপনার সঙ্গে প্রতারণা করা আমার আদৌ ইচ্ছা নয়,—আপনি স্থির জান্‌বেন ! সেইজন্য আপনাকে ব'ল্‌ছি, চক্ষু খুলে আমাকে দেখে কেন নিজেকে প্রতারিত ক'র্‌বেন ? তা'র চেয়ে এখন হ'তেই প্রস্তুত হওয়া ভাল নয় কি ? আমার রূপবর্ণনাটা তবে শুনুন—"

একটা কিছু বিপরীত রকম শুনিতে হইবে এবং তাহাতে হয়ত প্রাণে ব্যথা পাইব, এই আশঙ্কায় আমি কিরণকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"আজ থাক্, কাল শুন্‌ব !"

ইত্যবসরে ডাক্তার রায় সাহেব আসিলেন,—আমার পিতা আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ (ঔষধপ্রয়োগ অন্যান্য কথাবার্ত্তা ইত্যাদি) আরম্ভ হইল। পাঠকপাঠিকা কি ভাবিতেছেন, সেখানে কিরণময়ী উপস্থিত ছিল ? হায়রে অদৃষ্ট !

(৩)

চক্ষু সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইতে এখনও প্রায় এক পক্ষ বিলম্ব আছে। দিন এই ভাবেই যায়,—কিন্তু আমার হৃদয়রাজ্যে কিরণময়ীর

রূপসম্বন্ধে একটা ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। সত্য ও কল্পনায় বিষম দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল! একদিন বুক বাঁধিয়া কিরণকে বলিলাম,—"আজ আর তোমাকে বাধা দোবোনা, তুমি কি ব'ল্‌তে চাও বল! তোমার স্বরূপবর্ণনাটা শুনে আমার কল্পনার সঙ্গে মেলে কি না, একবার পরখ ক'রে দেখি।"

"ব'ল্‌ব আর কি বলুন! আপনি আমাকে সুন্দরী বলেন, আমার মনে হয়,—আপনি বুঝি আমাকে উপহাস করেন!"

আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "ছি ছি কিরণ! এতদিন পরে তোমার বুঝি এই ধারণা হ'ল যে আমি তোমাকে উপহাস করি? তুমি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছনা যে আমি তোমায় কতটা ভালবাসি! তুমি মনে ক'চ্ছ, তোমায় সুন্দরী না দেখ্‌লে আমি হয়তো তোমাকে এত ভালবাস্‌ব না! কিন্তু ঈশ্বর শপথ—"

আমার কথায় বাধা দিয়া কিরণ বলিতে লাগিল,—"আপনাকে শপথ ক'র্ত্তে হবে না। আপনি ভালবাসুন আর না বাসুন, আজ না হোক্ দুদিন পরেই তো আমার চেহারা দেখ্‌তে পাবেন। তখন দেখ্‌বেন—যাকে আপনি সোণার চাঁপার বরণ ব'লে মনে করেছিলেন,—তা দোয়াতের কালী না হোক্, কালো বটে, যেটাকে সচরাচর লোকে শ্যামবর্ণ বা আত্মসম্পর্কীয় কেউ হ'লে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ব'লে থাকে।"

আমি খুব ভরসা জানাইয়া সগর্ব্বে বলিলাম,—"হোক্ কালো

কালোয় জগৎ আলো! বঙ্কিমবাবুর শ্রেষ্ঠা নায়িকা ভ্রমরও যে কাল!”

“তারপর চক্ষু দুটি “পক্ষজচক্ষু” অথবা “কুঁচের আকার” না হ’লেও “পদ্মপলাশ” নয়। সুন্দরীগণের আকর্ণবিস্তৃত লোচন থাকে,—আমার দুরদৃষ্টে চক্ষু দুটী সেরূপ না হ’য়ে - মুখের হাঁ-টী পুরাদস্তর আকর্ণবিস্তৃত বটে! দন্তপাতি মুকুতা-শ্রেণীও নয়—অথবা একেবারে মূলার আকারও নয়,—তবে বত্রিশ পাটীর অন্যান্যগুলি সুন্দর হ’লেও সম্মুখের দুটী স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বড়! তা হোক্—বোধ হয় তা’তে সৌন্দর্য্যের ততটা হানি হয়নি! গোলযোগ বেঁধেছে এই নাকের ডগাটায়;—খানিকটা মাংসাধিক্যের দরুণ, বাঁশীর মতন নাকটীকে একেবারে মাটী করে ফেলেছে! কি মশাই—চুপ ক’রে রইলেন যে,—সাড়াশব্দ দিচ্ছেন না কেন?”

“হুঁ—ব’লে যাও! আ—না—একটু অপেক্ষা কর—আগে বেশ করে—ঠিক করে ভেবে নিই!” গম্ভীরভাবে এই কথা বলিয়া খুব তন্নিবিষ্টচিত্তে আমি কিরণ্ময়ীর স্বরূপমূর্ত্তি হৃদয়ে গঠন করিতে লাগিলাম। উপাদান যোগাইতে লাগিল—স্বয়ং কিরণ্ময়ী, নির্ম্মাতা আমি!

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম,—“হুঁ—তারপর—বল!”

“শরীরের গঠন খুব রোগা না হ’লেও—একটু পাত্‌লা বটে;—

তা'র কারণ—আমার বয়সের স্ত্রীলোকের চেয়ে আমি কিছু লম্বা !"

"বয়সটা আন্দাজ কত ?"

"আন্দাজ কেন ? পূর্ণ সতেরো বৎসর পার হ'য়ে—আঠারোয় পদার্পণ ক'রেছি !"

বয়স শুনিয়া আমি তিলমাত্রও বিস্মিত হইলাম না,—কারণ আমি পূর্ব্বেই ডাক্তার সাহেবের মুখে কতবার কিরণের বয়সের কথা শুনিয়াছি। বিলাতফেরৎ ডাক্তার সাহেব—পুত্রকন্যার বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

"তবে একটা সুখ্যাতি কর্ব্বার জিনিস আমার আছে বটে—এবং লোকেও যখন তখন বলে থাকে—"

আমি মহাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি—কি !"

"আমার ধনুকের মত ভ্রূদুটী ! আমিও আয়নাতে দেখেছি—সে দুটী দেখ্‌তে অতি সুন্দর—যেন তুলি দিয়ে আঁকা ! তা—ভ্রূ দেখে তো লোকে সৌন্দর্য্যের বিচার করে না ; কাজেই আমার এমন প্রশংসনীয় যুগ্ম ভ্রূ থাকৃতেও আমি যথার্থই কুৎসিতা ! কেমন,—নয় বিজয় বাবু ?"

আমি জোর করিয়া বলিলাম,—"তুমি যথার্থই সৌন্দর্য্যময়ী ! আমি তো তোমার এই রূপে তোমায় রমণীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখ্‌ছি ! তোমার দেহের সমস্ত অংশই প্রশংসার যোগ্য !

বিশেষতঃ—এমন কণ্ঠস্বর তো মর্ত্ত্যের মানবীর কখনও সম্ভব নয়।"

কিরণময়ী মৃদুস্বরে বলিল,—"তা হবে। আপনারা কবি মানুষ,—সুতরাং আপনারাই বলেন—"কোকিলানাং স্বরো রূপং।"

এমন সময় দ্বার খুলিয়া কে একজন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কিরণ তাহাকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া বলিল,—"তুমি কখন এলে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ?"

"আমার জাঠ্‌তুতো ভগ্নী।" এই বলিয়া তাহারা দুজনেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এখন সত্য কথাটা যদি আমায় স্বীকার করিতে হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে,—কিরণময়ীর মুখের সম্মুখে আমি যাহাই বলি না কেন,—এই প্রকার তাহার আত্মরূপ বর্ণনায় আমার বক্ষে একটা দস্যুর মতন আঘাত লাগিল! এই সুদীর্ঘ দিন কয়টা বদ্ধচক্ষু হইয়া বীণাবিনিন্দিত প্রাণ-মনোহর মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারই পরিমাণ—তাহারই যোগ্যতা অনুসারে যে একটী মনের মতন সুন্দরী মোহিনীর আলো-করা প্রতিমা তমসাচ্ছন্ন শূন্য হৃদয়-মন্দিরে স্থাপিত করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দে সুখসাগরে সাঁতার দিতেছিলাম,—অকস্মাৎ তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার

"হুঁ—ব'লে যাও! না—না—একটু অপেক্ষা কর—যাতে বেশ ক'রে ঠিক ক'রে [illegible]ব নিই!"

স্থানে কিরণময়ীবর্ণিতা (কুৎসিতা না হৌক—আদর্শসুন্দরী তো নয়ই) এরূপ একটা কাঠামো খাড়া করিয়া দিলে,—সাধারণতঃ মানুষের মন কি হইয়া থাকে ?

বড় চোট লাগিল,—হৃদয়ে বাস্তবিক বড় ব্যথা পাইলাম।

কাল্পনিক "পুরাতন" হতভাগ্যের হৃদয়াসনে স্থান না পাইয়া অগত্যা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল,—তাহার স্থানে মহাদর্পে জোর করিয়া বাস্তবিক "নূতন" আসিয়া বসিল ! হৃদয়মাঝে অন্ধকারে উঁকি মারিয়া দেখি—সেই কালোরূপ ! সেই উজ্জল শ্যামবর্ণ,—মাঝামাঝি (নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র) চক্ষু দুটী,—ফুলশরের ন্যায় যুগ্ম ভ্রূ,—কৃশাঙ্গী,—ঈষৎ দীর্ঘ দেহযষ্টি,—একটু বড় ধরণের মুকুতার আকার দন্তপাতি ! এখন হইতে এই রূপই ধ্যান—এই রূপই জ্ঞান—এই রূপই চিন্তা ! চক্ষু আবদ্ধ থাকিলেও এই রূপ এবং তাহার সহিত কিরণের কণ্ঠস্বর যোগ করিয়া প্রত্যক্ষ কিরণময়ীকে আমার সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিরাজ করিতে দেখিতাম ! মনে হইত--যেন আমার চক্ষের বন্ধন খোলা হইয়াছে।

আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে সত্যসত্যই ডাক্তার রায় সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"আর কোন ভয় নাই,—চক্ষু সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছে,—আগামী কল্য বন্ধন খুলিয়া ফেলিব।" শুনিয়া মহানন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল !

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সুখসৌন্দর্য্য হইতে এতকাল বঞ্চিত হইয়াছিলাম,—কাল প্রভাতে নব-জীবন লাভ করিয়া আবার সমস্ত ফিরিয়া পাইব! আর কিছু না হোক্—আমার ধ্যানের প্রতিমা—হৃদয়ের আরাধ্য দেবী কিরণ্ময়ীকে চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইব,—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

তখন বোধ হয় অপরাহ্ন পাঁচটা। কিরণ্ময়ী আমার কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আজ মুখটা যে বড় প্রফুল্ল দেখ্‌ছি,—আমি বিদায় হ'চ্ছি ব'লে নাকি?" "বিদায়?" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেকি? তুমি বিদায় হবে? কোথায়? কেন? কাল আমি চক্ষের বন্ধন খুল্‌বো—আমার কতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে! তোমায় স্বচক্ষে দেখে আমার চক্ষুলাভের সার্থকতা হবে,—আর তুমি বিদায় হবে?"

"বড় দুঃখের বিষয় যে আমি এখুনিই চল্লুম! আমার মাতা-মহের বড় অসুখ,—আমি বর্দ্ধমানে তাঁ'কে দেখ্‌তে যাচ্ছি! মা সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন!"

"অ্যাঁ—সত্যি? হা জগদীশ্বর!"—বলিয়া আমি সোফায় হেলান দিয়া হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিরণ বলিতে লাগিল,—"জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভালোয় ভালোয় আপনার চক্ষু দুটী আরাম হ'য়েচে! যা' হোক্—বড়

শুভক্ষণে আপনি দেবীপুরে শিকার ক'র্ত্তে গিয়েছিলেন,—নইলে অন্য কোনস্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘ'ট্‌লে আপনার বিপদের অবধি থাক্‌তো না! সঙ্গে সঙ্গে তদারক এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত না হ'লে হয়তো এত শীঘ্র আপনার চক্ষু আরাম হ'ত না!"

এই সমস্ত বাজে কথা আমার একেবারেই ভাল লাগিল না। আমি যেন একটু বিরক্তিসহকারে বলিলাম,—"তা তোমায় কি আজ এখুনিই যেতে হবে? একটা দিন আর থাক্‌লে চ'ল্‌বে না?" কিরণ বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিল,—"কি ক'র্ব্ব বিজয় বাবু? দাদামশায়ের অসুখ—'এখন-তখন' ব্যাপার! আমায় কত ভালবাসেন,—এ সময় যাবনা? তা' আমার জাঠ্‌তুতো ভগ্নীকে ডেকে দিয়ে যাব,—সে আপনার সঙ্গে ব'সে গল্প ক'র্ব্বে!"

একটু রুক্ষস্বরে বলিলাম,—"কে তোমার জাঠ্‌তুতো ভগ্নী? আলাপ নেই, পরিচয় নেই,—কি তা'র সঙ্গে বসে গল্প ক'র্ব্ব? থাক্‌গে—থাক্‌গে—তুমি তা'হলে যাচ্ছ? তা'—তা'—কবে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?"

"এইখানেই হবে! কিন্তু কবে—তা'তো ঠিক বল্‌তে পাচ্ছি না। আপনাকে আমি পত্র লিখ্‌ব এখন।"

পত্র? আমাকে কিরণ পত্র লিখ্‌বে? আঃ—এতক্ষণে মৃত-দেহে যেন জীবনসঞ্চার হইল! হতাশ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে অকস্মাৎ যেন এক রমণীয় বৃক্ষলতাফলফুলশোভিত জনপূর্ণ দ্বীপে

আশ্রয়লাভ হইল! এ বিরহ কষ্টদায়ক হইলেও—মারাত্মক নহে। আমি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কিরণকে বলিলাম, "তা হ'লে আর কি বোল্‌বো! যাবে যাও,—কিন্তু হতভাগাকে মনে রেখো! তুমি আমাকে যেরূপ সেবা যত্ন ক'রেছ—জানিনা কেমন করে সে ঋণের কণামাত্র পরিশোধ ক'র্ব্ব! তোমারই কৃপাগুণে আমি জীবন লাভ করেছি—"

একি? কিরণের সাড়া-শব্দ পাইনা যে? তবে কি আমাকে না বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল? আমি ডাকিলাম,—"কিরণ!" উত্তর পাইলাম না,—তবে সে চলিয়া গিয়াছে! কথা কহিতে কহিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে বটে,—কিন্তু একবার বলিয়া যাওয়াটা উচিৎ ছিলনা কি? অদৃষ্ট!

মানুষের সুখ দুঃখ যাহা কিছু সমস্তই তাহার মনের খেলা। মনের গুণেই আনন্দ, বিষণ্ণতা,—রোগ-শোক-জ্বালা-যন্ত্রণা-ভয়-ভাবনা! মন যখন নিশ্চিন্ত ছিল যে কিরণ এই বাড়ীতেই আছে,—যখনই ইচ্ছা হয় ডাকিলেই কাছে আসিবে—কথা কহিবে,—তখন সমস্ত দিনের ভিতর কিরণ যদি একবার আমার কাছে না আসিত, তাহা হইলেও মন এত অস্থির—এত ব্যাকুল হইত না! কিন্তু আজ যখন মন বুঝিল যে কিরণ দূরে চলিয়া গিয়াছে,—আর ইচ্ছা করিলেই তাহাকে নিকটে পাইবনা, অমনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল! কোনও যুক্তি—কোনও আশ্বাস—কোনও

তর্ক মন শুনিতে চায় না,—কেবল আপনারই বেগভরে চলিয়া যাইতে চায় !

পরদিন প্রভাতে ডাক্তার সাহেব আসিয়া স্বহস্তে আমার চক্ষু খুলিয়া দিলেন। পিতাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দর্শনেই পিতাকে এবং ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করিলাম। পিতা মহাশয় ডাক্তার বাবুকে যথোচিত আপ্যায়িত করিলেন এবং বলিলেন,—"বিজয়কে আপনি জীবনদান করিয়াছেন,—এখন হইতে বিজয় আপনারই পুত্র !"

ডাক্তার বাবু আমাকে অবসরমত তাঁহার গৃহে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

চক্ষের বন্ধন খুলিয়া বাহিরের অন্ধকার দূরীভূত দেখিলাম বটে, কিন্তু প্রাণের অন্ধকার ঘুচিল না !

(৫)

ইহার পর প্রায় দুইমাস অতীত। চক্ষু আরাম হইলেও ডাক্তার সাহেব পিতাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যেন অন্ততঃ মাসখানেক লেখাপড়া না করি ! সুতরাং এই দুই মাস পড়িবার ঘরে আমার প্রবেশ নিষেধ ছিল। প্রত্যহ কিরণের পত্রের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম ; সপ্তাহ অন্তর এক একখানি পত্র আসিত। "কেমন আছি—কি করিতেছি,—তাহার

দাদামশাই এখনও ভালরকম সারে নাই ; সারিলেই হুগলীতে আসিবে ইত্যাদি" প্রতি পত্রে চারিপৃষ্ঠা করিয়া লেখা থাকিত। পড়াশুনা বারণ থাকিলেও গোপনে সেগুলি প্রত্যহ দুইবার চারিবার পাঠ করিতাম। কিন্তু উত্তর দিবার সুযোগ হইত না। দিবারাত্রিই পিতামাতার নজরে নজরে থাকিতে হইত, সুতরাং কোনমতেই আর কাগজকলম লইবার অথবা বাটী হইতে বাহির হইবার সুবিধা পাইতাম না।

পত্রের কোনও উত্তর দিলাম না দেখিয়া পাঁচ ছয় খানি পত্র লিখিয়া কিরণ্ময়ীও পত্র লেখা বন্ধ করিল।

যেদিন লেখাপড়া করিবার আদেশ পাইলাম, সেইদিন পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বারো পৃষ্ঠা পত্র কিরণ্ময়ীকে লিখিয়া ফেলিলাম। স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম,—"তুমি যদি সম্মতা হও, আমি আমার পিতামাতার মত করাইয়া তোমাকে বিবাহ করিতে পারি।" বাস্তবিক তখন আমার এমন অবস্থা যে আমি জগৎ-সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—যদি কিরণ্ময়ীকে পাই।

দুইদিন—চারিদিন—এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেখিলাম,—তখনও পত্রের উত্তর আসিল না। পিতার আদেশ লইয়া একদিন অপরাহ্নে হুগলী যাত্রা করিলাম। সে সময় হৃদয় আমার কিরণ্ময়ীর রূপে আচ্ছন্ন,—সেই (পরের চক্ষে কুৎসিতা হইলেও) আমার ধ্যানের

ছবি—মনোমোহিনী মূর্ত্তিখানি তখন এ হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে! আমি সেই "কালো রূপে" উন্মাদ!

বেলা পাঁচটার সময় হুগলীতে পৌছিলাম। ষ্টেশনে একখানি গাড়ী নাই দেখিয়া—হাঁটিয়া (যেন উড়িতে উড়িতে) ডাক্তার সাহে-বের ফটকের কাছে আসিয়া পৌছিলাম। বাটী প্রবেশ করিতেই সম্মুখে ফুলের বাগান; দেখিলাম, বাহিরে জনপ্রাণীও নাই। ডানদিকে চাকরদিগের গৃহে গিয়া দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তারসাহেব বাড়ী আছেন?" শুনিলাম, তিনি তিনটার সময় রোগী দেখিতে গিয়াছেন,—সন্ধ্যার পর না হইলে ফিরিবেন না। দ্বারবান আমাকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছিল; সে বিশেষ খাতির করিয়া আমাকে দ্বিতলের বৈঠকখানা খুলিয়া দিয়া বসিতে বলিল। আমি বসিয়া তাহাকে কিরণ্ময়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ডাক্তার সাহেবের কন্যা এইখানেই আছেন। হৃদয়ে উৎকণ্ঠার তীব্র কশাঘাত কতক পরিমাণে উপশমিত হইল। দ্বারবানকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"কি উপায়ে কিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করি!"

দ্বিতলের বৈঠকখানা হইতে নিম্নে বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম—ও কি—কে ও? কে বাগানে একখানি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বেড়াইতেছে? কে—কে? ঐ যে—কিরণই তো বটে! ঐ যে আমার হৃদয়ের জীবন্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী-

প্রতিমা,—আমার কতকাল—কতকালের ঈপ্সিত ধন,—আমার ধ্যানের মূর্ত্তী ঐ যে কিরণ্ময়ী! কম্পিত-অন্তরে—দ্রুত পদসঞ্চালনে একেবারে উন্মত্তের ন্যায় তাহার নিকটে গিয়াই বলিলাম,—"কিরণ! কিরণ! আমি এসেছি—ছুটে তোমায় দেখতে এসেছি!"

হঠাৎ সম্মুখে সর্প দেখিয়া পথিক যেমন চমকিত হয়—যুবতী (আমার ধ্যানের সেই কিরন্ময়ীমূর্ত্তি) সেইরূপ চমকিতা বিস্মিতা এবং ভীতা হইয়া আমাকে কর্কশকণ্ঠে বলিল,—"কে আপনি? আমাকে কি ব'ল্‌ছেন?"

কি সর্ব্বনাশ! কিরণ বলে কি!

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া যুবতী আবার বলিল,—"কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে? আপনি আমায় কি বল্‌ছেন?"

একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আ-আ-আপনি তো ডাক্তার রায় সাহেবের কন্যা?"

"হ্যাঁ!"

"আপনার নাম তো কিরণ?"

"হ্যাঁ!"

"আপনি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? এর মধ্যে ভুলে গেলেন?"

"আমি কস্মিনকালেও আপনাকে দেখিনি—আপনি কি ব'লছেন? নিশ্চয় আপনার কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে?"

আমি হতাশ হইয়া চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! কিরণ আজ আমার সহিত এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে? অদ্ভুত নারী-চরিত্র! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, বুঝি চারি চক্ষের প্রথম মিলনে চতুরা রমণী আমার সহিত রহস্য-চাতুরী করিতেছে। একটু সাহস করিয়া একপদ আরও অগ্রসর হইয়া আমার মানসপ্রতিমাকে কাতরে বলিলাম,—"ছিঃ কিরণ! এরকম ছলনা ভাল নয়ত——"

যুবতী সত্যই অত্যন্ত রাগান্বিতা হইয়া ডাকিল, "পাঁড়ে!"

(৬)

ভোজপুরীকে আহ্বান শুনিয়া প্রাণে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, একি তবে সে কিরণ নয়? কিন্তু চেহারা তো ঠিক সেই,—যেমনটী কিরণ আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছিল,—যে মূর্ত্তি এতকাল আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদ্গতচিত্তে অহোরাত্র উপাসনা করিয়াছি! কিন্তু তখনই সন্দেহ হইল, আমার সেই সেবিকা "কিরণের" কণ্ঠস্বর—কথাবার্ত্তার ভাবতো এত কর্কশ দাম্ভিকতাপূর্ণ নয়! সে যে অতি কোমল—অতি ধীর—অতি নম্র!

আমি তখন যুবতীকে নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম, "আপনি দ্বারবানকে ডাকুন—আমার তা'তে কোনও আপত্তি

নেই! আমি এ বাড়ীর কা'রও অপরিচিত নই। মাসাবধি এই বাড়ীতে আমি দিনরাত্রি অতিবাহিত করে গেছি। ডাক্তার রায়সাহেব আমার প্রাণদাতা—আমার পিতারও অধিক! আর একজন স্ত্রীলোক, তাঁর নাম কিরণ,—তিনি ডাক্তার রায়সাহেবের কন্যা,—ঠিক আপনার মতনই চেহারা,—আমাকে যেরূপ সেবা যত্ন করেছিলেন,—আমার নিজের পরিবারবর্গের ভিতরও কেউ বোধ হয় সেরূপ ক'র্ত্তে পারে না! তাঁর হাতের ৫।৬ খানা পত্র এখনও আমার কাছে আছে,—যদি চান তা'হলে আমি দেখাতে পারি।" এই বলিয়া পকেট হইতে কিরণময়ী-লিখিত পত্রগুলি (যাহা আমি কোন কারণবশতঃ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম) বাহির করিবার উদ্যোগ করিলাম। যুবতীর মেজাজটা যেন অনেকটা নরম হইল—বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনার কি অসুখ ক'রেছিল?"

আমি তাহাকে আদ্যোপান্ত আমার অসুখের কথা বলিলাম। শুনিয়া রমণী একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হয় তাঁ'কে কখনও চক্ষে দেখেননি!"

"না"।

"কিন্তু আমাকে চিন্‌লেন কেমন ক'রে? বোধ হয় যিনি আপনার সেবাশুশ্রূষা ক'র্ত্তেন—তাঁর মুখে শুনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি বড্ড ভুল করেছেন। তিনি আমার খুড়তুতো ভগ্নী,—তাঁর নাম "কিরণময়ী"—আর আমার নাম "কিরণবালা!""

"এঁ্যা—বলেন কি? আপনি, তিনি নন?"—বলিতে বলিতে যেন আমার কথা আট্‌কাইয়া গেল!

যুবতী খুব উচ্চহাস্যে যেন আমার কথার অসংলগ্নতা প্রমাণ করিয়া বলিল,—"না। আমি সে সময় মধুপুরে ছিলাম। আমার খুড়তুতো ভগ্নী কিরণময়ীকে বাবা আমার চেয়েও বেশী ভাল-বাসেন,—তাই তিনি অধিকাংশ সময়ই হুগলীতে এসে থাকেন। সে সময় তিনি এখানে ছিলেন বটে! আর আপনাকে যেন আমি একদিন আমাদের বা'রবাড়ীর দোতলার ঘরে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!"

কি এ? প্রহেলিকা না স্বপ্ন? আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম! এত চাতুরী যে স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে – তা কখনও কোন পুস্তকেও পাঠ করি নাই!

এমন সময় একখানি মোটর আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবতী বলিলেন,—"ঐ বাবা এসেছেন—আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করুনগে"—বলিয়া আমার ধ্যানের ছবি দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুর অভিমুখে মিলাইয়া গেল! আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম!

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার রায়সাহেব আমার নিকটে আসিয়া

যখন অকস্মাৎ বলিলেন,—"কি বিজয়—কখন এলে? এখানে একলাটী দাঁড়িয়ে কেন? চল চল—ঘরের ভিতর চল"—তখন আমার চৈতন্যোদয় হইল! আমি অপ্রতিভ হইয়া সে ভাব সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলাম এবং ঘরে গিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—"আজ রাত্রে আর বাড়ী গিয়া কাজ নাই,—আমি তোমার বাপের কাছে লোক দিয়ে পত্র লিখে দিচ্ছি!"

আমিও ত তাই চাই! দ্বিরুক্তি না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আমার আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সাহেব আমার সহিত এ-কথা সে-কথার পর একটা বড় গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিলেন। আমি পূর্ব্বে আভাযে বা কাহারও কোনরূপ ইঙ্গিতে তাহা জানিতে পারি নাই।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—"দেখ বিজয়! তোমাদের সঙ্গে আমার এমনই ভাব দাঁড়িয়েছে যে তোমাদের আমি কিছুতেই পর ভাবতে পাচ্ছি না! সেইজন্য আমার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে কোন রকম একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলি!"

ভূমিকাতেই আমার হৃদয়মধ্যে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল,—আমি কোন কথার উত্তর দিলাম না।

ডাক্তার সাহেব বলিতে লাগিলেন,—"তুমি তো শিগ্‌গিরই বিলেত যাচ্ছ? তোমার বাপের ইচ্ছে যে তোমার বিবাহটা যেন তার পূর্ব্বেই হয়;—কারণ তাঁর শরীরের অবস্থা তেমন ভাল নয়! বেশী দেরি ক'র্লে হয়ত তোমার বিয়ে দেখতে পাবেন না!"

আমি তো "না রাম না গঙ্গা"—কোন রকম উত্তর করিলাম না!"

"এ সম্বন্ধে তোমার বাপের সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক কথা হ'য়েছে। আমি শুনেছি, বিবাহসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ তোমারি ইচ্ছার উপর নির্ভর করেন। তাই আমি ব'লছিলাম যে যদি তোমার ইচ্ছা হয়—তুমি আমার ভাইঝি কিম্বা আমার কন্যাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পার!"

আমার এইবার যেন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল! আমাতে যেন সত্যই আমি নাই—মনে করিলাম!

ডাক্তার সাহেব আমার লজ্জিত ও সঙ্কুচিতভাব দেখিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা—তাড়াতাড়ি কি? তুমি একটু ভেবে চিন্তে ঠিক ক'রে দু-দশ দিন পরে আমাকে উত্তর দিও! তা'তে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই!"

এতক্ষণে হাঁপ ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইলাম!

(৭)

সে রাত্রি ডাক্তার সাহেবের গৃহে একরূপ অনিদ্রায় কাটিল বলিলেও চলে! প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছিল,—চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া সমস্ত হৃদয়টাকে যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল,—দুঃখ, ক্ষোভ, ক্রোধ, নৈরাশ্য, হর্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব একটার পর একটা মনোমধ্যে উদয় হইয়া যে কিরূপ আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা জানাইবার সাধ্য আমার নাই! কোথা হইতে কি হইল,—কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না! কাহার প্রাপ্য কাহাকে দিলাম,—কি লইতে কি লইলাম,—কি লাভের প্রত্যাশায় হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়া আপনার ফাঁদে আপনিই জড়ীভূত হইলাম,—কাহাকে দেখিতে কাহাকে দেখিলাম,—শূন্যে প্রাণ বিলাইয়া বসিলাম,—এ সমস্ত রহস্যের কিছুই অন্ত পাইলাম না!

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক চা পান করিলাম। ডাক্তার সাহেব সমাগত রোগীদিগকে লইয়া ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না। পার্শ্বের ঘরে ডাক্তার সাহেবের লাইব্রেরী,—অন্যমনে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় প্রবেশ করিয়া দেখি, চেয়ারে বসিয়া একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী—(যাহাকে সোজা কথায় নিখুঁত বলে) তদ্গতচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছে! তাহাকে দেখিয়াই আমি

সসম্ভ্রমে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি —এমন সময় সুন্দরী ডাকিল,—"কি বিজয় বাবু! এসেই ফির্‌ছেন যে!"

সেই—সেই বীণাবিনিন্দিত স্বর্গীয় সুষমা-ভরা মধুমাখা কণ্ঠস্বর! সেই কোমলতাপূর্ণ সরস সুন্দর মধুর ধীর কথা! আমার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল। ধরিত্রী চরণতল হইতে সরিয়া যাইতেছে মনে হইল! আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম!

"কি,—কথা কইবেন না নাকি?" ভুবনভুলানো ঈষৎহাস্যে সুন্দরী কলকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল!

"আপনি—আপনি—তা—তা—তুমি কেমন আছ?"

"এতক্ষণ পরে কি চিন্‌তে পাল্লেন নাকি? আপনি কেমন আছেন? আমাকে দেখে কি প্রাণে বড় কষ্ট হচ্ছে? সত্যি আমি বড়ই কুৎসিতা?"

আর কি চিনিতে বাকি থাকে? এই মধুরকণ্ঠস্বর যে (একমাস প্রত্যহ শুনিয়া শুনিয়া) কর্ণে এখনও ধ্বনিত হইতেছে! এই সেই আমার সেবিকা—চাতুরিময়ী কিরণময়ী! অনিন্দনীয় সুন্দরী বটে,—কিন্তু এ-রূপে তো আমার মন উঠিবে না! এ কণ্ঠস্বর আমার বড় আপনার—এ-রূপ আমার নিতান্ত পর! এ-রূপের স্থান তো আমার হৃদয়ে নাই!

কিরণ বলিতে লাগিল,—"আপনি আমাকে দেখে অসন্তুষ্ট হবেন জান্‌লে—আমি আপনাকে দেখা দিতেম না! দেখা দিয়ে বড়ই অন্যায় করেছি,—কি বলেন বিজয় বাবু?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—"তোমার ন্যায়-অন্যায় আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না! তুমি আমার সঙ্গে অকারণ যে ব্যবহার ক'রেছ—তা কখনো এ জীবনে আমি বিস্মৃত হবনা!"

"কিসে?"

"তুমি নিজের রূপের কথা গোপন করে—তোমার ভগ্নীর রূপের বর্ণনা কি জন্য আমার কাছে করেছিলে? তিন মাস অহোরাত্র যে রূপ ছায়ার মতন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে—প্রথম দর্শনে বড় আগ্রহে যে রূপে তোমাকে দেখবার আশা করে প্রাণ ধারণ করে আছি—আমার সে সমস্ত সুখ-স্বপ্ন এরূপ নির্দ্দয়-ভাবে ভঙ্গ করে তোমার কি আনন্দ হ'ল—আমি বুঝতে পাচ্ছিনা!" বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

"কেন বিজয় বাবু—তা'তে কি অন্যায় হয়েছে? আপনি যদি আমার ভগ্নীকে ভালবেসে থাকেন—সেতো আমার পক্ষে মহানন্দের বিষয়! সে কি আপনার যোগ্যা—মনোমত হতে পার্ব্বেনা? আপনি তা'কে যা'তে ভালবাসেন—হৃদয়ে স্থান দেন,—সেইজন্যই আমি এইটুকু কৌশল করেছিলেম! বলুন—এতে অন্যায় কি করেছি?"

"কি অন্যায়—তা যদি তুমি বুঝতে পার্ব্বে—তবে এমন ভয়ানক কাজ কেন ক'র্ব্বে? নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে একজন নিরীহ ভদ্রসন্তানকে এরূপ ভয়ঙ্কর দাগা দেবে কেন?—ছি—ছি—স্ত্রীলোক এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর হ'তে পারে—তা আমি কখনো কল্পনায় আন্‌তে পারিনি!"

অবনতমুখী কিরণ্ময়ী আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিল,—"অবোধ রমণী—না বুঝে যে কাজ করেছি—তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি—আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমার এই ভিক্ষা,—কৃপা করে—এতদিন যে রূপের ধ্যান করেছেন—যে রূপকে প্রাণে প্রাণে ভালবেসেছেন—তা'কে জীবনের সঙ্গিনী ক'রে আজীবন সুখী হন!"

"অসম্ভব!" বলিয়া আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

*　　*　　*　　*

ডাক্তার সাহেবকে বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলাম,—"চিরকুমারব্রত অবলম্বন করাই আমার আশৈশব সাধ ও বাসনা। আপনি আপনার কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করুন।"

আমার জীবনে একটা প্রধান সমস্যা,—আমি যথার্থ কাহাকে ভালবাসি এবং কাহাকে আমার বাস্তবিক বিবাহ করা উচিত ছিল! একজনের কণ্ঠস্বরে আমি উন্মাদ,—অপরের রূপে আমার

সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন ! এ বিষম সমস্যার আজও পর্য্যন্ত মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই !

পাঠক পাঠিকা ! আপনারা যদি পারেন—কৃপা করিয়া ন্যায়-মত আমার এ সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি ডাক্তার সাহেবকে পত্র লিখিয়া সংবাদ লইব—তাঁহার কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী এখনও অবিবাহিতা আছেন কিনা !

বাদুড়হরির বর্ষ-বিদায়

হরি ঘোষালকে লোকে "বাদুড়-হরি" বলিত। এমন ধারা ডাকনাম অনেকের থাকে—সুতরাং তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয়, ঘোষাল মশাই ছেলেবেলায় বাদুড়ের মতন ঘরের দেয়ালে ঠ্যাং দুটী উপর দিকে খাড়া করিয়া মেজে মস্তকসমেত পৃষ্ঠদেশের অর্দ্ধাংশটী রাখিয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন ; কিম্বা দিনের বেলায় ঘরের বাহির হইতেন না ; অথবা হয়ত রাত্রে পরের বাগানে প্রবেশ করিয়া গাছে উঠিয়া ফল খাইয়া আসিতেন,—এই রকম কোন না কোন কারণ ছিল—সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার দেহের বর্ণ ও গঠন অনেকটা উক্ত অদ্ভুত জানোয়ারের সহিত মিলিয়া যাইত,—সেই জন্যই কি পূজ্যপাদ শ্রীহরিনাথ ঘোষাল মহাশয়কে "বাদুড়-হরি" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে ? হবেও বা !

বাদুড়-হরি লোক বড় মন্দ নহেন। পাড়া প্রতিবাসীর কাহারও বাটীতে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে,—তথায় সন্ধ্যার পর হুঁকা হাতে করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মুরুব্বিয়ানা করিতেন। কিন্তু যদি কেহ বলিত,—"দাদা—একবার ভাঁড়ার ঘর

থেকে দুখানা লুচি এনে—এই লোকটাকে দাওনা—” অমনি বাদুড় হরি মহা চটিয়া গিয়া বলিতেন,—“এঁ্যা—তোদের বাড়ী আমি রাঁধুনি বামুন হয়ে এসেছি নাকি? এই চল্লুম—” বলিয়াই প্রস্থানোদ্যোগ করিতেন—আবার তৎক্ষণাৎ কর্ত্তাব্যক্তিরা আসিয়া বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন। সকল মজ্‌লিসে—সমস্ত সখের যাত্রা থিয়েটার পাঁচালী বাউল কবির দলে বাদুড়-হরি বিরাজ করিতেন। কিন্তু করিতেন কি? ঐ হুঁকা হাতে করিয়া আসরে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে “বাহোবা” দিতেন—আর সাজঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু আহারাদির সন্ধান করিতেন। মা সরস্বতীর সঙ্গে জন্মাবধিই তাঁহার বিবাদ। শৈশবকালে পাঠশালায় বোধ হয় গিয়াছিলেন,—কিন্তু যে দিন বুঝিলেন, মা লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর কখনও বনিবনাও হইতে পারে না,—সেইদিন হইতে বাদুড়-হরি পাততাড়ী, ধারাপাত, শিশুবোধ ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকে একেবারে পচা পানাপুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাদুড়-হরির পৈতৃক বাসস্থান—বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কোন এক সুদূর পল্লীগ্রামে। অল্পবয়সেই ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি পিতৃমাতৃহারা। নিজগ্রামস্থ কোন এক ভদ্রপরিবারের সহিত বাদুড়হরি দ্বাদশ বৎসর বয়সে প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহারা দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানকে অতি যত্নসহকারে আপন বাসাবাটীতেই স্থান দেন

এবং তাঁহাকে লেখাপড়া করিতে বলেন। পড়াশুনা করিতে হইবে শুনিয়া বাত্বড়হরি কাঁদিয়াই আকুল! কাজেই তাঁহারা আর কিছু বলিলেন না। বাত্বড়হরি একটু আধটু রাঁধিতে শিখিয়াছিলেন, অনেকটা পাচক ব্রাহ্মণ হিসাবেই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাত্বড়হরির একটা মহৎ গুণ ছিল,—নানারকম করুণরসাত্মক কথা কহিয়া লোকের মন ভিজাইতে পারিতেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যেখানে-সেখানে যাতায়াত করিয়া সহরের নানা লোকের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অদৃষ্টক্রমে বাত্বড়হরি কোনও এক বিখ্যাত সওদাগরি অফিসের বড়বাবুর সহিত আলাপপরিচয় করিয়া—তাঁহার খোসামোদ করিয়া কোনও রকমে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিয়া উক্ত অফিসে দশ টাকা মাহিনায় বাজার-সরকার নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে বাত্বড়-হরির অদৃষ্ট খুলিল। আর তিনি পরের বাড়ীতে রাঁধুনি বামুন হইয়া কেন থাকিবেন? প্রথমে খোলার বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া করিলেন,—তু পাঁচ বৎসর এইভাবে গেল। কিছুদিন পরে কোটাবাড়ীর একতলার ঘরে বাত্বড়হরি বাসা লইলেন। বছর কতক পরেই আবার পরিবর্ত্তন,—বাত্বড়হরি বিবাহ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আবার কয়েক বৎসর পরেই বিরাট ব্যাপার!

বাদুড়হরি ভদ্রলোকের বাসোপযোগী মাঝামাঝি রকমের বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়া মহাসুখে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিই বটে!

বাদুড়হরি কত অর্থ উপার্জ্জন করেন—যাহাতে তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়াইল? বাজার-সরকার বাদুড়হরি অফিসে বেতন পা'ন বাইশ টাকা মাত্র। এই মহার্ঘ বাজারে কলিকাতা সহরে একটা পেট চালাইতেই মাসে বোধ হয় খুব কম করিয়া পনেরো টাকা পড়ে; উপরন্তু, বাদুড়হরি এই অল্পদিন হইল সাহেবের পারে হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া পনেরো টাকা হইতে (আট বৎসর পরে) বাইশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং ঐ পনেরো টাকা মাহিনাপ্রাপ্তির ভিতরেই বাদুড়হরি বাড়ীঘর -দোর—নগদ টাকা—পরিবারের গহনা ইত্যাদি সমস্তই করিয়া লইয়াছেন। অদ্ভুত রহস্য! ভাবিবার কথা বটে! বাদুড়হরি বলেন,—"মা লক্ষ্মীর দয়া থাক্‌লে পৃথিবীতে সবই হয়!" কিম্বদন্তী, বাদুড়হরির সহিত মা লক্ষ্মীর দেখাশুনা হইয়া থাকে,—তিনি নাকি অর্থের আবশ্যক হইলেই মার নিকট হইতে ভিক্ষা পাইয়া থাকেন।

বাদুড়হরি যে খুব হিসাবী লোক—তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। সংসারে তাঁহার স্ত্রী, তিনটী কন্যা—দুই পুত্র আর আপনি। পয়সা খরচের উপর তিনি বিষম চটা ছিলেন। প্রত্যহ বাঁধাধরা আট আনা পয়সার উপর বাজার জলখাবার ইত্যাদি

সংসারের খরচ নির্দ্ধারিত ছিল। কেমন করিয়া সঙ্কুলান হইত—তাহা তিনিই জানিতেন—আর মা-লক্ষ্মীই জানিতেন। বাতুড়হরি হরদম্ তামাকু সেবন করিতেন,—অথচ কোনও দিন কেহ তাঁহাকে এক পয়সার তামাক কিনিতে দেখে নাই। বাটীর সম্মুখে মুদীর দোকান; প্রত্যহ সকাল বেলা নয়টা পর্য্যন্ত সেইখানে তিনি মজ্‌লিস্ করিয়া গল্পগুজব করিতেন। সেইখানেই তৈলমর্দ্দন চলিত এবং বাটী আসিবার সময় আপন ইচ্ছামত দুটী লঙ্কা, চারিখানি হলুদ, দুটী পাঁচফোড়ন, খানিকটা লবণ হাতে করিয়া লইয়া আসিতেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া মুদী কিছুই আপত্তি করিত না,—এক এক দিন মেজাজ খারাপ থাকিলে বলিত,—"দাদা ঠাকুর! আমাকে ফেল্ ক'র্বে নাকি?" একগাল দেঁতো হাসি হাসিয়া বাতুড়হরি বলিতেন,—"হা-হা-হা-হা—তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!"

জনশ্রুতি এই যে বাতুড়হরি কোনরূপ নেশা বাদ দিতেন না। কিন্তু যদি নেশা করিলে পয়সা খরচ অবশ্যম্ভাবী হয়,—তাহা হইলে আমরা এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করি না। পরের পয়সায় তিনি বিষপান করিয়া হজম করিতে পারিতেন। অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে কোন না কোন সৌখীন ব্যক্তির সহিত জুটিয়া পড়িতেন, আর রাত্রে একেবারে "চতুরং" হইয়া বাড়ী আসিতেন। সুতরাং—নেশার কিছুই স্থিরতা ছিল না; তবে গঞ্জিকা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। প্রত্যহ সে জিনিষটী তাঁহার চাই!

গত ফাল্গুন মাসে বাদুড়হরির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দোজপক্ষের পাত্র,—পল্লীগ্রামে নিবাস হইলেও বাদুড়হরির প্রায় পাঁচশত টাকা খরচ হইয়াছে। সর্ব্বনাশ ব্যাপার! বেচারার বুকের পাঁচখানি হাড় খসিয়া গিয়াছে। একেতো গঞ্জিকাসেবনে অহোরাত্র মেজাজ চড়িয়াই থাকিত,—তাহার উপর এই খরচ-দুর্ঘটনা! বাদুড়হরি দুনিয়ার উপর বেজায় চটিয়াছেন। কথায় কথায় বলেন,—"এ বছরটা যেন আমার কাল!" জীবনে এমন দুর্ব্বৎসর তাঁহার কখনই আসে নাই। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গৃহিণী কলসী উৎসর্গ করিবার জন্য দু'আনা পয়সা চাহিয়াছিলেন,—তিনি "বাপান্ত" খাইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। চড়ক দেখিব বলিয়া পুত্রকন্যাগণ একটী করিয়া পয়সা চাহিয়াছিল,—বিনিময়ে সকলে গণ্ডে এক একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইল। বাদুড়হরি সেদিন কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—"ভালয় ভালয় আজ পাপ বছরটা বিদায় হ'লে বাঁচি!" সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার সময় মনের দুঃখে বিশু কামারের দোকানে বসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সাত ছিলিম গঞ্জিকা সেবন করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

ঘরের ভিতর বেজায় গরম,—তাহার উপর বেজায় নেশা ধরিয়াছে,—বাদুড়হরি চক্ষু চাহিতে পারিতেছেন না। সদর দরজায় একখানা খাটিয়া পাতা ছিল,—সেইখানিতে চিৎ হইয়া পড়িলেন। বসন্তকাল; উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সুন্দর বাতাস বহিতে—

ছিল,—বাদুড়হরির বড়ই আরাম অনুভব হইতে লাগিল। সেই প্রাণাভিরাম নৈশসমীরণসংস্পর্শে এবং ত্বরিতানন্দদায়িনী গঞ্জিকা দেবীর প্রসাদে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া কল্পনায় নানারূপ চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। কখনো দেখিলেন—তাঁহার অফিসের বড় সাহেব টাকার একটী বড় পোঁট্‌লা আনিয়া যেন তাঁহাকে বলিতেছেন,—"হরি! এই নাও—তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা বক্‌শিস্ দিতেছি!" কখনো শুনিলেন—মা লক্ষ্মী আসিয়া যেন তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেছেন,—"বাপ্ বাদুড়হরি! তোমার সিন্ধুকটী আমি মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছি,—তুমি পাঁচ শ' টাকা খরচ করিয়াছ বলিয়া দুঃখ করিও না।" কখনো মনে হইল, তাঁহার জামাতা সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া পলাইতেছে। এইরূপ মনোমধ্যে কত কি খেয়ালের উদয় হইতেছিল—আর তিনি তদনুসারে হর্ষে ভয়ে দুঃখে নিমগ্ন হইতেছিলেন। অকস্মাৎ বাদুড়হরির যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—একজন জীর্ণবস্ত্র-পরিধানকারী ক্ষীণকলেবর বৃদ্ধ তাঁহার অন্দরমহল হইতে বাহির হইয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"বাপুহে! একবার খাটিয়াখানা সরাও,—আমি গত হই!" বাদুড়-হরি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? আমার অন্দরমহলে কি ক'চ্ছিলে?" বৃদ্ধ কহিলেন,—"আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি যে "গতবর্ষ""।

বা। অ্যাঁ—"গতবর্ষ" কি ?

বৃ। হাঁ—"গত" বই কি! রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে,—"নূতন বর্ষ" মশাই এসেছেন; আজ চৈত্রসংক্রান্তি,—আমায় আজ বিদায় হ'তে হ'চ্ছে—তা' জাননা ? তোমরা নূতন পেয়েছ, আর পুরাতনে তোমাদের আবশ্যক কি ?

বাদুড়হরি বুঝিতে পারিলেন;—একটু বিস্মিত হইলেন,—একটু আনন্দিতও হইলেন। বলিলেন,—"তোমায় চিন্‌তে পেরেছি ! তা' এত দেশ থাক্‌তে আমার অন্দরমহলে কি ক'চ্ছিলে বাবা ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"গাঁজাখোরের বুদ্ধি কিনা, তা'র আর কত ভাল হবে ? আমি শুধু তোমার অন্দরমহলে বসেছিলুম নাকি ? আমার বুঝি এই এতটুকু রূপ ? আমি পৃথিবীতে বিরাট রূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছি ! পৃথিবীর সকল স্থানে. সকল লোকের কাছে আমাকে দেখ্‌তে পাবে ! তবে আজ বিদায় হ'চ্ছি—আর কি ক'রেই বা দেখ্‌বে বল ? এই লম্বা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তোমাদের দেশে রাজত্ব ক'ল্লুম, তোমাদের নিয়ে ঘর ক'ল্লুম, আজ জন্মের মতন তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি—তোমাদের প্রতি একটা মায়া পড়েছে,—তাই যাবার সময় তোমাকে একবার ব'লে যাচ্ছি।"

বাদুড়হরি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা' যাচ্ছ যাওনা—তা'র আবার ব'লে যাচ্ছ কি ?"

বৃ। তুমি যেন আমার উপর একটু চ'টেছ ব'লে বোধ হ'চ্ছে, —কেন বল দিকি ? আমি তোমার কি ক'রেছি ?

বাদুড়হরি এইবার রীতিমত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,— "চোট্‌বোনা ? ছ্যাঃ, তুমি অতি বদ্! অতি দুর্বৎসর ! তোমার মতন খারাপ বছর আমার এই বাহান্ন বছর বয়সের মধ্যে আমি কখনো কোনটা দেখিনি ! উঃ—পাঁচশো টাকা ! তোমার সময়ে—তোমার রাজত্বের মধ্যে হরিনাথ ঘোষালের পাঁচশো টাকা খরচ ? একরাত্রে ? এক কথায় ? তুমি আবার মুখ নেড়ে কথা কইতে এসেছ ? যাবার সময় ঐ দুর্ম্মুখ দেখিয়ে বিদায় নিতে এসেছ ? আর শুধু কি তুমি দুর্বৎসর ? হিসেব করে দেখ দিকি,—তোমার আগে গোটা দশ পনেরো বৎসর যা' এসেছিল—সে সব কটাই দুর্বৎসর কিনা ! তখন থেকে আমাদের যে দুর্দ্দশা আরম্ভ হ'য়েছে, কমা চুলোয় যাক্—তা' বরং দিন দিন বাড়তেই সুরু হ'য়েছে ! তাদের আগে যে সব "বৎসর" এসেছিল, সে সময় মাগ্যিগণ্ডার বাজার হ'লেও তবু গেরোস্তো গরীব লোকে যা হোক্ দু'বেলা—চারটী খেতে পেতো ! এখন,—বিশেষতঃ তুমি আর তোমার আগের দু'চার মহাপ্রভু "বৎসর" মশাই যাঁরা এসেছিলেন,—তাঁদের সময় থেকে গরীব অল্প-আয়ের লোকেদের কথা ছেড়ে দাও, বড় বড় গেরোস্তো বেচারিদের পর্য্যন্ত দিন চলা ভার হয়েছে !"

বৃদ্ধ "গতবর্ষ" মশাই বাদুড়হরিকে বিষম রাগান্বিত দেখিয়া

ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হ্যাঁ বাপ্ বাদুড়! দিনটা অচল হ'ল 'কা'র? আর কিসেই বা হ'ল?"

বাদুড়হরি আরও চটিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"মচ্ছি আমি নিজের জ্বালায়—বুড়ো ব্যাটা পাষণ্ড! আমার সঙ্গে আবার এয়ারকি হ'চ্ছে? দিন চলা ভার হয়েছে কা'দের জাননা? তোমার বাঙ্গালী বাবাদের! ছুঁচো ব্যাটা!"

বৃদ্ধ একটু গিঠেন স্বরে বাদুড়হরিকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "চোটোনা বাবা! বুড়ো মানুষ কি ব'লতে কি ব'লে ফেলি, আমার ওপোর রাগ ক'র্ত্তে আছে কি? জন্মের মতন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় হ'চ্ছি,—তুমি বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি, বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে আমার সঙ্গে গোটাকতক কথাবার্ত্তা কও দেখি! কথায় কথায় চ'টে গেলে কি চলে বাপধন?"

বাদুড়। "চোট্‌বোনা? এত দেখে শুনে তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কিনা—বাঙ্গালীদের দিন চলা ভার হ'ল কিসে? চালের দর—কাপড়ের দর—ঘি-নূণ-তেল মসলা—তরিতরকারী—কোন্ জিনিষটার কথা ব'লব,—সকলের দরটা কি রকম তা'র খবর জাননা? আগুন—আগুন—ছোঁবার যো নেই! পেটে খেতে পাচ্ছিনে—ছেঁড়া ন্যাকড়া পোরে দিন কাটাচ্ছি—"

বাদুড়হরির কথা শুনিয়া গতবর্ষ মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"ভাল—ভাল—বাপ বাদুড়! তোমার কথা

শুনে প্রাণটা খুব ঠাণ্ডা হ'ল! তুমি নিজের দুর্ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যে দেশের দুর্ভাবনা ভাব্‌বার অবকাশ পেয়েছ,—দেশের দুঃখে যে তোমার প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে—এটা তোমাদের জাতের সুলক্ষণ ব'ল্‌তে হবে! তা' বাবা—এইতো সবে তোমাদের কলির সন্ধ্যা,—এখনও আরও কত কি হবে তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছ কি?"

"এঁ্যা—বল কি "দুর্বৎসর" মশাই? এর ওপোর আরও? ১২ টাকা চালের মণ,—আট টাকা কাপড়ের জোড়া,—একশো কুড়ী টাকা ঘি—(তা'তেও চর্ব্বি ভেজাল)—চল্লিশ টাকা কদর্য্য বিষ মেশানো সর্ষের তেলের মণ, এর ওপোরও দর বাড়বে? তা'হ'লে তো বেড়ে ব'ল্লে বাবা!"

"হ্যাঁ—এই রকম বাড়তে থাকবে বাবা! এই রকম বেড়ে ক্রমে গরীবগেরোস্তো তো চুলোয় যাক্‌,—যাঁরা তোমাদের ভেতোর বড়লোক—কিম্বা জমিদার—কিম্বা পয়সাওয়ালা মাতব্বর হ'য়ে বসে আছেন—তাঁদের পর্য্যন্ত অন্ন জোটা ভার হয়ে উঠ্‌বে!"

বাদুড়হরি এইবার যেন আরও বাগ পাইয়া সোৎসাহে বলিলেন, "তাহ'লে বলত' বাবা—তোমায় দুর্বৎসর ব'লে যে খিঁচিয়ে উঠেছিলুম—সেটা কি অন্যায় কাজ করিছি? তোমরা এক একটা অপয়া দুর্বৎসর আস্‌ছ—আর আমাদের বছর বছর দুর্দ্দশার মাত্রাটা বাড়ছে!"

গতবর্ষ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"তা' বাবা—তোমাদের এই যে দিন দিন দুর্দ্দশা বাড়ছে—এটা কি আমাদের "বৎসর" বেচারীদের দোষে? তোমাদের দুর্দ্দশার কারণ যে তোমরা নিজে—এটা কি এখনও বুঝ্তে পাচ্ছনা? এখনও এমন অন্ধ হয়ে রয়েছ যে আপনাদের দোষ আপনারা দেখতে পাচ্ছনা?"

বাদুড়হরি। "আমাদের দোষ? আমরা কি নিজেরা জিনিষ পত্তরের দর বাড়াচ্ছি—না দ'র বাড়াতে ব'ল্ছি? যত বিদেশী ব্যবসাদার এসে বাংলা দেশটা ছেয়ে ফেলেছে,—বিশেষতঃ মাড়োয়ারীরা কি কাণ্ড ক'চ্ছে দেখ্তে পাচ্ছনা? সব জিনিষ-পত্তর একচেটে করে রেখে দিন দিন দর বাড়াচ্ছে,—আর দোষ হ'ল আমাদের?"

গতবর্ষ। "তা'দের দেখে হিংসে ক'চ্ছ কেন বাবা? তা'দের দোষই বা কি? তা'রা ব্যবসা ক'র্ত্তে এসেছে—লাভ কর্ত্তে এসেছে; যা'তে লাভ হয়—যা'তে দুপয়সা রোজগার হয়—তা—তা'রা কর্ব্বেনা? তোমরাও করনা বাবা—মাড়োয়াড়ীদের মতন তোমরাও ব্যবসাদার হওনা,—কেউতো তোমাদের বারণ করেনি! তা'তো ক'র্ব্বেনা যাদু,—কেবল শিখেছ চাকরি ক'র্ত্তে! দশটার সময় দুটী কাঁচকলা ভাতে ভাত নাকে মুখে গুঁজে—জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে ছুটবে আফিসে, আর সেখানে গাধার মতন ৬'টা অবধি খেটে—জীবনটা দিয়ে

পরের কাজ ক'রে মাসকাবারে গণ্ডাকতক টাকা রোজগার ক'র্ব্বে,—এই পর্য্যন্ত তো তোমাদের দৌড়! এতে কি বাবা দুর্দ্দশা ক'মবে না বাড়বে?"

বাহুড়হরি। "চাকরি না ক'ল্লে পেট চ'ল্বে কোত্থেকে? তুমি তো মুখের কথা খুব ব'ল্লে। ব্যবসা ক'র্ব্ব—বাণিজ্য ক'র্ব্ব-টাকা কোথায়?"

গতবর্ষ। "হ্যাঁ—এইবার পথে এস বাবা। সেই কথাই তো ব'ল্ছি—টাকাই হ'ল আসল জিনিষ,—কেমন—না? আচ্ছা বাবা, এই যে মার পেট থেকে প'ড়ে ইস্কুল যেতে আরম্ভ কর, ইস্কুলের মাইনে দিয়ে বইপত্র কিনে ক'ল্কাতায় বাসাভাড়া দিয়ে খাই-খরচ ক'রে কতকাল কাটাও,—সে সব কি মিনি পয়সায় হয়?"

বাহুড়হরি। তা হয় না বটে! কিন্তু তা'র জন্যে তো আর এক সঙ্গে দুহাজার দশ হাজার বা'র ক'র্ত্তে হয় না;—যার যেমন অবস্থা সে তেম্নি মাসে মাসে খরচ ক'রে কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়,—তা'র পর রোজগারপাতি ক'রে সংসারের দুঃখ ঘোচায়! এটা আর বুঝ্তে পাচ্ছনা?

গতবর্ষ। "বুঝতে পাচ্ছি বইকি বাপ! বাঙ্গালীর সবাই লেখাপড়া শিখে—সবাই বি-এ এম্-এ পাশ ক'রে—দেশের—জাতের—নিজের নিজের সংসারের খুব দুঃখ কষ্ট ঘোচাচ্ছে—আর পরেও খুব ঘোচাবে! বাঙ্গালীর সবাই লেখাপড়া শিখে—ফলে

এমন অবস্থা হ'য়েছে যে শতকরা নব্বুই জন গেরোস্তোর দুবেলা পেট পুরে আহার জুটছে না! ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য নবশাক (গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাঁতি, তেলি, তাম্‌লি ইত্যাদি)—এঁরা তো সকলেই লেখাপড়া শিখে শাম্‌লা মাথায় দেবার চেষ্টা ক'চ্ছেনই,—উপরন্তু চাষা, জেলে, মালা, কৈবর্ত্ত, ধোপা, নাপিত, বাগ্‌দি, কাওরা, ইত্যাদি সকলেই লেখাপড়া শিখ্‌ছেন! যে যা'র পল্লীগ্রাম ছেড়ে, বাড়ী-ঘর-দোর জমি-চাষবাস ত্যাগ ক'রে—পৈতৃক জাতব্যবসা পরিত্যাগ ক'রে—কেবল যাচ্ছেন লেখাপড়া শিখে ওকালতি,—জজিয়তি—মুন্সেফি—ডেপুটীগিরি—কেরাণিগিরি ক'র্ত্তে! বাঙ্গালী জাতের সবাই লেখাপড়া শিখে হ'চ্ছে কি তা' দেখ্‌ছ বাবা? দিন দিন দুর্দ্দশা বাড়ছে,—ঘরে ঘরে অন্নকষ্ট হচ্ছে! আয় কম—ব্যয় বেশী,—সুতরাং জনে জনে ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়ছে! তোমরা নিজেদের সোণার জমি—নিজেদের চাষবাস ছেড়ে দিয়েছ,—সেই জমি সেই চাষবাস বিদেশীর আয়ত্তে গিয়ে প'ড়ছে! চাক্‌রি-রূপ মাকাল ফল তোমাদের হাতে দিয়ে—তোমাদের কাছ থেকে জমি, চাষবাসের ফসল,—ব্যবসাবাণিজ্যরূপ সোণার তাল ভুগিয়ে নিচ্ছে! এই যে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে পল্লীতে পল্লীতে মাড়োয়ারি প্রভৃতি ভিন্নদেশীয় ব্যবসাদারেরা সমস্ত চাল ডাল সর্ষে তিসি ভূষি একচেটে ক'রে ধরে রাখ্‌ছে,—হতভাগা তোমরা,—জ্ঞানহীন অন্ধ তোমাদের দেশের জমিদারেরা,—মূর্খ তোমাদের বাঙ্গালী

ধনবানেরা,—এটা কি মনে ক'ল্লে তাঁ'রা নিবারণ ক'র্ত্তে পারেননা ? জমিদার দেশ দেখেননা, প্রজার মুখ চাননা,—দেশে ফসল হ'চ্ছে কি না হ'চ্ছে—কিম্বা কোথায় কি ভাবে কা'র ঘরে যাচ্ছে,—তা'র দিকে ভুলেও দৃষ্টিপাত করেন না ! তাঁরা বোঝেন কেবল খাজনার টাকা ! কিসে চাষারা দুবেলা দুমুটো পেটে খেয়ে একখানি কুঁড়ে বেঁধে নিশ্চিন্তে মাগছেলে নিয়ে বাস কর্ত্তে পারে, চাষবাসের উন্নতি ক'র্ত্তে সক্ষম হয়,—কি উপায়ে তা'দের মধ্যে ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ নিবারিত হয়,—কিসে তা'রা সুস্থ সবল দেহে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন ক'র্ত্তে পারে,—তোমাদের দেশের জমিদারেরা তা' দেখেন না ! জমিদার চান—যথাসময়ে খাজনার টাকা ! হালগরু বেচে—রুগ্ন দীনদরিদ্র নিরন্ন প্রজার রক্তশোষণ করে যথাসময়ে খাজনার টাকা ! নিজের জমিদারীতে—নিজের প্রজার পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসল, সেতো নিজেরই আয়ত্তের মধ্যে ! সেই ফসলের যে এত অগ্নিমূল্য হয়,—সে দোষ কি ভিন্নদেশীয় ব্যবসাদারগণের ? দেশের লোক অন্নাভাবে মরে,—অথচ এইদেশেরই চালডাল সব অন্যদেশে রপ্তানি হ'চ্ছে ; এ রপ্তানির এত আধিক্য বন্ধ করা কি জমিদার-দের ক্ষমতার মধ্যে নাই ? অথবা—তাঁ'রা ইচ্ছা করেই এ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান ক'চ্ছেন ? এই যে তোমাদের বাংলাদেশে পাটের চাষ ক'রে ইংরাজ মাড়োয়ারী ইহুদি প্রভৃতি ব্যবসাদারগণ,দালালগণ, আড়ৎদারগণ জনে জনে ক্রোরপতি হ'চ্ছেন, বাঙ্গালী জমিদারের

জমিতে—বাঙ্গালী চাষার দ্বারায় উৎপন্ন পাট,—মাঠ থেকে কলে চট তৈরির জন্য চালান হবার মাঝে সাত হাত ঘুরে ফিরে সাতশো ভিন্নদেশীয় লোককে বড়লোক ক'রে দিচ্ছে,—তোমাদের দেশের জমিদার কি মনে ক'রে চাষার কাছ থেকে খাজনা নেওয়া ছাড়া এই পাটের দরুণ লাভটার সমস্ত অংশ না হোক্ কতকটাও পেতে পারেন না,——অথবা নিজের আত্মীয়কুটুম্ব দেশের লোককে পাইয়ে দিতে পারেন না? তা' তো ক'র্ব্বেন না! সাহেবদের আপ্যায়িত কর্ব্বার জন্য জমিদার মশাইরা শুধু জমি কি—আরও যদি তা'রও অধিক কিছু দিতে হয়—তা'ও দিতে প্রস্তুত! ব্যবসাদারকে জমি ছেড়ে দিয়ে - সকল রকমে তাঁ'দের স্থবিধা করে দিয়ে —বড় জোর নিজের কোনও আত্মীয়ের জন্য একটা ২০।২৫ টাকার মাহিনের চাকরি ভিক্ষা ক'রে নিলেন,—অথবা একটা কোন রকম ঠিকেদারী কাজ জোগাড় করে নিয়ে ধন্য হ'লেন! বাবা বাহুড়হরিরে! শুধু কি অগ্নিমূল্য দিয়ে জিনিষ কিনে নিস্তার পাচ্ছ—বাপ? রোজ রোজ ঐ সব ব্যবসাদারেরা তোমাদের কি ভয়ঙ্কর বিষ খাওয়াচ্ছে—তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছনা? ঐ যে ঘি খা'চ্ছ,—ওতে এমন মরা জানোয়ার নেই যার চর্ব্বি মিশ্রিত নয়! ক'ল্‌কেতা সহরে মাঝখান থেকে একটা হোমযগ্যির মস্ত কাণ্ড-কারখানা হ'ল বটে,—কিন্তু তা'তে হোলো কি জান? ঘিয়ে চর্ব্বি মেশানো কার্য্যটা বাড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তা'র দরও চ'ড়লো!

এটা দস্তুরমত ব্যবসাদারী বুদ্ধি! এক চাল চেলে ঘিয়ের দরটা ঝাঁ করে কেমন বাড়িয়ে দিলে! যেখানে ঘি তৈরি হয় সেখানে একবার যদি লুকিয়ে গিয়ে দেখ,—তা'হ'লে জীবনে আর কখনো তোমার ঘিয়ের জিনিষ খেতে প্রবৃত্তি হবেনা! একজন বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসাদার—তাঁ'র হিসাবের খাতাপত্রে খরচ লিখেছেন,—"ঘিয়ের মস্‌লাখাতে—পঞ্চাশ হাজার টাকা!" অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার চর্ব্বি কেনা হয়েছে।

বাহুড়হরি অবাক্ হইয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত ঘৃণায় নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"ছি—ছি—ছি এই ঘি আমরা খাই? রাম রাম রাম! এ ব্যবসাদার ব্যাটারা তো বড় সর্ব্বনেশে লোক! এরা দেখ্‌ছি পয়সার জন্যে মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারে! উঃ—এ ব্যাটাদের কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই?"

গতবর্ষ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"ধর্ম্মজ্ঞান এঁদেরই বেশী আছে বাবা! এঁরাই প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করেন, ব্যোম ব্যোম ক'রে শিবের মাথায় জল ঢালেন, পিঁপ্‌ড়ের গর্ত্তে চিনি দেবার ব্যবস্থা করেন,—দোল দুর্গোৎসব করেন,—সগোষ্ঠি অবীরা বেশ্যাদের প্রতিপালন করেন,—মাছমাংস আহার করেন না,—পিঁজ্‌রাপোলে চাঁদা দেন;—সুতরাং মানুষ মারিয়া যে পাপটুকু হয়—এই সব পুণ্যকার্য্যে সে সব ক্ষয় হয়ে যায়। জমাখরচ ঠিক

আছে বাবা! শুধু ঘি কেন? এই যে আটা ময়দা খাচ্ছ—ওতে কি মেশায় জান? পাথর—পাথর! পাথরকে ময়দার মতন পিশে মিহি ক'রে বেমালুম মিশিয়ে দিচ্ছে। বাজারের খাঁটি সর্ষের তেল কিনে আলুপটল ভাজা খাচ্ছ,—সে তেলে কি মেশাচ্ছে জান বাপ্? পচা বাদাম থেকে আরম্ভ ক'রে মায় পাকুড়া বীজ পর্য্যন্ত যত রকম অনিষ্টকারী জিনিষ হ'তে পারে,—তা'দের তেল! ঐ যে পাকুড়া বীজ ব'ল্লুম,—ওতে হাইড্রোসেনিক্ অ্যাসিড্ আছে,—যা জিভে ছোঁয়ালেই মানুষ মরে! এই সবের জন্যেই তো দেশে এত অকাল মৃত্যু—এত সাংঘাতিক রকমের রোগ বালাই,—এত লোকের হার্ট ডিজিস,—আর তাইতে এত লোকের হঠাৎ মৃত্যু! দুঃখের কথা কি ব'ল্ব বাবা,—রেড়ীর তেলের প্রদীপ জাল্লে যে আজকাল ঘরে মোটেই আলো হয় না,—তা'র কারণ কি জান? শালারা ময়রার দোকানের পান্তুয়া রসগোল্লার পচা রস মিশিয়ে বেচে।"

বাঢ়ুড়হরি বিশেষ দুঃখিত হইয়া—একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আর ব'ল্বেন না,—বৎসর মশাই—আর আমাকে ও সমস্ত কথা শোনাবেন না। আমি রোজ রোজ এবার থেকে ঠাকুরদেবতার মন্দিরে গিয়ে দু'বেলা মাথা খুঁড়ে আস্ব,—যাতে এই রকম ব্যবসাদার ব্যাটাদের শীগ্‌গির শীগ্‌গির সর্ব্বনাশ হয়।"

গতবর্ষ। "ঠাকুরদেবতারা কি আর মন্দিরে কেউ আছেন ?"

বাদুড়হরি। "এঁ্যা—সেকি ? কোথায় গেলেন বাবামায়েরা ?"

"মা কালী গেছেন ইন্দ্রলোকে,—নারায়ণ গেছেন বৈকুণ্ঠে,—আর শিবদুর্গা গেছেন তাঁ'দের হিমাচলে।"

বাদুড়হরি কাঁদিয়া ফেলিলেন—সত্য সত্যই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পর উদ্দেশে দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখানে আছেন কা'রা ?"

গতবর্ষ। "লক্ষ্মী আর সরস্বতী।"

বাদুড়হরি যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"যাক্—এঁরা দুটীতে থাকলেই এক রকম আমাদের ভাল—"

গতবর্ষ। "তোমাদের ভাল কিসে ? লক্ষ্মী সরস্বতী কি তোমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী মহাপ্রভুদের ঘরে আছেন ?"

বা। "এঁ্যা—আমাদের ঘরে নেই ?"

গ। "না। একেবারে যে জন্মের মতন ছেড়ে গেছেন—তা' নয়। আপাততঃ মা লক্ষ্মী গেছেন জাপানে,—মা সরস্বতী ইউরোপের নানা জায়গায় বেড়িয়েচেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তোমাদের দেশে হাড়ী মুচি শুঁড়ী প্রভৃতির ঘরে মা লক্ষ্মীকে কখনো, কখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু মা সরস্বতী বছরে একটী

বার ক'রে ঐ গোলদিঘির সাম্‌নে মোটাসোটা থামওয়ালা বাড়ীটায় মজা দেখ্‌তে এক আধ ঘণ্টার জন্তে আসেন।"

বা। "তা'—মা কালী—মা দুর্গা—এঁরা সব চলে গেলেন কেন?"

"তোমাদের পাপে! ক্রমে ক্রমে বাংলা দেশে পূজো আচ্ছা সব বন্ধ হ'য়ে গেল,—তাঁ'রা অপমান সহ্ব ক'রে কতকাল থাক্‌বেন বল দিকি? বাঙ্গালীরা সকল দিকেই খরচ ক'চ্ছেন,—বাড়ী ক'চ্ছেন—ঘর ক'চ্ছেন—জমিদারী কিন্‌ছেন,—মটর গাড়ী,—জুড়ি চৌঘুড়ি,—এ সব দিন দিন কেনা বাড়ছে,—মাগের গয়না হ'চ্ছে,—মদবেশ্যায় টাকার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে,—আর পূজোআচ্ছা প্রভৃতি হিন্দুয়ানীর কার্য্য ক'র্ত্তে হ'লে, অথবা বাপমায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধশান্তি কর্ব্বার বেলায় বলেন, "খরচে কুলোয়না, এ সব ক'র্ব্ব কি ক'রে।" আচ্ছা বাবা—তুমিই বল দিকি,—বৎসরে একবার মাকে এনে গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিয়ে তাঁ'র পা পূজো ক'র্ত্তে কি এতই খরচ হয়? না—ই বা বড়মানুষী ক'রে লোকজনকে কালিয়া পোলাও খাওয়ালে,—নাই বা যাত্রা থিয়েটার বাইনাচ দিলে! মনে ভক্তি থাক্‌লে মাকে এনে পূজোটাও কি করা যায়না? কিন্তু তা' কি কেউ ক'চ্ছে? যাঁরা এখনও একটা প্রতিমা খাড়া ক'রে পূজো করেন,—তাঁ'দের উদ্দেশ্য তো পূজো করা নয়,—দেশের লোকের কাছে বড়মানুষি

জাহির করা! কাজেই—মা আর বাঙ্গালায় থাকবেন কিসের জন্য? পুজোর ছুটী হ'লে,—দু'হাজার পাঁচহাজার খরচ ক'রে বাবুরা চ'ল্লেন দেশ ছেড়ে বিদেশে হাওয়া খেতে। আর তীর্থ-স্থানে মনে ক'চ্ছ দেবতারা কেউ আছেন? মহাভারত! মহা-ভারত! সেখান থেকে অনেকদিন হ'ল তাঁ'রা সব একে একে সরেছেন!"

বা। "কেন?"

গ। "কেন? সেবাইতদের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে পালিয়ে-ছেন! কি ভীষণ পাপ এই সব সেবাইতরা ক'চ্ছে বল দিকি! দেশের লোক রাশি রাশি অর্থ ঠাকুরঠাকুরুণদের পুজোর জন্যে দিয়ে আস্‌ছে,—সেই অর্থে নরাধম সেবাইতরা হেন পাপ কায নেই যা' করেনা! সেবাইত হবেন,—ত্যাগী—যোগী—সন্ন্যাসী! দেবতার অর্থ দেবকার্য্যে ব্যয় হবে। দীনদরিদ্র প্রতিপালিত হবে,—দেশের দুঃখ—সাধারণের দুঃখ দূর হবে,—গ্রামের জলকষ্ট অন্নকষ্ট পথকষ্ট দূর হবে,—দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বিপদ হ'তে দেশরক্ষা হবে,—তবেতো দেবতার অর্থের সদ্ব্যয় হবে। তা' না হ'য়ে—সেই অর্থে যদি সেবাইতগণের ভোগ-লালসা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়,—তা'হ'লে দেবতা কি সে স্থানে অবস্থান ক'র্ত্তে পারেন? মন্দিরে দেবপূজার জন্য প্রবেশ কর, প্রাণভরে, ভক্তিভরে দেবপূজা কর্ব্বার উপায় নাই! কারণ,—

প্রাণে ভক্তিভাব আন্‌বার চেষ্টা কর,—"মাকে" "বাবাকে" মনে মনে পূজা কর্‌বার চেষ্টা কর,—সেই সময় অর্থলোভী পাণ্ডাদের অর্থের তাগাদায় তোমার ভক্তি দেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না! এত পাপ যেখানে,—সেখানে দেবদেবী থাকেন? তুমিই বলনা।"

অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বাদুড়হরি বলিলেন, "সব তো বুঝলেম, বর্ষ মশাই,—ত'াহ'লে আমাদের দেশের দশা কি হবে?"

গ। "কোন আশা নেই বাপু! দেখ,—সততা হ'ল জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র,—সে সততা বাঙ্গালীর মধ্যে নাই ব'ল্লেও চলে। বড় লোভী—বড় স্বার্থপর—বড় হীন জাতি তোমরা! দুঃখের কথা ব'ল্‌ব কি বাবা,—অমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়—দুঃখী গেরোস্তো গরিব লোকেরা পেটে না খেয়ে চাঁদা দিয়েছিল;—তা'তে যে কত টাকা উঠেছিল—তা' আর তোমায় কি ব'ল্‌ব রে বাবা! ব্যস্‌—দেশের দুঃখ দূর হবে কি,—সে সমস্ত টাকাটা যেন ভূতে গ্রাস ক'রে ফেল্লে,—কে-ই বা তা'র খোঁজ খবর নেয়,—কে-ই বা তার কৈফিয়ৎ চায়! লিমিটেড্‌ কোম্পানী কর্‌বার জন্যে দেশের লোকে হয়তো টাকা দিলে, ব্যস্‌—যিনি বা যাঁ'রা কর্ত্তা হ'লেন,—তাঁ'রা দু'চার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্ব ফাঁক ক'রে দিলেন! আহা—দেখ দিকি বাবা—অমন ইণ্ডিয়ান্‌ ষ্টোরস্‌ নামে বড় কারবারটা কি রকম ক'রে নষ্ট হ'ল? ব্যবসায় দেশের উন্নতি

হবে কি,—কেবল জোচ্চোর ব্যাটাদের পেট ভ'রছে! সুযোগ পেলেই বাঙ্গালী বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'র্ব্বেই! কিছুতেই লোভ সাম্‌লাতে পারে না। নিজের এক্‌শো টাকা লাভের জন্য যদি জাতিভায়ের হাজার টাকা ক্ষতি করাতে হয়,—বাঙ্গালী অম্লান-বদনে তা' ক'র্ত্তে প্রস্তুত। যদি উন্নতি ক'র্ত্তে চাও, নিজেরা সৎ হও—নিজের ছেলেপুলেদের শৈশবকাল হ'তে সৎশিক্ষা দাও। ছেলেদের পাঁচ বছর বয়স থেকেই যেমন "ক-খ" শেখাতে আরম্ভ কর,—সেই সঙ্গে সঙ্গে তা'দের নীতিশিক্ষা দাও। কেমন ক'রে ভদ্রসমাজে ব'স্‌তে হয়—ভদ্রলোকের মতন কথাবার্ত্তা কইতে, ভদ্রলোকের মতন চ'ল্‌তে ফির্‌তে হয়,—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সব ছেলেদের শেখাও। ছেলেরা সৎ হ'লে তবে ভবিষ্যতে জাতির উন্নতি হবে।"

"সে তো পরের কথা মশাই! "কিন্তু আজ মরে লক্ষ্মণ ওষুধ দি, কখন!" এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে আপাততঃ চলে কি ক'রে ব'লুন দেখি! তা'র ওপোর মেয়ের বিয়ের খরচ! এক কথায় আমার ৫।৭শো টাকা খরচ হ'য়ে গেল—এখনও দুটী মেয়ে বর্ত্তমান! কি ক'রে কি ক'রি মশাই?"

"যখন বাঙ্গালী হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছ—তখন দুঃখ পেতেই হবে বাবা! দেশের বড়লোক যাঁ'রা, দেশের মধ্যে ধনবান যাঁ'রা—তাঁ'রা যদি খালি নাম বাজাবার মতলব ছেড়ে দিয়ে খুব আন্ত-

রিকতার সঙ্গে দেশের কাজে মনোযোগ করেন,—সমাজ-সংস্কারে জাতীয় উন্নতিকল্পে রীতিমত স্বার্থত্যাগ ক'র্ত্তে পারেন,—তবেই তোমাদের মঙ্গল। নইলে—শুধু কথায় আর চিঁড়ে ভিজ্‌ছে না বাবা! আর একটা কথা,—সবাই মিলে চাল ছোট কর বাবা—চাল কমাও। যা'র যেমন অবস্থা—সে তেমনি চালে চলো। ত্রিশ টাকার কেরাণী,—সে বেটার পায়ে ১২৷৷০ টাকা দামের জুতা, গায়ে আদ্দির চূড়ীদার, হাতে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌, মুখে থ্রিকাস্‌ল্‌ সিগারেট, নাক পর্য্যন্ত চুলের ঢেউ-খেলানো অ্যাল্‌বার্ট তেড়ি, পেছুনে আর কাণের ওপোর দু'পাশ হাড়ীদের মতন কামানো! মাগের গহনা বাঁধা দিয়ে এসেন্সের দেনা শোধ ক'রে—কথায় কথায় মোটর ভাড়া ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়ালে—গেরোস্তো গরীবের ছেলের কি বাবা সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হবে? বিলাসিতা ত্যাগ কর, কষ্টসহিষ্ণু হও—সহরে ব'সে বাবুগিরি কর্ব্বার বাসনা বর্জ্জন কর,—ব্যবসাবাণিজ্য ক'র্ত্তে শেখো,—চাকুরি ক'রে পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্য একেবারে পরিত্যাগ কর, বাক্যাড়ম্বর ছেড়ে কায কর, তবে যদি বাঙ্গালীর ভবিষ্যতে উন্নতি হয়। ধনবানেরা অর্থের সদ্ব্যয় করুন, দেশে কলকারখানা খুলুন,—শিল্পকার্য্যে উৎসাহ দিন! যে টাকাটা অনর্থক ছেলেমেয়ের বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, কর্ণবেধে বাজে নষ্ট হয়, সেই টাকায় যে দেশের অনেক কায হ'তে পারে,—এটা বুঝুন! নইলে—কোম্পানী

কাগজের বা তেজারতির স্থদ খেয়ে—চোব্যচোষ্য আহার ক'রে দিবানিদ্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত ক'রে সন্ধ্যার সময় ল্যাণ্ডো মোটর চ'ড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ালে দেশের দুঃখ বাড়বে বই ক'ম্‌বে না !"

বাদুড়হরি আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,—কেহ কোথায় নাই। বুঝিলেন, গত বর্ষ মহাশয় বিদায় হইয়াছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া—বাদুড়হরি আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তব্য

মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলাম দেখিয়া বাবা বলিলেন,—"এখানে থাকিয়া আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই ;—তুমি এইবার বিলাত যাত্রা কর। এখানে থাকিয়া লেখাপড়ার, বিশেষতঃ ডাক্তারি বিদ্যাশিক্ষার তেমন স্থবিধা হইতে পারে না।" এণ্ট্রেন্স্‌ পাশ করিয়াই প্রাণে ভয়ঙ্কর সখ হইয়াছিল,—বিলাত যাইব—সাহেব হইব। তখন কেবল দিন গণিতাম এবং ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করিতাম, কবে বাবার সুমতি হইবে, কবে তিনি আমাকে বিলাত যাইতে আদেশ করিবেন! কিন্তু ক্রমে সে ভাবটা যেন কমিয়া আসিয়াছিল; তাহার একটু কারণও ছিল। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। মা তখন জীবিতা ছিলেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের' নদীপারে লেখা পড়া শিখিতে যাই! তিনি বলিতেন,—"কিসের জন্য আমার 'সবে ধন নীলমণি' এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখ্‌তে বিলাত যাবে? ওর অভাব কি?" বাবা তখন কিছু বলিতেন না; কারণ, তখন বোধ হয় আমার বিলাত যাইবার সময় হয় নাই! আমি এফ্‌ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই বাবাকে মা ধরিয়া বসিলেন—"ছেলের বিবাহ দিতে হবে!" বাবা প্রথমে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু যখন তাঁহার পরম বন্ধু মিঃ এস্‌, সি, মালিক অর্থাৎ সত্যচরণ মল্লিক সিভিলিয়ান মহাশয় তাঁহার আদরের কন্যা সরসীবালার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিলেন,—তখন দায়ে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মা'র অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল! আমার বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে মাতাঠাকুরাণী আমাকে ত্যাগ করিয়া—"সাবিত্রী-লোকে" মহাপ্রস্থান করিলেন।

পিতা মহাশয় এন্‌, সি, ডাট্‌ (ওরফে নৃসিংহ চন্দ্র দত্ত) একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার; বারে তাঁহার যথেষ্ট পসার। সহরে

"দত্ত সাহেব" বলিয়া তিনি আপামরসাধারণের নিকট পরিচিত। আমাদের পৈতৃক বাটী বাগবাজারে হইলেও—পিতা বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লাউডন্ ষ্ট্রীটে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সাহেবী চালে থাকিতেন। তিনি সাহেব সাজিতেন বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছাচারী ছিলেন না। অন্দরে তিনি পুরাদস্তুর হিন্দু—বাঙ্গালী। কিন্তু সদর বাটীতে তিনি "সাহেব" হইয়া বসিতেন। শুধু হ্যাট্‌কোট্ পেনণ্ট্‌লেন নেকৃটাই কলার আঁটা সাহেব নহেন,—শুধু বিলাতে গিয়া টাকার জোরে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া সাহেব নহেন,—তিনি রীতিমত ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন ;—তিনি ইংরাজি বিদ্যাকে পুরা দস্তুর আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া—ইংরাজি লেখা পড়িয়া ইংরাজজাতিও চমকিত হইত।

২

পত্নীপ্রেমে বিভোর হইলেও—বিলাত যাইবার বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু যখন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় "খোকা" আসিয়া কি একটা অলৌকিক অচ্ছেদ্য অদৃশ্য শৃঙ্খলে আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তখন যথার্থ কথা বলিতে কি,—বিলাত যাইবার কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম।

সুতরাং পিতার এই আদেশে আমি যেন অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলাম! এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞায় আমি যেন ক্ষণেকের জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতা আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মনুষ্যজীবন কেবল কর্ত্তব্যের সমষ্টি মাত্র! যে আপনাকে মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করে,—কর্ত্তব্য যত কঠোরই হোক্ না কেন, তাহা পালন করিতে সে বাধ্য! কর্ত্তব্যপালন করিতে হইলে কাহারও মুখ চাওয়া উচিৎ নয়!" আমি বিষন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখানে থাকিয়া কি ডাক্তারিশিক্ষা চলে না?" পিতা বলিলেন,—"না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিলাত যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা যে জাতি, আমাদের যেরূপ দৌর্ব্বল্য, আমাদের আদর্শের যেরূপ অভাব, তাহাতে আমরা আমাদের মধ্যে থাকিয়া কিছুতেই মানুষ হইতে সক্ষম হইব না।" এরূপ অকাট্য যুক্তির উপর আমার আর কথা চলিল না; আমি পিতার সহিত তর্ক করিতে আদৌ অগ্রসর হইলাম না। পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, জন্মভূমি ছাড়িয়া, সরসী-বালাকে ফোঁটাকতক অশ্রুজল উপহার দিয়া এবং এক বৎসরের মায়ার পুতলী 'খোকার' কাছে সমস্ত প্রাণটা জমা রাখিয়া এডিন্-বরা যাত্রা করিলাম। সত্য সত্যই যখন জাহাজ ছাড়িল, তখন কেবল মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—"মা! মা! তুমি থাকিলে আজ তোমার আদরের পরেশকে জলে ভাসিতে হইত না!"

এডিন্‌বরা সহরে পিতার কোনও ইংরাজ বন্ধুর বাটীতে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রহিলাম। মনকে কোন রকমে বুঝাইয়া—উপায়ান্তর নাই বলিয়া বাধ্য হইয়া মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলাম। অর্থের অনাটন নাই, সেবাযত্নের ক্রটী নাই, কিছুরই অভাব নাই। সকল ভুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম বটে, কিন্তু সকলই কি ভুলিতে পারিলাম? শাণিত কৃপাণ-হস্তে কর্ত্তব্য একদিকে, পত্নীপুত্রের বিষম মায়া অন্যদিকে! মধ্যে মধ্যে যখন এই দুইটীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিত, তখন আমি যেন নিস্তেজ শক্তিহারা একটা অপদার্থ জীব হইয়া পড়িতাম।

মাসে দুইবার পিতার পত্র আসিত; তাহাতে অন্যান্য উপদেশ-কথার পর কেবল এইটুকু লেখা থাকিত,—"তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য ভাবিও না, অথবা উদ্বিগ্ন হইও না; তাহারা কুশলে আছে জানিবে!" আমি গোপনে সরসীকে পত্র লিখিতাম, সেও আমাকে তাহারই মতন উত্তর দিত! সত্য কথা বলিতে কি,—সরসীর পত্র না পাইলে আমার পক্ষে এই ভীষণ প্রবাস প্রাণান্তকর হইত। সরসী শিক্ষিতা—মূর্ত্তিমতী পতিপরায়ণা! আশ্চর্য্য তাহার লিপিচাতুর্য্য! আমি তাহারই পত্রে যেন কর্ত্তব্য-পালনে উত্তরোত্তর উৎসাহ লাভ করিতে লাগিলাম। প্রবাসেও আমার মহান হরষে দিন কাটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার পরীক্ষার ফল আশাতীত হইল।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি পিতার মুখরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল,—তখন একটা ভীষণ দুর্ভাবনা,উদ্বিগ্নের বোঝা আমার মস্তকে। পিতা লিখিলেন,—"স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্র্যাক্‌টিসের কোনও প্রয়োজন নাই। শীঘ্র ফিরিয়া এস; বধূমাতা আজ মাসাবধি শয্যাগতা। ডাক্তার বলেন, যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছে!"

চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়া কর্ত্তব্য-পালন-পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম,—চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কর্ত্তব্যপালন করিয়া ফিরিলাম। পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে আশালতামূলে জল সিঞ্চন করিয়াছিলাম,—দেখিলাম, তাহা শুষ্কপ্রায়, আর কয়দিন পরেই আমার অদৃষ্টানলে ভস্মীভূত হইবে। রুগ্না ক্ষীণা জীবনসঙ্গিনী সরসী আমার,—উত্থানশক্তি-রহিতা হইলেও, আমাকে দেখিয়া, আমাকে পাইয়া, আমার সহিত কথা কহিয়া, পাঁচ বৎসরের দীর্ঘ বিরহক্লেশ বিদূরিত করিল। কিন্তু সে সুখ তাহারই বা কয়দিন, আর আমারই বা কয়দিন? সরসী আমাকে শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ছার পৃথিবীর মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে দিব্যধামে চলিয়া গেল।

সে যন্ত্রণা, সে ব্যথা কি সাম্‌লাইতে পারিতাম? খোকা কাছে বসিয়া শুষ্কমুখে ছল ছল চোখে আমার পানে চাহিয়া

ডাকিল,—"বাবা !" অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অসার সংসার যেন ক্ষণেকের জন্য আবার স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বল হইল ! খোকাকে প্রাণভরে বক্ষে চাপিয়া বলিলাম,—"কি বাবা !"

পিতা বুঝাইয়া বলিলেন,—"সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য ! যাহার উপর তোমার কোনও হাত নাই, যাহা তুমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারনা, তাহার জন্য অধৈর্য্য হওয়া স্ত্রীলোকের স্বভাবজাত ধর্ম্ম ! তোমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমানের অনর্থক শোকপ্রকাশ কি উচিৎ ? ভীষণ কর্ত্তব্য সম্মুখে—পুত্রকে পালন করা ! পিতার কর্ত্তব্যপথে এইবার অগ্রসর হও !"

আবার কর্ত্তব্য ? হাঁ—কর্ত্তব্য তো বটেই ! সরসী তো গিয়াছে, আর আসিবে না। তাহার যথাসর্ব্বস্ব—তাহার জীবনের জীবন "খোকাকে" যে আমার কাছে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে ! সত্যই তো ! এ তো মহান কর্ত্তব্যভার আমার মস্তকে ! আমি 'খোকা'কে কোলে লইয়া আবার ভগ্নমন দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম।

প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল ! মনে করিয়াছিলাম, খোকার মুখ চাহিয়া সরসীর চিরবিরহব্যথা ভুলিব ; একেবারে সব জ্বালাযন্ত্রণার উপশম না হউক—অন্ততঃ কতকটা হইবে ! কিন্তু তাহা তো হইল না। খোকা যখন হাসে—খেলা করে, তখন জোর করিয়া দারুণ শোকানল ভস্মাবৃত করিয়া রাখি বটে ! কিন্তু হঠাৎ

কি জানি কি মনে ভাবিয়া সে যখন আধ আধ কথায় ছল ছল চোখে বিষন্নবদনে আমাকে জিজ্ঞাসা করে,"বাবা! মা কোথা গেছে, কখন্ আস্বে"—তখন,—তখন এই পাষাণ হৃদয়ে যেন কি একটা মর্ম্মান্তিক শেলবিদ্ধ হয়! সে যে কি জ্বালা—সে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা,—সে যে কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মভেদী, তাহা জানাইবার ভাষা আমার নাই! আমি একদিন সে ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া অবলা স্ত্রীলোকের মতন, দুর্ব্বল শিশুরও অধম হইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলাম! খোকা যেন হতভম্ব হইয়া নীরবে আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানিনা! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কাঁদিয়া যেন বুকের ভার অনেকটা কমিয়া গেল! তবে তো কান্না বড় ভাল! কাঁদিতে কাঁদিতে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, আপনার অস্তিত্বটুকু যেন হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। হঠাৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে দেখিলাম,—সৌম্যমূর্ত্তি পিতা "খোকাকে," কোলে লইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্নেহমাখা হস্তে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিতেছেন,—"একটু মুখে চোখে জল দাও, ঠাণ্ডা হও! ওঠো বাবা—ছিঃ! তুমি যে আমার দেবতা ছেলে!" আর কথা না কহিয়া টেবিলস্থ গেলাস

হইতে জল লইয়া মুখে চোখে দিলাম। খোকা তাহার দাদাবাবুর কোলে উঠিয়া অনেকক্ষণ সান্ত্বনালাভ করিয়াছিল; আমাকে ক্রন্দনে বিরত দেখিয়া ভরসা পাইয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাবা কাঁদ্‌ছিল কেন দাদাবাবু?" খোকা দ্বিতীয় কথা আর না কহিতেই বুদ্ধিমান পিতামহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার বাবা বড় দুষ্টু ছেলে!" দাদাবাবুর কথা শুনিয়া খোকার প্রাণটা যেন মহানন্দে মাতিয়া উঠিল! সে উচ্চরবে হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিতে লাগিল,—"বাবা! তুমি দুষ্টু ছেলে! দাদাবাবু তোমাকে মারবে! হো-হো-হো! বাবা দুষ্টু ছেলে!"

আবার ক্ষণেকের জন্য সকল শোক ভুলিলাম! শোকের প্রাবল্য যদি চিরকাল সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে কখনই ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকিত না! সরসীকে ভুলিতে পারিলাম না বটে,—ক্রমে তাহার বিরহে হৃদয়সাগরে যে শোকের বাড়বানল সৃজিত হইয়াছিল—তাহা নিভিয়া গেল। সেটুকু সম্পূর্ণ আমার পিতারই বুদ্ধিকৌশলে! তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে নির্জ্জনে থাকিতে দিতেন না। বন্ধুর ন্যায় অহোরাত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, মাতার ন্যায় আমার সমস্ত সুখসাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে মাতার অভাব বুঝিতে দিতেন না! আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে স্পষ্ট আমাকে বলিতেন,—

—"বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় বিবাহ কর;—আমি তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইব না! এখন তোমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এ সম্বন্ধে আমার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল! তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে—তাহা নিঃসঙ্কোচে করিতে পার,—আমি প্রাণ খুলিয়া তোমাকে অনুমতি দিতেছি!"

আবার বিবাহ? সরসীবালার মতন স্ত্রী যাহার সমস্ত হৃদয়টুকু চির-জীবনের মত দখল করিয়া লইয়াছে,—সেই বড় যত্নে প্রতিষ্ঠিতা সোণার প্রতিমাকে হৃদয়মন্দির হইতে তুলিয়া বিসর্জ্জন দিয়া আবার আর এক মূর্ত্তি, কি জানি কিসের, আনিয়া সেই পবিত্র স্থানে বসাইব? আমি কি পিশাচ—আমি কি লম্পট—আমি কি পশুবৃত্তিপরায়ণ? সরসী যে আমার ধর্ম্মপত্নী—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী! তাহার সহিত যে আমার ইহলোক পরলোকের অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ! আমি সেই স্বর্গগতা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া, তাহার পবিত্র প্রণয়ের নিদর্শন জীবন-সর্ব্বস্ব "খোকাকে" পর করিয়া অন্য রমণীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব? কেন? আমার কি পাপের ভয় নাই? আমি কি ঈশ্বর মানি না? আমি কি মানুষ নই?

খোকাকে লইয়া—পিতৃস্নেহে একরকমে দিন কাটিতে লাগিল! ডাক্তারিতে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় খুবই পসার হইয়া উঠিল! কি-জানি কি অদৃষ্টের গুণে এমন হাতযশ হইল যে আমি

নিজেই বিস্মিত হইলাম! মুমূর্ষু রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে! যাহাকে সকলে জবাব দিয়া যায়, আমি একদিন তাহাকে দেখিলে তাহার বাঁচিবার আশা হয়। আমার চিকিৎসায় শতকরা নব্বুই জন রোগী বাঁচে! সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার 'কলের' বিরাম নাই! ফি অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলাম, তবু 'কল' কমেনা! শেষে বাধ্য হইয়া জনকতক লোককে প্রত্যহ বিমুখ করিতাম! না করিলে আমার প্রাণ বাঁচে না!

বেশ দিন কাটিতেছিল—আবার দুঃসময় আসিয়া দেখা দিল! আমার বিলাত হইতে আসিবার পর—বৎসর যাইতে না যাইতে স্নেহময় পিতৃদেব ডায়েবিটিস্ রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি—তোমার জন্য যথেষ্ট রাখিয়াও গেলাম। তুমিও এই অল্পদিনের মধ্যে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলে। এখন আমার এই শেষ অনুরোধ, অর্থের সদ্ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসারে কর্ত্তব্যপালন করিতে থাক। চিকিৎসকের কার্য্য—পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবতার কার্য্য। অর্থের জন্য চিকিৎসক নির্ম্মম, কঠোর, হৃদয়হীন পশুরও অধম হইতে পারে; আবার স্বার্থত্যাগ করিয়া দীনদুঃখীদরিদ্রের মুখ চাহিয়া—তাহাদের দুঃখে আর্দ্র হইয়া অনন্ত পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে,—নরাকারে দেবতা হইয়া

অক্ষয় নাম ও দেহান্তে অবিনশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারীও হইতে পারে !”

পিতা তখন মৃত্যুশয্যায় ;—আর কয়েক দণ্ড পরেই আমাকে শূন্যময় সংসারে একা রাখিয়া জনমের মত চলিয়া যাইবেন ! আমি পিতার মৃত্যুতে একসঙ্গে পিতৃহারা মাতৃহারা বন্ধুহারা আত্মীয়হারা হইব ! সে সময় তাঁহার উপদেশবাক্যের সারত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম না। শোকের উপর শোক ! জগদীশ্বর ! মানুষ আর কত সহ্য করিতে পারে প্রভু ?

পিতার মৃত্যুতে অনেকে শোক প্রকাশ করিল। দেশে দেশে ঘরে ঘরে সত্য সত্যই হাহাকার পড়িল। যে যে গুণ থাকিলে লোকে যথার্থ “বড়লোক”—(নামে নয় কাজে “বড়-লোক”) হইতে পারে,—পিতার সে সকল গুণরাশি পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন,—তিনি দয়ার সাগর ছিলেন ! তিনি লোকের দুঃখ—দেশের দুঃখ, আত্মীয়স্বজনের দুঃখ বুঝিতেন এবং যথেষ্ট প্রতিকার করিতেন। সাহেবপল্লীতে সাহেবী কায়দায়—সাহেবনামে অভিহিত হইয়া তিনি বাস করিতেন বটে, কিন্তু যথার্থ হিন্দুয়ানী, বাঙ্গালীয়ানা চাল তাঁহাতে যতটা দেখিয়াছি—এতটা বোধ হয় আর কোনও হিন্দু বাঙ্গালীতে

দেখি নাই। কত অনাথিনী বিধবা, কত পিতৃহীন অনাথ বালক,—কত কন্যাদায়গ্রস্ত সামর্থ্যহীন পিতা, তাঁহার মুক্তহস্তের দয়াদানে প্রাণধারণ করিত, তাহা বলিবার কথা নয়! আমি সংসারে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। অন্ততঃ এইটুকু স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, পিতার মৃত্যুর পর এমন অবকাশ অথবা সুযোগ কাহাকেও দিই নাই, যাহাতে কেহ বলিতে পারে—"আমি পিতার অযোগ্য পুত্র!"

সংসারে আমি আর খোকা! আর আপনার জন কেহই নাই। চাকর দাসী দ্বারবান সহিস ইত্যাদির সংখ্যায় আমার প্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকা সমস্ত দিনরাত্রি যেন সরগরম হইয়া থাকিত। আমরা তো দুইটী প্রাণী,—দুই তিন জন চাকরদাসীতে আমাদের যথেষ্ট পরিচর্য্যা হইতে পারিত! পিতা বলিতেন,—"চাকর রাখি—বড়মানুষি দেখাইবার উদ্দেশ্যে নয়! তবু যে কয়টা দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়—হৌক্‌না!" বাবা রাখিয়াছিলেন—সুতরাং আমিও রাখিয়াছি।

"ফি" ১৬৲ টাকা করিয়াছি, ইহাতে "কল্" অনেকটা কমিলেও বৈকালে অন্ততঃ দশটা "Attend" করিতে হইত! তা-ও "না-ছোড়-বন্দা" হইয়া! খোকা প্রায়ই আমার সহিত "মোটরে" থাকিত! শীতকালে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে প্রায় সঙ্গে লইতাম,

না! রাত্রিকালে কেহ ডাকিলে—মাথা খুঁড়িলেও বাটীর বাহির হইতাম না।

একদিনের ঘটনায় হঠাৎ চৈতন্যের উদয় হইল,—পিতার শেষ উপদেশের সারাংশ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

বৌবাজারে একটী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাতশ্লেষ্মাবিকার হয়। রোগী দেখিতে গিয়া বুঝিলাম,—ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। সামান্য কেরাণীগিরিতে নির্ভর করিয়া কলিকাতা সহরে বাটী ভাড়া দিয়া চারি পাঁচটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীকে প্রতিপালন করেন। পরিবারস্থ কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে, পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নিকট হইতে নামমাত্র ঔষধের মূল্য দিয়া তাঁহার বাটীতে রোগীকে লইয়া গিয়া দেখাইয়া কোনরকমে রোগের ব্যবস্থাদি করিতেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ নিজে এই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। কোনও রকমে কাহারও দ্বারা কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া বিপন্না ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রতিবেশীবর্গের উপদেশে স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য আমাকে ডাকাইলেন। আমি উপর্য্যুপরি দু'দিন গিয়া রোগীকে দেখি-তেছি,—ঔষধ দিতেছি, ব্যবস্থা করিতেছি! রোগীর অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নয়,—তবে দেখি কি করিতে পারি! প্রত্যহ রোগীকে দেখিয়া গাড়ীতে উঠিতে না উঠিতে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটী একখানি দশ টাকার নোট এবং ছয়টী

টাকা আমার হাতে দিয়া শুষ্কমুখে বলিত, "ডাক্তার মশাই! মা ব'লে দিলেন, কাল একবার দয়া ক'রে আস্‌বেন কি?" আমি আনন্দের সহিত বলিতাম,—"হ্যাঁ—নিশ্চয়ই আস্‌ব।" এইভাবে প্রায় একপক্ষ কাটিল। চিকিৎসা করিলাম—কিন্তু রোগীর কোন উপকার হইল না। একদিন ব্রাহ্মণের রোগ একটু বাড়িয়াছে। আমি একটী প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া তাঁহার সেই ছেলেটীর হাতে দিয়া দরজার অন্তরালস্থিত ব্রাহ্মণ-পত্নীকে শুনাইয়া বলিলাম,—"এই ওষুধটা এখুনি আনিয়ে এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। আমি পারি যদি—রাত্রি দশটার পর একবার আসিয়া দেখিয়া যাইব। আর না আসি যদি,—তা'হ'লে আমার বাটীতে একটা লোক পাঠিয়ে খবর দিলে বড় ভাল হয়।" আমার কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না, আর উত্তর দিবেই বা কে? সেই ছোট বালকটী পিতার অবস্থার বিষয় বোধ হয় কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল; তাই ভয়ে বিষণ্নমুখে নিরুত্তরে আমার মুখপানে কেবল চাহিয়া রহিল। আমার মাথায় সে সময় রোগীর কথাই তোলাপাড়া হইতেছিল। রোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইতেছি, এমন সময় ব্রাহ্মণের সেই পুত্রটী তাহার তিন চারিটী ছোট ছোট ভাইবোনের সঙ্গে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে আমাকে বলিল,—"ডাক্তার

মশাই! যাঁ'র হাতে আজ একটাও পয়সা নেই; আপনার ভিজিট তাই দিতে পাল্লেন না! লোকজনও কেউ নেই যে কা'রও কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আন্‌বেন! আজ দু'দিন আমরা কয়টী ভাইবোনে মুড়ী খেয়ে কাটাচ্ছি! মা ব'ল্লেন— এই তাঁ'র হাতের বালা দু'গাছি আপনি নিয়ে যদি কা'রও কাছে আপনার ভিজিট আর ওষুধের দাম———"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বর্শা যেন আমার বুকে কে সজোরে বিঁধিয়া দিল! আমি বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া নিমেষের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম! পিতার অন্তিম শয্যায় সেই শেষ কথাগুলি বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—

"অর্থের জন্য চিকিৎসক নির্ম্মম কঠোর হৃদয়হীন পশুরও অধম হইতে পারে; আবার স্বার্থত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী দরিদ্রের মুখ চাহিয়া অবিনশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারীও হইতে পারে!"

আমি উন্মত্তের মতন ছুটিয়া মোটরকারে গিয়া বসিলাম ও "শফারকে" বলিলাম,—"জল্‌দী ঘর চল!" বাটী আসিয়া লৌহ-সিন্দুক খুলিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে লইয়া একবার ডিস্‌পেন্‌সারিতে গেলাম। তথা হইতে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া এবং আমার পরিচিতা একজন হিন্দু নার্স্‌কে সঙ্গে লইয়া আবার দ্রুত-

"মা ব'ল্লেন—এই তাঁর হাতের বালা ছ'গাছি আপনি নিয়ে যদি কারও কাছে আপনার ভিজিট আর ওষুধের দাম—"

(রত্নাকর—১০২ পৃষ্ঠা)

বেগে মোটর চালাইয়া বৌবাজারে সেই রোগীর বাটীতে আধ ঘণ্টার ভিতর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে ডাকিয়া বলিলাম,—"এই স্ত্রীলোকটী হিন্দু; সমস্ত দিনরাত্রি তোমার বাপকে ইনি দেখ্‌বেন,—ওষুধ খাওয়াবেন। এইখানে আমার একজন চাকর রাখিয়া দিচ্ছি,—দরকার হ'লে এ আমাকে বাটীতে গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌বে। আর এই ক'য়টী টাকা তোমার মাকে দাও, তোমাদের সংসারের খরচপত্র চালাবেন—যতদিন না তোমার বাবা সারিয়া ওঠেন! বোলো—এ টাকা আমি ধার দিচ্ছিনা; আমার মা নেই—আজ থেকে তোমার মা—আমার মা হ'লেন!"

ব্রাহ্মণপত্নী দরজার অন্তরালে ছিলেন,—আমার কথা শুনিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হাতে বলিলেন,—"বাবা! সত্য সত্যই কি অনাথের নাথ জগদীশ্বর আমাকে দেখা দিলেন?"

"ছিঃ মা – তুমি ব্রাহ্মণকন্যা,—আমি তোমার দাস; আমাকে অপরাধী কোরোনা!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠিয়া বসিলাম।

* * * *

দুই মাসের মধ্যে পিতার নামে একটী হাঁসপাতাল খুলিলাম—"নর্সিং দাতব্য চিকিৎসালয়!" পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত অর্থ

এবং খোকার জন্য কিছু রাখিয়া আমার উপার্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ সেই হাঁসপাতালের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। হাঁসপাতালের সমস্ত কার্য্য আমি নিজেই দেখিয়া থাকি। স্থির বুঝিয়াছি—ইহাই আমার জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য!

দক্ষযজ্ঞ

(অভিনেতার আত্মকথা)

আমি একজন অভিনেতা। এই বিশাল বিশ্বনাট্যশালায় সংসার-রঙ্গমঞ্চে বিশ্বপতিকর্ত্তৃক অভিনেতৃরূপে প্রেরিত হইয়াও আমি তৃপ্ত নই,—আবার ক্ষুদ্রশক্তিমানবনির্ম্মিত কোন একটী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি। অভিনয় করি নিজের প্রাণের সখে—কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট তাহার জন্য অর্থ লই—দারুণ অভাবে। অর্থ উপার্জ্জন করিব বলিয়াই যে অভিনেতৃদলে নাম লিখাইয়াছি—এমন কথা বলিব না। নাট্যকলাচর্চ্চায় যে একটা আনন্দ,—রঙ্গমঞ্চে কোন একটী ভূমিকা লইয়া সুন্দররূপে তাহা অভিনয় করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিবার যে একটা আকাঙ্ক্ষা,—একজন সুদক্ষ অভিনেতা

হইবার যে সখ,—এই গুলির সমষ্টিই আমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাম লিখাইবার মুখ্য কারণ।

আমার নিবাস এই সহরে। কলিকাতায় আমাদের বহুদিনের বাস। লোকেও বলে, আমি বুনিয়াদি ঘরের ছেলে; এখন "তাল-পুকুরের নাম আছে—কিন্তু ঘটী ডোবে না।" আমাদের সংসার খুব বৃহৎ। একান্নভুক্ত নহে,—সব "ভিন্ন হাঁড়ী,"—যেন বিদেশের একটী পান্থনিবাস। ভায়ে ভায়ে, খুড়ো-ভাইপোয়ে, বাপ-বেটায় পরস্পর পৃথক; এক বাড়ীতে আটটী রন্ধনশালা। সবাই পরস্পরের শত্রু। বিশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন। আমারই জ্ঞানে দেখিয়াছি, এই বৃহৎ বসুবংশ—যেন একটী ছোটখাটো রাজত্ব। আমার পিতামহ যখন বর্ত্তমান ছিলেন,—সকলেই তাঁহার অধীন ছিল,—এই পৃথক্ পৃথক্ আটটী বৃহৎ সংসার এক সংসার ছিল। পিতামহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মীও বসুবংশ পরিত্যাগ করিলেন। পিতা কিঞ্চিৎ কড়া-মেজাজী ছিলেন—খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত ইত্যাদি অন্যান্য সকলেও কিছু মেজাজে কম ছিলেন না;—কেহ কাহারও অন্নদাস নহে—সকলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার। সংসারে কে কাহাকে গ্রাহ্য করে?

পিতামহের লক্ষ্মীশ্রী ছিল কিনা—তাই তিনি ক্রোরপতি হইয়াও খুব মোটা চালে হিসাব করিয়া চলিতেন। তাঁহার

পরলোকগমনে সংসারে যেন একটা মহাস্রোত ফিরিয়া গেল। পিতা মহাশয় খুব বড়-মানুষী চালে চলিতে লাগিলেন। গাড়ীজুড়ী—চাকর খানসামা,—হামেহাল হাজির থাকিত। বিস্তারিত বর্ণনা আর কি করিব? কলিকাতা সহরে যেমন চালে চলিলে একটা "খোর্‌চে বড়লোক বাবু" বলিয়া লোকের কাছে খুব নাম বাজিয়া উঠে,—পিতা মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার একটীমাত্র পুত্র,—আদরযত্নের ব্যাপার তো বুঝিতেই পারিতেছেন! আমার বিবাহে ধুমধামে তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন। আমি "বড় মানুষের আদুরে ছেলে,"—লেখাপড়া কি রকম করি, বোধ হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। বই বগলে ফিট্ বাবুটী সাজিয়া জুড়ী চড়িয়া ইস্কুল যাই। চাকর দ্বারবান — সমপাঠীগণ তো খাতির করিবেই,—ইস্কুলের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত যেন আমাকে একটু সমিহ করিয়া চলেন দেখিতে পাই! ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলখাবারঘরে গিয়া সিগারেট্ টানি। বছর বছর ক্ল্যাশ্ প্রোমোশান্ পাই। কেন পাইব না? ক্ল্যাশের অধিকাংশ শিক্ষক প্রায় সকালসন্ধ্যায় বাবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন,—আমি এক্‌জামিনে ফেল্ হইব কেন?

ছেলেবেলায় আমিও ভাবিতাম, "যা'র বাপের এত পয়সা—সে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিবে কেন? যা'দের পয়সার অভাব,—রোজগার না করিলে হাঁড়ী চড়ে না, তা'রাই মাথা ঘামাইয়া

মুখব্যথা করাইয়া—প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া পড়া মুখস্থ করিবে। আমি কেন অত কষ্ট সহ্য করিব ?" একবার আধবার বাড়ীর মাষ্টারকে কৃতার্থ করিবার জন্য এক আধঘণ্টা বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। ইংরাজী বাঙ্গালা দু' পাতা দশ পাতা পড়িতে বরং ইচ্ছা হইত এবং পড়িতাম। কিন্তু জিওমেট্রি, অ্যাল্‌জ্যাব্‌রা ? বাপ্‌—যেন ব্যাঘ্রবিশেষ! আমি কখনো তাহাদের পাতা উল্টা-ইয়াও দেখি নাই!

পূজার সময় অথবা কোন ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে বাড়ীতে প্রায় থিয়েটার হইত। সখের এবং পেশাদারী—দুই রকমই। নাটক অভিনয় দেখিয়া অতি শৈশবকাল হইতেই আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইতাম! নাটক অভিনয় দেখিতে আমার যে কি পর্য্যন্ত ভাল লাগিত তাহা আমি মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিনা। বাড়ীতে অভিনয় দেখা ছাড়া—পিতার সহিত প্রায়ই রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে যাইতাম। এক রাত্রি নাটক অভিনয় দেখিয়া আমি পাঁচসাত রাত্রি তাহার স্বপ্ন দেখিতাম। বাড়ীতে ঠাকুর-দালানে খবরের কাগজ জুড়িয়া—তাহাতে কালী দিয়া আঁক কাটিয়া সিন্‌ তৈয়ারি করিতাম। বাঁখারিতে রূপালি কাগজ জুড়িয়া "বীর-তরবারি" প্রস্তুত হইত,—জরী সাটিন মখমলের জামা—ভাল ভাল কাজ করা টুপী লইয়া অভিনয়ের পরিচ্ছদাদির কার্য্যে লাগাইতাম,—বাড়ীর অন্যান্য সমবয়সী ছেলেদের লইয়া দস্তুরমত

থিয়েটার করিতাম। বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েদের খোসামোদ করিয়া ভুলাইয়া দর্শকবৃন্দরূপে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে সারি সারি বসাইয়া দিতাম। ফল কথা, অনুষ্ঠানের কিছুই ত্রুটী হইত না। শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে নাটক আমার সঙ্গের সাথী হইয়াছিল। পড়িবার ঘরে পড়িতে বসিয়া ইস্কুলের বই ঠেলিয়া ফেলিয়া নাটকে মন নিবিষ্ট করিতাম। ইস্কুলে শিক্ষককে লুকাইয়া এক কোণে বসিয়া নাটক পড়িতাম। বাবা দিনরাত্রি বন্ধুবান্ধব লইয়া আপনার আমোদে আপনিই উন্মত্ত থাকিতেন। আমার লেখাপড়া-সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার তাঁহার অবসর কোথায়?

ক্রমে বয়স হইতে লাগিল। বার কতক এণ্ট্রেন্স্ একজামিনে ফেল্ হইয়া মা সরস্বতীকে বিদায় দিলাম। পাড়ায় একটী অবৈতনিক নাট্যসম্প্রাদায় ছিল। সে সম্প্রদায়ে সমস্ত পুরুষ,—স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষের দ্বারায় অভিনীত হইত। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে তাহারা অভিনয় করিত। দলস্থ সকলেই আমাকে ভালবাসিত—আমাকে দলভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিত। কিন্তু বাবা জানিতে পারিলে হয়ত' রাগ করিবেন—তিরস্কার করিবেন,—এই ভয়ে তাহাদের দলে যাইতাম না। মনের ষোলো আনা ইচ্ছা,—গিয়া যোগদান করি, কিন্তু পিতা-মাতার ভয়ে পারিতাম না। ক্রমে ইস্কুল ছাড়িয়া দিয়া—"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে"—উপরন্তু বিবাহ করিয়া,—হৃদয় হইতে

তিরস্কারভয় যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। তখন একটু স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া সেই নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করিলাম। ঈশ্বর-ইচ্ছায় চেহারাখানা মন্দ নহে,—সাজিলে লোকেরা বলিত,—"আহা—ঠিক যেন রাজপুত্র!" সকল নাটকে আমি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতাম,—বেশী টাকা চাঁদা দিই বলিয়াও বটে,—সুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারিতাম এবং চেহারা ভাল—ইহাও তাহার প্রধান কারণ। যাঁহারা যাঁহারা আমার অভিনয় দেখিতেন—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন "কালে বিনোদবিহারী বঙ্গদেশে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইবে!" লোকের মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া আমার বুকখানা যেন দশহাত হইত।

ক্রমে কথাটা পিতামাতার কাণে উঠিল। তাঁহারা একদিন আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন। আমি পিতার সম্মুখে কোনও উচ্চবাচ্য করিলাম না। আহারের সময়ে মাতার সহিত তর্ক আরম্ভ করিলাম। মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে,—"ভদ্রসন্তান কয়জনে মিলিয়া নাট্যকলা-বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছি, তাহাতে দোষ কি?" মাতা আরও রাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি ও কলাপোড়ার বিদ্যের মুখে ছাই দিই! ভদ্রলোকের ছেলে লোকের বাড়ী বাড়ী নেচে নেচে বেড়াস্—এ কোন্ দিশি কথা? তোর জন্যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনা—তা জানিস্? সবাই

নিন্দে করে,—সবাই বলে,—ছেলেটা একেবারে বোয়ে গেছে!" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তোমারই কাছে এসে কেবল নিন্দে করে—কিন্তু আমার কাছে তো সবাই সুখ্যাতি করে!" মা বলিলেন, "ছাই করে! সেদিন তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে ঝি তত্ত্ব নিয়ে এসে ব'ল্লে কিনা "হ্যাঁ মা—ছোট জামাই বাবু নাকি থিয়েটার ক'রে বেড়ান? আমাদের বাড়ীশুদ্ধু মেয়েমদ্দ তোমার বেয়ানের কাছে কত অখ্যাতি ক'চ্ছে,—ছি—ছি—ছি! তুমি বারণ ক'র্ত্তে পার না মা?" তোর জন্যে এই সমস্ত নিন্দে আমায় কাণে শুনতে হ'চ্ছে! তুই এমন পোড়া সখ্ কেন ছেড়েই দে না!" সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়া রহিয়া গেল। তাহার পর আর বিশেষ তর্ক হইত না,—তাহার কারণ "বোবার শত্রু নেই!" মা বকিতে লাগিলেন—আমি চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম! ক্রমে পিতামাতারও যেন এই ব্যাপারটা গা-সওয়া হইয়া গেল। আমার তো বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছে।

এইবার আমার শ্বশুরালয়সম্বন্ধে একটু আভাষ দিয়া রাখি। আমার শ্বশুরালয় এই কলিকাতা সহরেই। শ্বশুর মহাশয় "স্বনামপুরুষোধন্য"—একপুরুষে বড় লোক। তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। তিনি স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে—হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও চারিটি কন্যা। পুত্রগুলি এক একটী রত্ন

বলিলেও চলে ;—জ্যেষ্ঠ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মধ্যম উকীল, তৃতীয় ডাক্তার, চতুর্থটী এম্ এ পাশ করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। কনিষ্ঠ বি, এ, পড়িতেছেন। শুনিতে পাই—বি, এ, পাশ করিয়া বিলাতে র‍্যাংলার হইতে যাইবেন। মোটকথা শ্বশুর মহাশয়ের "ধনেপুত্রে লক্ষীলাভ !" জামাতা তিনজন ধনী না হইলেও সকলেই বিদ্বান ;—একজন মুন্সেফ্, একজন ডাক্তার, একজন প্রোফেসার। কনিষ্ঠ আমি। আমার তো এই হাল।

আমি বড় একটা শ্বশুরবাড়ীর দিকে ঘেঁসিতাম না। সেখানে কাহারও সহিত আমার বড় বনিত না। আমোদ আহ্লাদ রঙ্গরহস্য শ্বশুরের ভিটায় একেবারে বর্জ্জিত ছিল। সকলেই লেখাপড়ার কথা কহিতেই ব্যস্ত,—কিম্বা বড় জোর দুটী চারিটী বৈষয়িক কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইতাম। কদাচিৎ কায-কর্ম্মোপলক্ষে যদি শ্বশুরবাড়ী যাইতাম,—শ্বশুর, সম্বন্ধী, শ্যালিকা ইত্যাদি সকলেই বলিতেন—"এত অল্প বয়সে লেখাপড়াটা ছাড়্লে বিনোদ !" ইহা ভিন্ন তাঁহারা অন্য কথা আর জানিতেন না। আমি সেখানে গেলে যেন কারাবদ্ধের যন্ত্রণা অনুভব করিতাম। তাড়াতাড়ী পলাইয়া আসিলেই যেন বাঁচি ! শ্যালিকাসম্প্রদায় বিদ্বান পতিলাভ করিয়া সকলেই যেন মনে মনে একটু গর্ব্বিতা,—সকলেরই গম্ভীর চালচলন—কথাবার্ত্তা—হাবভাব ! অন্ততঃ আমার

কাছে,—এইরূপই আমার মনে হইত। কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্যও করিতাম না,—কারণ আমি "বড়লোকের ছেলে!"

আমার পত্নী নলিনীবালা একটী "গো-বেচারী"। পৈতৃক-স্বভাব গাম্ভীর্য্যভাব তাহাতে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। প্রাণে কোনপ্রকার সখের ছায়া পর্য্যন্ত নাই। লিখিতে পড়িতে বেশ জানে,—কিন্তু কখনো নাটক নভেল পড়িতে দেখি নাই। থিয়েটার যাত্রা নাচ গান—এ সমস্ত আমোদপ্রমোদ তাহার একেবারেই ভাল লাগিত না। বিবাহের পর দুই এক বৎসর তাহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম,—কিন্তু ইদানীং (বিশেষতঃ আমি লেখাপড়া ছাড়িবার পর) তাহাকে যেন কেমন একটু বিষণ্ণ দেখি। কিন্তু আমাকে কিছু বলিত না—বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। এক দিন আমি কথাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা,—তুমি অমন দিনরাত গোম্‌ড়ামুখী হ'য়ে থাক কেন বল দিকি?" উত্তর পাইলাম, "বাড়ীর পাঁচজনে তোমার নিন্দে করে—আমার শুনে বড় কষ্ট হয়!" আমি বলিলাম, "কেন?" নলিনী বলিল,—"তুমি থিয়েটার কর,—রাত্রি ক'রে বাড়ী আস,—যত বদ্‌ছেলেদের সঙ্গে মিশেছ ব'লে!" আমি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম,—"নিন্দে করে তো বড় বয়েই গেল। তুমি কাণ দাও কেন?" নলিনী আর উত্তর করিল না।

এই ভাবেই দিন যায়। আমি সংসারের কোনও খবর রাখিনা। কেবলমাত্র খাবার সময় বাড়ী আসি,—আর সমস্ত দিন থিয়েটারের কার্য্যেই—থিয়েটারপ্রসঙ্গ লইয়াই "আখড়া" বাড়ীতে অতিবাহিত করি। প্রত্যহ রাত্রে নাটকের রিহার্স্যাল (মহলা) চলে। রাত্রে বাড়ী ফিরিতে কোনদিন ১১টা বাজে—কোন দিন ১২টা বাজে; আবার যে দিন কোন প্রকার ভোজের আয়োজন হয় অথবা থিয়েটার দেখিতে যাই,—সে'দিন রাত্রি ২।৩টাও বাজে। চুপি চুপি বাড়ী যাই,—কারণ, অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসিলে বাবা মা খুব তিরস্কার করেন। চাকরকে ঘুস্ খাওয়াইয়া চুপি চুপি সদর দ্বার খুলাইতাম; শয়নকক্ষে গিয়া দেখিতাম,—নলিনী অনিদ্রায় জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি লজ্জায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। এক এক দিন লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতাম,—"তুমি ছেলেমানুষ—কেন এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাক? ঘুমাইতে পারনা?" নলিনী বলিত, "দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে—তোমাকে দরজা খুলিয়া দিবে কে বল? ডাকাডাকি করিলে বাড়ীর সকলে জানিতে পারিবেন,—তুমি লাঞ্ছনা পাইবে। আর, দরজা খুলিয়া শুইতে আমার বড় ভয় করে!" নলিনীর কথা শুনিয়া বড় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। সে সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম,—"দূর হোক্—আর রাত্রি করিব না,—এ' বার থেকে সকাল সকাল আসিব।" কিন্তু হায়—

দলে পড়িয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম! আমোদ প্রমোদ—নাটক অভিনয় যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ফলে, "আমি আজকাল একজন বড়দরের অভিনেতা,"—চতুর্দ্দিকে লোকের মুখে এইরূপ প্রচার হইতে লাগিল। ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। তাঁহাদের সহিত ক্রমে ক্রমে আমার আলাপপরিচয়—শেষে খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া পড়িল। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। আমি শিহরিয়া বলিলাম,—"বাপ্‌রে! বেশ্যার সহিত অভিনয় করিব? তা'য় পাব্‌লিক্ থিয়েটারে? প্রাণ গেলেও না!"

*   *   *   *   *

মনুষ্যের অবস্থা—সুখদুঃখ—চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং চিরদিন কখনও সমান যায় না,—প্রবাদগুলি অতি পুরাতন হইলেও অতি সত্য! কিছুকাল পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইল। এতকাল সংসারের কিছুই দেখি নাই! যখন দেখিলাম—বুঝিলাম—জানিলাম—শুনিলাম, তখন চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল! পৈতৃক সম্পত্তি আমাদের অংশে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—উপরন্তু পিতামহাশয় বিস্তর টাকা দেনা রাখিয়া গিয়াছেন! যথার্থই চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম! আর "বড় লোকের ছেলে" বলিয়া দম্ভ করিবার উপায় নাই! আর বড়-মানুষি করিয়া গাড়ীজুড়ি হাঁকাইয়া—গায়ে

হাওয়া লাগাইয়া আমোদ করিবার সঙ্গতি নাই! এখন অন্নমুষ্টি-সংস্থানশূন্য—ঋণগ্রস্ত—দীনহীন দরিদ্র! অলঙ্কারাদি জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল,—একে একে বিক্রয় করিয়া তখন ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়বর্গ মুখ টিপিয়া টিপিয়া আমাদের দুর্দ্দশায় হাসিতে লাগিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, আমি গিয়া তাহাদের শরণাগত হইব! কিন্তু তখনও আমার প্রাণে ভয়ানক দম্ভ! আমি এত দুর্দ্দশায় কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলাম না! পিতার মৃত্যুতে অভাগিনী জননী শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন। যে দিকে চাই—সেই দিকেই দেখি—মহাবিপদ! কিন্তু এ বিপদে আমার একমাত্র সহায়—একমাত্র ভরসা—একমাত্র সান্ত্বনা,—সেই ক্ষুদ্র বালিকাপত্নী—নলিনী! অম্লানবদনে আপনার সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়া আমায় বিক্রয় করিতে দিয়াছে,—প্রাণপণে আমার রুগ্না জননীর সেবা করিতেছে,—আমার মনের কথা মুখে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার সকল কার্য্যে সহায়তা করিতেছে! বিপদ একা আসে না—এ' কথা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি,—এ'বার নিজে ভুক্তভোগী হইয়া হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম। পিতার পরলোকগমনের ছয় মাস পরেই স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন। ভাবিলাম,—দুর্দ্দশার কি আরও বাকি আছে?

পৈতৃক বাটীর অংশ দেনার দায় হইতে কোন রকমে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু দিন বুঝি আর চলেনা। শ্বশুরবাটী হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে সংবাদ লইয়া থাকেন,—কন্যাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রায়ই লোক পাঠান, কিন্তু নলিনী যাইতে চাহে না। আমি যাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলে বলে,—"যখন সুসময় ছিল, তখন বাপের বাড়ী বড় একটা যাই নাই,—এখন দুঃসময় পড়িয়াছে, কোন্ মুখ লইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইব?" কথাটা যুক্তিসঙ্গত বুঝিয়া আমিও বড় পীড়াপীড়ি করিতাম না। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কিম্বা শ্যালকেরা—কেহই একদিন আমাদের বাড়ীতে আসেন নাই। আমি বুঝিলাম,—"না আসে বরং ভাল!"

কি চাকুরী করিব, কাহার নিকট চাকুরীর জন্য যাইব, চাকুরী কেমন করিয়া জোগাড় করিতে হয়,—তাহা কিছুই জানিনা! লেখাপড়াও তেমন জানিনা! বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল! একদিন একজন বলিল,—"চাকুরীর ভাবনা কি? এখনি থিয়েটারে গেলে মোটা মাহিনা পাও!" কথাটা শুনিয়া মনে বড় ঘৃণা হইল। নলিনীকে বলিলাম,—"থিয়েটারে চাকুরী করিব? তুমি কি বল?" সরলা বালিকা যেন চমকিয়া উঠিল। করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিল,—"ঐটী করিও না—আর যা খুসী কর! চেষ্টা করিলে একটা না একটা চাকুরী জুটিবেই!"

থিয়েটার হইতে দু' এক জন লোক আমার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। বলিল,—"তোমাকে মাসিক ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা দিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকৃত আছেন!" কথাটা এ অবস্থায় আমার পক্ষে খুব লোভজনক বটে,—কিন্তু লোকনিন্দা—ভয় তখনও মনে যথেষ্ট প্রবল! বিশেষতঃ, নলিনী একেবারেই এ কার্য্যের অনুমোদন করেনা। থিয়েটারে যোগদান করায় আমার আপত্তির কারণ শুনিয়া একদিন আমার সেই বন্ধু আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"না খেতে পেয়ে—ভিক্ষে ক'রে ম'র্বে—সেটা বুঝি খুব বুদ্ধিমানের কাজ? তবু নিজে রোজগার ক'রে—নিজের অন্নসংস্থান ক'র্ত্তে পার্বে,—সেটা মাগের কথা শুনে উপেক্ষা ক'চ্ছ" সকল কথায় যদি প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধি শুন্‌তে হয়—তা'হ'লে আর সংসারধর্ম্ম করা চলেনা। তোমার নিতান্ত দুঃসময় কিনা—তাই এই রকম মতিচ্ছন্ন হ'চ্ছে!"

মনে মনে নানা তর্ক উপস্থিত হইল। এখন কি করা কর্ত্তব্য? থিয়েটারে চাকুরী করা ভিন্ন উপায় কি? কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না,—কাহারও খোসামোদ করিতে হইবেনা,—অথচ দুটী প্রাণীর সংসার পরিচালনের জন্য ১০০৲ টাকা যথেষ্ট হইবে! এমন সুযোগ কি পরিত্যাগ করিব? কিসের লোকনিন্দা? এইতো এত ভদ্রসন্তান থিয়েটার করিতেছে,—লোকনিন্দায় তাহাদের কি ক্ষতি হইতেছে? আমারই বা কি আসে যায়? আমি অর্থাভাবে

এত কষ্ট পাইতেছি,—কোন্ লোক যাচিয়া আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতেছে? উপকারে কেহ নাই, নিন্দা করিবার বেলায় সকলে আছেন? আমি সে নিন্দা গ্রাহ্য করিনা,—আমি থিয়েটারে চাকুরী করিব। নলিনীকে এখন কিছু বলিব না; যখন জানিতে পারিবে,—তখন বুঝাইয়া তাহাকে তুষ্ট করিব। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃরূপে যোগদান করিয়া চাকুরী স্বীকার করিলাম। দুই এক রাত্রি অভিনয় করিবার পরই চতুর্দ্দিকে আমার নাম প্রচার হইয়া পড়িল। নলিনীর কাণে এ সংবাদ পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। অভাগিনী ইহা শুনিয়া একেবারে গুম্ খাইয়া গেল,—এ সম্বন্ধে আর কোনও দিন কোন কথা আমার নিকট উত্থাপন করিল না। আমিও তাহাকে কিছু বলিলাম না।

থিয়েটারে যোগদান করিয়া দেখিলাম, বিশ্বসংসার হইতে যেন আমি তফাৎ হইয়া পড়িয়াছি। থিয়েটারের বাহিরে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারিনা। লোকে আমার সহিত আলাপ পরিচয় করে,—কিন্তু আমার মনে হয়, যেন তাহার মাঝখানে কি জানি একটা কিসের বেড়া পড়িয়াছে! সকলেরই সঙ্গে যেন একটু ছাড়াছাড়া ভাব! ভালমন্দ, ছোটবড়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্র,—সকলেই আমার নিন্দা করে! সম্মুখে আসিয়া হয়তো আমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়া যায়,

কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিলেই বলে,—"ওটা অধঃপাতে গেছে ! ছি ছি— ভদ্রঘরের ছেলে, বড় ঘরের ছেলে ! বেশ্যার সঙ্গে পাব্‌লিক্ থিয়েটার ক'রে বাপ ঠাকুর্দ্দার নামে,—বংশের নামে কলঙ্ক দিলে?" কেহ কেহ বলে,—"আমি বরাবরই ব'লে এসেছি, ওর শেষ এই পরিণাম হবেই।"

স্ত্রীলোকের দল—বিশেষতঃ—আমারই জ্ঞাতকুটুম্বরমণীগণ আমাকে কিছু না বলুন,—নিরপরাধিনী চিরদুঃখিনী অভাগিনী নলিনীকে আমার কথা লইয়া কত টিট্‌কারীই না দেয় ! আহা— সে সরলা বালা—সে সমস্ত শুনিয়া কি করিবে ? নীরবে প্রাণের যন্ত্রণা প্রাণে চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া থাকে ! আমাকে সে সকল কথা সে নিজে কিছু বলেনা বটে,—কিন্তু লোকপরম্পরায় আমি তাহা সকলই শুনিতে পাই ! পাইয়াই বা কি করিব ? হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে—আর উপায় নাই ! যে পথে পদার্পণ করিয়াছি তাহা হইতে ফিরিবার আর কোনও পন্থা নাই ! থাকিলেও আমার আর শক্তি নাই ! মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিই—"আমার অদৃষ্টে যা' আছে—কে তা' খণ্ডন ক'র্ব্বে ?"

নলিনী কথা কহেনা—হাসেনা—চুল বাঁধেনা—পুরাতন কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় পরেনা ! সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে অতি অল্পদিনের মধ্যে এমন একটা ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—যাহা

দেখিয়া আমি বিশেষ রকম চিন্তাযুক্ত ও ভীত হইয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কি কোনও অসুখ ক'রেছে?" মলিন বদনে একটা ক্ষীণ শুষ্ক হাসি হাসিয়া নলিনী বলিল,—"না,—কিছু তো হয়নি!" থিয়েটারে চাকুরী পাইয়া—আমি বাড়ীতে একটী দাসী এবং পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। পাচিকা রাখিতে নলিনী কিছুতেই সম্মতা হইল না। আমাকে বুঝাইয়া বলিল,—"এত দুরবস্থায় রাঁধুনি রেখে মিছে খরচ বাড়াবার আবশ্যক কি? আমি কি আর তোমাকে দুটী রেঁধে খাওয়াতে পার্ব্বনা?" সুতরাং পাচিকাকে বিদায় করিলাম।

শ্বশুরবাড়ী হইতে আর কেহ কোনও সংবাদ লইতে আসেনা। জনশ্রুতি এইরূপ, শ্বশুর মহাশয় আমার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন,—"আমার ছোট মেয়ে—ছোট জামাই দু'জনেই ম'রেছে!" বাড়ীর সকলের প্রতি কড়া হুকুমজারি করিয়াছেন,—"খবরদার—তা'দের নামগন্ধও যেন আমার বাড়ীতে না হয়!" কথাগুলি যে নিতান্ত অলীক নহে—তাহারও অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। ঝি-মহলে সংবাদটা প্রথমে প্রচার হয়। শাশুড়ী ঠাকুরাণী—(হাজার হোক্—মায়ের প্রাণ-) খুব গোপনে বিশ্বস্ত লোকের দ্বারায় কন্যার তত্ত্ব লইয়া থাকেন। যাহা হউক্—এই রকমে তো দিন চলিতে লাগিল। আমি সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকি—সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া যাই। অভিনয়রাত্রে বাড়ী

ফিরিতে প্রায় তিনটা বাজিত। অন্যদিন অন্ততঃ বারোটার পূর্ব্বে কিছুতেই বাড়ীতে আসিতে পারিতাম না। আসিয়া দেখি,—নলিনী আমার খাবার লইয়া একাকিনী আমার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি আসিয়া আহারাদি করিবার পর তবে সে আহার করিতে যাইত। আমি অনেক অনুরোধ করিয়াছি, তবু সে এই বিষয়ে চিরদিনই আমার অবাধ্য ছিল। আহার করিতে যাইত বটে,—কিন্তু আহার করিত কি না করিত—তাহা সেই জানে! এই ভাবে আমি আমার দুঃখময় অভিনেতৃ-জীবন যাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন রবিবারে বৈকালবেলা থিয়েটারে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি,—হঠাৎ নলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমাদের থিয়েটারে কিসের পালা হইবে?" অদ্যাবধি এমন কথা কখনো সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই,—আজ তাহার মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমি যেন একটু বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, "দক্ষযজ্ঞ। কেন বল দেখি?" নলিনী হাসিয়া বলিল,—"তুমি বুঝি 'মহাদেব' সাজ্‌বে?" আমার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল,—আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আজ থিয়েটারের কথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ,—এর মানে কি নলিনি?"

নলিনী বলিল,—"আমার বাপের বাড়ীতে আজ সত্যিকার 'দক্ষযজ্ঞ' হ'চ্ছে। আজ আমার সেজদাদার বিয়ে,—তোমার

আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ!" আবার সেই শুষ্ক বদনে ক্ষীণ মৃদু হাসি,—সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতিঃহীন নয়নকোণে দুই ফোঁটা অশ্রুজল!

প্রাণে আমার বড়ই আঘাত লাগিল। সেই সঙ্গে আপনাকে মনে মনে সহস্র ধিক্কার দিলাম। হায়! আমার জন্যই এই নির্দ্দোষী বালিকার এত জ্বালা—এত অপমান—এত মনোকষ্ট! আমাকে নীরব দেখিয়া পতিপ্রাণা সতী বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া—অতি স্নেহসূচকস্বরে বলিল, "আমাকে নেমন্তন্ন ক'ল্লেও তো আমি যেতুম না। যা'রা তোমার নিন্দে করে—তা'রা তো আমার পরম শত্রু! যেখানে তোমার নিন্দে হয়—সে যদি স্বর্গও হয়—আমি কিছুতেই তো সেখানে যেতে পার্ব্বনা!" এত দুঃখেও আমার মনে মনে যেন স্বর্গসুখ অনুভব হইল! মনে হইল,—"নলিনীর মতন সতীসাধ্বী স্ত্রী যা'র,—তা'র তুল্য ভাগ্যবান পৃথিবীতে কে আছে? কে বলে আমি দুঃখী,—কে বলে আমার দুর্ভাগ্য?"

কথা কহিতে কহিতে নলিনী হঠাৎ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুয়ে প'ড়লে যে? অসুখ ক'চ্ছে নাকি?" নলিনী বলিল,—"বড্ড মাথা ধ'রেছে—একটু যেন জ্বরভাব হ'য়েছে! দাঁড়াতে পারিনা—একটু শুই!" আমি তাড়াতাড়ী কাছে বসিয়া কপালে

হাত দিয়া দেখিলাম—ভয়ঙ্কর গরম ! বড় ভয় হইল ! তৎক্ষণাৎ ঝিকে দিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিলাম এবং শীঘ্র আসিতে বলিলাম। নলিনী বলিল,—"এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ? এ আমার বাতিকের জ্বর,—মাঝে মাঝে এমন হয় ! কাল সকালে কিছু থাক্‌বে না। তুমি থিয়েটারে যাও—একটু সকাল সকাল আস্‌বার চেষ্টা কোরো ! " আমার মুখে আর কথা সরিল না,—আমি নীরবে নলিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। নীরবে কপালে হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দুইটী প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এখন তো কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতেছি না,—তবে কি Turn নেবে—কে বলিতে পারে ? যাহা হোক্‌—এই দুইটী ঔষধ একঘণ্টা অন্তর পাল্‌টা পাল্‌টি করিয়া খাওয়াইবেন। আজ যদি না বাড়ে—কাল সকালে আমাকে খবর দিবেন। আর যদি রোগ বাড়িতেছে দেখেন, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই খবর দিবেন,—আমি আসিয়া দেখিয়া অন্য ব্যবস্থা করিব।" ডাক্তার বাবু বিদায় হইয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথার মর্ম্ম যেন ভাল বলিয়া বোধ করিলাম না। নলিনী আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল,—"তুমি কেন এত ভাব্‌ছ ? আমার কি হ'য়েছে যে তোমার এত ভয় হ'ল ? ঝিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে বরং ওষুধ দুটো পাঠিয়ে দাও,—আমি আপনি দেখেশুনে নোবো এখন !" আজ

আর থিয়েটারে যাইতে প্রাণ চাহিতেছে না—অথচ না গেলেও নয়! কারণ আমারই Main Part প্রধান ভূমিকা—"দক্ষযজ্ঞে —মহাদেব!" আমার স্ত্রীর অসুখ—দর্শকবৃন্দ তাহা বুঝিবেন কেন? তাঁহারা পয়সা দিয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছেন! থিয়েটারে যাইতেই হইবে। অগত্যা বড় পিসিমার শরণাপন্ন হইয়া পড়িলাম। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে আমি না আসা পর্য্যন্ত নলিনীর নিকট বসিতে বলিলাম। চক্ষুলজ্জার খাতিরে এবং সময়ে অসময়ে আমাদের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছেন—কতকটা সে কারণেও বটে,—তিনি নলিনীর নিকট আসিয়া বসিয়া আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন। আমি "যত শীঘ্র পারি আসিতেছি" বলিয়া ঝিকে সঙ্গে করিয়া দারুণ দুশ্চিন্তার বোঝা মস্তকে লইয়া ডাক্তার-খানা হইতে ঔষধ কিনিয়া ঝিকে দিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কি রকম ভাবে খাওয়াইতে হইবে—তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম।

থিয়েটারে গিয়া সকলকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে দুঃখপ্রকাশ করিলেন বটে—কিন্তু অভিনয় করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই! যখন উপায় নাই—তখন অগত্যা সাজসজ্জা করিয়া অভিনয় করিতে হইল! কিন্তু প্রাণের ভিতর যে কি হইতে লাগিল,—তাহা জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না। যাহা হৌক্—কোন রকমে সে রাত্রে অভিনয়কার্য্য শেষ করিলাম।

অভিনয় শেষ হইবামাত্রই তাড়াতাড়ী বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া কয়েকজন সম্প্রদায়-ভুক্ত বন্ধু সমভিব্যাহারে যেন উড়িতে উড়িতে বাড়ী আসিয়া কম্পিত অন্তরে একেবারে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। শয্যায় অজ্ঞানাবস্থায় আমার জীবনসঙ্গিনী—আমার আত্মীয়স্বজনবন্ধু-বান্ধবহীন সংসারারণ্যের একমাত্র আলো-করা ফুল্লনলিনী শুষ্কপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে দৃশ্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—কিন্তু চোখে জল আসিল না! সে অশ্রু ভীষণ অনলে পরিণত হইয়া বক্ষে থাকিয়াই আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল! ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"জীবনের আশা অতি অল্প,—নাই বলিলেও চলে। চোরা সন্নিপাতিক হইয়াছে! দেখি—Inject ইন্‌জেক্ট্ ক'রে কি হয়!"

যাহা হইবে—তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিলাম! তবু—"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। আমি ধীরে ধীরে শয্যায় বসিয়া—নলিনীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলাম,—"নলিনি! নলিনি! একটীবার 'চেয়ে দেখ! যাবার সময় একটা শেষ কথা কও!" ধীরে ধীরে আমার মুদিতা নলিনী নয়ন উন্মীলন করিল। আমি আবার ডাকিলাম,—"নলিনি!" নলিনী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল—"অ্যাঁ—যাই!" এই বলিয়া বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আমি বলিলাম,—"নলিনি! আমার হাতে প'ড়ে বড়

কষ্ট পেয়েছ,—আশীর্ব্বাদ করি—পরজন্মে সুখী হও,—অভাগাকে মার্জ্জনা কর!”

ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন। ধীরে ধীরে হতভাগ্যের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুণ্যবতী সতী—স্বামীনিন্দায় ব্যথিতা সতী—কলিযুগের “দক্ষযজ্ঞে” অনিমন্ত্রিতা সতী দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কাঁদিবার কেহ নাই,—কান্নার রোল তুলিবে কে? বন্ধুবান্ধবগণের সাহায্যে ফুলালঙ্কারে সেই পবিত্র সতীদেহ ভূষিত করিয়া শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চেতনরহিত জড়পদার্থের মত চলিতেছি,—আপনার অস্তিত্বজ্ঞানশূন্য! কোথায় যাইতেছি—কি করিতে যাইতেছি—কাহাকে লইয়া যাইতেছি—যেন কিছুই মনে পড়িতেছে না!

আবার চৈতন্যের উদয় হইল! দেখিলাম—চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! বুঝিলাম—ঐ অনলে আমার হৃদ্‌পিণ্ড দগ্ধ হইতেছে! আবার কি হইল—মনে নাই।

বন্ধুগণ বলিল,—“ওঠো—আর ব’সে ভাব্‌লে কি হবে? স্নান ক’রে নিই চল!”

আমি বলিলাম,—“অস্থি গঙ্গায় দিব,—দাও!”

সেই পবিত্র শেষচিহ্নহস্তে ধীরে—ধীরে জাহ্নবীগর্ভে অবতীর্ণ হইলাম। দেখিলাম—পূতপ্রবাহিনী কল্লোলিনী মাতা ভাগিরথী আপনার মনে রঙ্গে ভঙ্গে সাগরোদ্দেশে চলিয়াছে! দূরে—অতি

দূরে দেবীর পবিত্র গর্ভে সতীদেহের সেই পবিত্র অস্থি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—

"জীবনের অলঙ্কার ছিল রে আমার—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে !"

দর দর অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সেই পবিত্র সলিলে মিশিয়া গেল !!

দিনে ডাকাতি

১

ভাগলপুরে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বড়দরের উকীল। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস,—কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর যাবৎ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন। শ্যামনগরে এখন আর একেবারেই পদার্পণ করেন না। পৈতৃক বাটী এক্ষণে শৃগাল, কুক্কুর এবং তস্করের বিশ্রাম-স্থানে পরিণত হইয়াছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীণ, বিজ্ঞ, বিদ্বান এবং আইনজ্ঞ উকীল। যে মক্কেলের মোকর্দ্দমার ভার তিনি লইতেন—তাহার জয়লাভ নিশ্চিত। তিনি মনে করিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন,—কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। যে পরিমাণ অর্থ হইলে একটা গৃহস্থের সংসারের মোটামুটী রকম অভাবগুলি দূরীভূত হয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার অধিক সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে যত্নবান হইতেন না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অদ্ভূত প্রকৃতির লোক। মুখে সদাই গাম্ভীর্য্যের ভাব বিদ্যমান ;—অধরপ্রান্তে কেহ কখন ভ্রমেও হাসির

রেখা দেখিতে পায় নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সে মুখ দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া যায়। বয়স প্রায় ছাপ্পান্ন বৎসর,—কিন্তু দেহে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি। মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ—দীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রু ; রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষুদ্বয় ;—শ্যামবর্ণ স্থূল শরীর ; সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিলেই স্বভাবতঃ সকল লোকেরই প্রাণে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন মেঘের গর্জ্জন অনুমান হয়।

পাড়ার লোকেরা তাঁহার অলক্ষ্যে এবং অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে "বুনো মহিষ" বলিয়া ডাকিত। ভক্তিতে না হৌক্—ভয়ে তাঁহাকে সকলেই সম্মান করিত। পথে ঘাটে মাঠে বালকের দল বেড়াইতে বেড়াইতে কিম্বা খেলা করিতে করিতে অকস্মাৎ যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আসিতে দেখিত,—তৎক্ষণাৎ "ঐ বুনো মোষ্ আস্‌ছে রে" বলিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিত। সিগারেট্ মুখে করিয়া তো দূরের কথা,—যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বালক মাথায় তেড়ী কাটিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে পড়িত, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। চোগাচাপকান আঁটিয়া মোটা লাঠী হস্তে গজেন্দ্রগমনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদালত হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন,—অন্যমনে কলেজের একটী অপরিচিত যুবক শিস্ দিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল ; তাহাকে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই যুবকের দিকে

ফিরিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে ডাকিলেন,—"ও-হে ! ও ছোক্‌রা ! এ দিকে এস !" তাঁহাকে দেখিয়া সেই যুবক যদি প্রাণপণে ছুটিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিত,—তাহা হইলে সে যাত্রা তাহার নিষ্কৃতিলাভ হইল ; কিন্তু তাহা না করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে না চিনিয়া যুবক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই,—তাঁহাকে জেরা সুরু হইল,—

"তোমার বাপের নাম কি ?"

"আজ্ঞে—অমুক !"

"পড় কোথায় ? কোন্ ক্লাসে ?"

"আজ্ঞে অমুক কালেজে—অমুক ক্লাসে !"

"শিস্ দিয়ে গান গাইছিলে কেন ?"

যুবক যদি তৎক্ষণাৎ অতি বিনীতভাবে বলে,—"আজ্ঞে—আর হবে না ; অপরাধ হয়েছে !" তাহা হইলে তাহার প্রতি হুকুম হইত—"যাও—চুপ্ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের মতন চলে যাও !" কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ উক্তরূপ আচরণ না করিয়া হতভাগ্য যুবক যদি বলিয়া ফেলে,—"তা' শিস্ দিচ্ছিলুম··গান গাইছিলুম,—তা'তে আপনার কি মশাই—" অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ ধারণ করিয়া—তাঁহার সেই লৌহহস্তের একটি চপেটাঘাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই যুবককে "তাঁহার কি"—তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। ইহার

উপরন্ত যদি যুবক আরও একটু মেজাজ দেখাইয়া বলে—"কি মশাই,—আপনি গায়ে হাত তোলবার কে—" ইত্যাদি—তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ হস্তস্থিত সেই মোটা লাঠীর কাঠিন্য অম্লানবদনে যুবকের পৃষ্ঠদেশে পরীক্ষা করিয়া লইতেন! পরিচিত কোনও যুবক যদি গভীর রাত্রিতে কোন স্থান হইতে ফিরিবার কালে তাঁহার নজরে পড়িত, তাহা হইলে যতক্ষণ না সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত, ততক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে তাহার নিস্তার নাই। কোন প্রবীণ ব্যক্তি যদি নিজপুত্র বা কাহারও পক্ষ সমর্থন করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার রূঢ় আচরণ সম্বন্ধে দোষ দেখাইতে আসিতেন, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর হইত,—"আমি যা' ভাল বুঝেছি—ক'রেছি,—আপনার যা ইচ্ছে হয়,—ক'রতে পারেন!" অধিক তর্ক বিতর্ক করিলে তিনি ক্রোধের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিয়া ভদ্রলোককে তৎক্ষণাৎ বলিতেন,—"যা—ও! আমার কাছ থেকে চলে যাও! নইলে অপমান হবে!" মানের দায়ে—অথবা প্রাণের দায়ে, আর অধিক প্রতিবাদ না করিয়া ভদ্রলোক আপনার পথ দেখিতেন; ভাবিতেন,—কে অনর্থক "বুনো মহিষের" সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ক'র্বে!

জনকয়েক অত্যাচারপ্রপীড়িত যুবক যুক্তি করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একদিন রাত্রে প্রহার করিবার উদ্যোগ

করিয়াছিল,—কিন্তু হায়! তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ—আয়োজন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যষ্টীহস্তে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই বিফল হইয়াছিল। একবার অন্ধকার রাত্রে একটী বালক দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একখানি এগারো ইঞ্চি ইঁট ছুঁড়িয়াছিল! ইঁট চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু লাগিবামাত্রই তিনি তাঁহার নিত্য-সহচর পোষা ভয়ঙ্করপ্রকৃতি কুক্কুর "নেলিকে" সঙ্কেত করিবামাত্রই "নেলি" তৎক্ষণাৎ সন্ধান করিয়া অথবা গন্ধ পাইয়া সেই বালকের উরুদেশে প্রচণ্ড কামড় দিয়া ধরিয়া রহিল। বালক তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় সঙ্কেত করিতেই "নেলি" তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তবে সে রক্ষা পাইল। বালকের পিতা পাঁচজন প্রতিবেশীর পরামর্শে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে নালীশ রুজু করিয়াছিলেন,—আবার কি জানি কি বুঝিয়া তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট স্বয়ং গিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া মাম্‌লা তুলিয়া লইলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধিক কথা কহিতে ভালবাসেন না। চাকর কিম্বা রাঁধুনী, অথবা বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাহাকেও দুইবারের অধিক কিছুতেই তিনবার ডাকিতেন না। প্রথম ডাকে হাজির হওয়া চাই; তাহাতে যদি না আসে—দ্বিতীয় ডাক।

তাহার পর আর কথাবার্ত্তা নাই! নিজে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে প্রহার আরম্ভ! অসময়ে চাকর কেহ নিদ্রিত হইলে—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীতকালে বড় বাল্‌তির এক বাল্‌তি জল লইয়া তাহার নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাকে শয্যার উপরেই স্নান করাইয়া দিতেন; অথবা, গ্রীষ্মকাল হইলে ছিঁচ্‌কে গরম করিয়া তাহাকে ছেঁকা দিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেন।

মক্কেল অথবা কোন পাওনাদারকে বলিয়া দিলেন,—"কাল ন'টার সময় এসো।" পরদিন সে ব্যক্তি হয়ত' ন'টা বাজিয়া দশ মিনিটের সময় গিয়া হাজির। তাহাকে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—

"কাল ক'টার সময় আস্‌তে ব'লেছিলুম?"

"আজ্ঞে—ঠিক তো এম্‌নি সময়ই ব'লেছিলেন!"

"এম্‌নি সময় কি? ঠিক ক'টার সময়,- বল!"

"আজ্ঞে—এই নটার সময়ইতো ব'লেছিলেন!"

"হুঁ"—(ঘড়ী দেখাইয়া গম্ভীরভাবে) "এখন ক'টা বেজে কত হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে—নটা বেজে বার' মিনিট—"

অমনি হুকুম হইল—"যা—ও! বেরোও! যা—ও!" পাওনাদার হইলে টাকা দেখাইয়া বলিতেন,—"এই দেখ—তোমার টাকা

নিয়ে ব'সেছিলুম—আজ দোবো না ! যাও,—কাল ঠিক কখন্ আস্‌বে ব'লে যাও ;—ঠিক সেই সময়ে এসে টাকা নিয়ে যেও !" পরদিন সে ব্যক্তি যথাসময়ে উপস্থিত হইলে—তাহার পাওনাগণ্ডা সমস্তই চুকাইয়া দিতেন। এইরূপ বিলম্বে আসিয়া মক্কেল "ফি" দিতে গেলে —তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিতেন,—"তোমার মোকর্দ্দমা ক'র্ব্বনা—যাও - বিদায় হও ! যা——ও !"

এই কঠোর আদেশের পরও যদি কেহ হাতজোড় করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করুণার উদ্রেক করাইবার চেষ্টা বা উদ্যোগ করিত, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নেলি" কুক্কুরকে ডাকিয়া তাহার প্রতি আক্রমণের সঙ্কেত করিতেন। সে ব্যক্তি আর পলাইবার পথ পাইত না।

প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া করজোড়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন,—"আজ্ঞে—কাল রাত্রে দয়া ক'রে আমার বাটীতে গিয়ে আহারাদি ক'র্ত্তে হবে!" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত রাত্রে খাওয়া দাওয়া হবে ?"

"আজ্ঞে—দশটার ভিতরেই !"

"আচ্ছা—দেখো—ঠিক দশটার ভেতরেই যেন হয় !"

"যে আজ্ঞে !"

পরদিন ঠিক ন'টা রাত্রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায়

গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিস্তর লোকজনের সমাগম হইয়াছে ; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন,—দশটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই ! প্রায় দশটার সময় ব্রাহ্মণদের ডাক হইল। কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আহারস্থানে লইয়া গেলেন। আহারস্থানে বসিতে যাইবেন—এমন সময় ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া হেলিতে দুলিতে আপনার গৃহাভিমুখে চলিলেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলে যৎপরোনাস্তি সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই "ভবি" ভুলিলেন না !

কাণাখোঁড়া দেখিলেই তিনি একটী করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিতেন, তাহাদের বড় চাহিতে হইত না। কিন্তু সুস্থকায় সবল ভিখারী তাঁহার বাটীতে কিম্বা তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি হয় সেই মোটা লাঠির সাহায্য লইতেন,—নতুবা "নেলি" কুকুরকে— "হিস্ হিস্ লেঃ"—বলিয়া ঈঙ্গিত করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি সদর দরজায় বসিয়া স্নান করিতেছিলেন। সম্মুখে উনানে গরম জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল। তাহার সহিত কাঁচা জল মিশাইয়া আরাম করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্নানাদি সম্পন্ন করিতেছিলেন। একটী দীর্ঘকায় ভিখারী প্রাতঃকালে দিব্য চন্দনাদি অঙ্গে লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "বাবু —একটী পয়সা" বলিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। নফ্‌রা চাকর

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল ; ভিখারীকে দুই চারি বার বলিয়া দিল—"হিঁয়া কুছ্ মিলেগা নেহি—চলা যাও!" ভিখারী তথাপিও বলিতে লাগিল,—"বাবু! একঠো পয়সা—!" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা না বলিয়া এক ঘটী ফুটন্ত গরম জল তুলিয়া একেবারে ভিখারীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। বেচারী সেই পথের উপর পড়িয়া কাটা ছাগলের মত ছট্-ফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাঁচ-জনের সাহায্যে ভিখারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে নালীশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ সেই ভিখারীকে গোপনে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন।

আম্রবিক্রেতা বাজ্‌রা মাথায় লইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিল,—"বাবু! ভাল বোম্বাই আম নেবেন ?"

"নোবো,—কি দর ?"

"আজ্ঞে দশ টাকা শ!"

"দেখি—এইটে কেটে দে"—বলিয়া নিজে বাছিয়া একটী আম তুলিয়া বিক্রেতার হাতে দিলেন। আমটি ভাল করিয়া কাটিয়া আম্রবিক্রেতা বাবুকে দিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমটী দুইবার মুখে দিয়া আস্বাদন করিয়া বলিলেন,—"হুঁ—দশ টাকা শ" —সঙ্গে সঙ্গে বিরাশী সিক্কার ওজনে এরূপ একটী চপেটাঘাত আম্রবিক্রেতার গণ্ডদেশে প্রদান করিলেন যে বাজ্‌রাশুদ্ধ সমস্ত

আম রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং হতভাগ্য ঘুরিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুত্র এবং তিন কন্যা। তাঁহার পত্নী রাধামতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এরূপ ভীষণপ্রকৃতি স্বামীর মনোরঞ্জন করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে যে কিরূপ কষ্টকর,—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভাগলপুরনিবাসী লোকজন যেমন "বুনো মহিষের" ভয়ে শশব্যস্ত, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সকলেও তাঁহার দাপটে সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপদ এম, এ পড়িতেছেন,—তিন বৎসর হইল—তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুত্রবধূ শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু শ্বশুরের কড়া হুকুম,—"যতদিন না হরিপদ'র এম-এ পরীক্ষা শেষ হয়, ততদিন কিছুতেই যেন স্ত্রীর সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ না হয়!" কর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য? কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আদালতে বাহির হইয়া গেলে রাধামতী দ্বিপ্রহরে পুত্র এবং বধূমাতাকে শয়নকক্ষে দেখাসাক্ষাৎ করিতে বলিতেন। পিতার ভয়ে,—পাছে তিনি কাহারও মুখে শুনিতে পান,—হরিপদ প্রথম প্রথম মাতার কথায় সম্মত হইতেন না; কিন্তু মনে ভাবিলেন, বাড়ীতে এমন কে আছে যে কর্ত্তার কাছে একথা লাগাবে? এই ভাবিয়া দ্বিপ্রহরে দুই এক ঘণ্টা পত্নীর সহিত

আলাপ করিতেন। দুবদৃষ্টক্রমে একদিন মোকর্দ্দমার কি কাগজ-পত্র লইবার জন্য অকস্মাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিপ্রহবে বাড়ী আসিলেন। সে সময় হবিপদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের ভিতর পত্নীর সহিত প্রেমালাপে মগ্ন, তিনি কিছুই জানিতে পাবিলেন না যে পিতা এমন অসময়ে বাড়ী আসিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া পাঠগৃহে হরিপদ'ব সন্ধান করিলেন। ভৃত্যেব মুখে শুনিলেন, তিনি বাড়ীব ভিতর শুইয়া আছেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি একেবাবে হরিপদ'ব শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া রুদ্ধদ্বাবে আঘাত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশ। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। এমন অবকাশ কেহ পান নাই যে কর্ত্তার আগমনসংবাদ হবিপদকে জ্ঞাপিত করিয়া সাবধান করিয়া দেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারে ভীষণ ধাক্কা মারিতে মারিতে ডাকিলেন,—"হরি! দরজা খোল!" হতভাগ্য যুবক এবং তাঁহার অভাগিনী পত্নীব গৃহাভ্যন্তবে কি অবস্থা, তাহা সকলে কল্পনা করিয়াই লইতে পারিবেন। হরিপদ বুঝিলেন,—আর যদি তিলমাত্র দ্বার খুলিতে বিলম্ব কবা হয়, তাহা হইলে আর জীবন্ত থাকিতে হইবে না। অগত্যা নবমী পূজার পাঁঠাব ন্যায় কম্পিত দেহে হরিপদ দ্বার খুলিয়া দিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—এক কোণে অবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন,—"বৌয়ের

স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিলেন-- "ওগো, এ'বার ওদের মার্জ্জনা কর।"

'রত্নাকর- ১৩৮ পৃষ্ঠা

হাত ধর!" হরিপদ দ্বিরুক্তি না করিয়া পত্নীর হস্ত ধারণ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব'ললেন,—"যা—ও! আমার বাড়ী থেকে বেরোও! যা—ও!" এই বলিয়া বি-এ পাশ-করা দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধাক্কা দিতে দিতে বলিলেন, "যাও—বেরোও! আমার হুকুম অমান্য ক'রে আমার বাড়ীতে থাকৃতে পাবেনা! যা—ও—বেরোও!" বলিতে বলিতে একেবারে পুত্র-বধূ সহ পুত্রকে সদর দরজায় আনিলেন। সে সময় তাঁহার সম্মুখীন হয়—এমন ভরসা কাহার হইতে পারে? কিন্তু রাধামতী পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একেবারে কাঁদিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—"ওগো, এ'বার ওদের মার্জ্জনা কর।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীকে এরূপ একটী পদাঘাত করিলেন যে তাহাতেই অভাগিনীর সংজ্ঞালোপ হইল। তাঁহাকে লইয়াই তখন অন্যান্য পুত্রকন্যাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হরিপদ দেখিলেন,—কেলেঙ্কারী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া রোরুদ্যমানা পত্নীর হাত ধরিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাটীর ঠিক পার্শ্বে রঘুবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রঘুবর বাবু একজন মুন্‌সেফ; অতি সজ্জন ব্যক্তি। সমস্ত ভাগলপুরবাসীর মধ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুবর বাবুকে একটু খাতিরযত্ন করিতেন, একটু মান্য করিয়া চলিতেন। রঘুবর বাবুর পরিবার-

বর্গের সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল,—হরিপদ তাঁহারই আশ্রয়ে পত্নী লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রঘুবর বাবু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়াও পুত্রকে মার্জ্জনা করাইতে পারিলেন না! কলিকাতায় একটী শিক্ষকতাকার্য্য জুটাইয়া একদিন হরিপদ পত্নীকে লইয়া ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেন। সেই অবধি পিতাপুত্রের আর মুখ দেখাদেখি নাই।

দ্বিতীয় পুত্র শশীপদ কয়েক বৎসর যাবৎ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি বি, এ, পাশ করিতে পারেন নাই। শ্বশুরের পরামর্শে ওকালতী পাশ করিয়া বর্দ্ধমান-কোর্টে বাহির হইতেছেন। পিতার কঠোর শাসনদণ্ড সহ্য না করিতে পারায় তিনিও পিতৃগৃহত্যাগী। প্রথমবার বি, এ, ফেল্ হইয়া পিতার নিকট এরূপ প্রহার খাইয়াছিলেন যে এক সপ্তাহ তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। যে দিন বি, এ, পরীক্ষার সংবাদ প্রথম বাহির হইল,—তিনি আদালতে গেজেট আনাইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন,—শশীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে কি না! দেখিলেন,—নাই! তৎক্ষণাৎ আদালতের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিয়া দেখিলেন,—পুত্র শশীপদ বৈঠকখানায় শুইয়া দ্বিপ্রহরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অন্য কোন কথা না বলিয়া

নিদ্রিত পুত্রের গলা ধরিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং চুলের মুঠী ধরিয়া তাঁহার দুই গণ্ডে দুইটী বিষম চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন। শশীপদ বেচারীর তখনও বোধ হয় ঘুমের ঘোর কাটে নাই,—তাহার উপর এইরূপ বিষম চপেটাঘাতে তিনি দুনিয়া যেন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তো হতভাগ্যের নিস্তার নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে পদাঘাত করিতে করিতে বৈঠকখানা হইতে বাহির করিয়া একেবারে আঁস্তাকুড়ে আনিয়া একটী আম্‌ড়া গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া রাখিলেন। পুত্র সেই অবস্থায় অনাহারে সমস্ত দিনরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। সেইদিনই পুত্র পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন।

৪

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনটি কন্যা। দুইটীর বিবাহ দিয়াছেন,—কনিষ্ঠ কন্যা অবিবাহিতা। জামাতৃদ্বয় দরিদ্রের সন্তান, শ্বশুরের আশ্রয়ে—শ্বশুরের অর্থেই প্রতিপালিত হইতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, অলঙ্কারাদির কোনও অভাব নাই—অথবা

বাহুল্যও নাই। জ্যেষ্ঠ জামাতা আইন পড়িতেছেন; ছেলেটি খুবই ধীর, শান্ত,—লেখাপড়া—স্বভাবচরিত্র খুবই ভাল। শ্বশুরের খুবই আজ্ঞাকারী। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাকরদের ঘরে বসিয়া গোপনে বড় জামাতা তামাক খাইতেছেন,—অকস্মাৎ "দ্বিতীয় কৃতান্তমিব" শ্বশুর মহাশয়কে সম্মুখে উপস্থিত দেখিলেন। বিষম বিপদ,—বেচারী মহা অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধীরে ধীরে জামাতার হস্ত হইতে হুঁকা-কলিকাটী লইয়া,—প্রথমে কলিকার সমস্ত আগুন জামাতার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন,—পরে হুঁকার জল দিয়া নিজেই তাহা নির্ব্বাপিত করিলেন। দ্বিতীয় জামাতাটী বি, এ পড়িতেছেন। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার আদেশ ছিল; কিন্তু যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়,—তাহা হইলে সে রাত্রি তাহার অনাহার এবং উত্তম মধ্যম প্রহারের বন্দোবস্ত হইত। জামাতা বাবাজী পড়িতে পড়িতে দশটার পূর্ব্বে যদি পড়িবার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িতেন,—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া দিয়াশেলাই জ্বালিয়া তাঁহার মাথার চুল পোড়াইয়া দিতেন। পাড়ায় কোন ভদ্রলোকের বাটীতে থিয়েটার হইতেছিল; চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা এবং তৃতীয় পুত্র রামপদ তাঁহাকে লুকাইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি পুত্র ও জামাতার অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,—দুইজনেই বাটীতে নাই। বুঝিলেন—থিয়েটার

দেখিতে গিয়াছে। থিয়েটার, যাত্রা, নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ, ইয়ারকি, রসিকতার উপর তিনি চিরদিনই খড়্গহস্ত। রাত্রি চারিটার সময় দরজা খোলা দেখিয়া জামাতা ও পুত্র যেমন বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, অমনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুইজনকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া পাইখানায় প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। পরদিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীঘরদোর সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। বাটীর কোনস্থানে ময়লা কিম্বা জঙ্গল থাকিতে পাইত না। বাহিরবাটী অপরিষ্কার থাকিলে ভৃত্যবর্গের প্রাণান্ত হইত; অন্দরমহলের জন্য দাসী প্রধান দায়ী—তৎসঙ্গে তাঁহার পত্নী ও কন্যাগণ। একদিন দেখিলেন—বাটীর ভিতর সিঁড়ির দেয়ালের গাত্রে কে চূণ লাগাইয়াছে। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু কেহই সাহস করিয়া অপরাধ স্বীকার করিলেন না। হুকুম হইল,—"খবরদার—বাড়ীতে যেন পান,—চূণ,—খয়ের না ঢুকতে পায়!" সেইদিন হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পরিবার-বর্গের পান খাওয়া বন্ধ হইল। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন,—"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি এরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক,—তাহা হইলে তাঁহাকে সকলে "একঘরে" করিয়া জব্দ করেনা কেন? অথবা—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?" থাকিতে পারে,—

কিন্তু ভাগলপুরবাসীগণ ইচ্ছা করিয়াই কেহ কিছু তাঁহাকে বলিতেন না। কেন? তাহার কারণও অনেক। তাঁহার এইরূপ কঠোর মেজাজের জন্য লোকে যেমন তাঁহাকে ঘৃণা বা ভয় করিতেন,—তেমনি তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণের জন্য তিনি ভাগলপুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি যথার্থই এ সংসারে দুর্লভ। অমুক বিধবা পাঁচ সাতটী পুত্রকন্যা লইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছেন। তিনি প্রথমে নিজে পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়া, পরে লোকের বাড়ী বাড়ী নিজে গিয়া চাঁদা তুলিয়া অন্ততঃ দুই হাজার টাকা বিধবাকে সংস্থান করিয়া দিলেন। অমুক ব্যক্তি ভয়ঙ্কর রোগগ্রস্ত,—অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। তিনি দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়া,—নিজে ডাক্তার ডাকাইয়া,—টাকা দিয়া, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া—তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। অমুক ব্যক্তির রাত্রি দুইটার সময় প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, সৎকার করিবার লোকজন জুটিতেছে না; যদি ব্রাহ্মণ হয়,—তিনি নিজপুত্র ও জামাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া মৃতের সৎকার করিয়া আসিলেন। কায়স্থ কিম্বা অন্য কোনও জাতি হইলে—যেমন করিয়া হউক্ লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিতেন। ভা'য়ে ভা'য়ে বিরোধ করিয়া আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক; তিনি সাধ্যমত আপোষে তাঁহাদের

"ঘরা-ঘরি" মীমাংসা করিয়া মামলা-মোকর্দ্দমা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। অনেকগুলি অনাথ দরিদ্র বালকের তিনি লেখাপড়ার খরচ যোগাইতেন। কিন্তু বারোয়ারী, শীতলাপূজার চাঁদা—কিম্বা কোন মিটিংয়ের চাঁদা কেহ তাঁহার নিকটে আদায় করিতে গেলে, তিনি "নেলি" কুক্কুরকে তাহাদের পশ্চাতে ছুটাইয়া দিতেন। আজ পর্য্যন্ত একটী আধ্‌লা পয়সা কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল রঘুবর বাবুর সহিত এ সংসারে চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্ব; অর্থাৎ, মেজাজ একটু ভাল থাকিলে তিনি রঘুবর বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া দু'দণ্ড তাঁহার সহিত "দুটো-দশটা" ভালমন্দ কথা-বার্ত্তা কহিতেন। একমাত্র রঘুবর বাবুকেই তিনি বন্ধুভাবে নিজবাটীতে খাতির যত্ন করিতেন,—তাঁহার পুত্র-কন্যাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া আদর করিতেন এবং নিজ পুত্রকন্যাপরিবারকে রঘুবর বাবুর বাটীতে যাইতে অনুমতি দিতেন। অন্য কেহ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বিনা কারণে পদার্পণ করিতেন না। তামাক নাই—পান নাই—পরচর্চ্চা নাই—আমোদপ্রমোদ নাই! কি জন্য ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানায় আসিবেন?

সংসারে তিনি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন—আপনার কনিষ্ঠা কন্যা অনুপমাকে। যাহা কিছু একটু আদরআবদার সহ্য

করিতেন—অনুপমার! এই বাড়ীর কাহারও কোন কথা কর্ত্তাকে জানাইবার আবশ্যক হইলে তিনি অনুপমাকে দিয়া বলাইতেন। রঘুবর বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন,—তাঁহার একমাত্র পুত্র নীরদকুমারের সহিত অনুপমার বিবাহ দিবেন। ফুট্‌ফুটে মেয়ে অনুপমা যখন দিব্যকান্তি সুন্দর ছেলে নীরদকুমারের সহিত খেলা করিত,—কঠোর হৃদয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদের দেখিয়া মনে মনে বলিতেন,—"দুটোতে মিল্‌বে ভাল!"

সকলেই জানিত - অনুপমার সহিত নীরদের বিবাহ হইবে। ক্রমে দুইজনের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে নীরদকুমার এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাশ করিয়া ফেলিলেন। রঘুবর বাবুর ইচ্ছা—এইবার পুত্রের বিবাহ দেন,—কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"থাক্‌না—এত তাড়াতাড়ি কিসের? ছেলেটা আরও দু-একটা পাশ্‌ করুক না! মনে কর না,—ছেলের বিয়ে দিয়েছ। ইচ্ছে হয়ত' অনুপমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার কাছে রাখতে পার!" সুতরাং রঘুবর বাবু আর বড় পীড়াপীড়ি করিলেন না। হঠাৎ একদিন বিসূচিকা রোগে রঘুবর বাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুবর বাবুর স্ত্রীপুত্রের অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন। রঘুবর বাবু বিস্তর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট। একমাত্র পুত্র নীরদকুমার পিতার

বিষয়সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ছল করিয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া বসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"লেখাপড়া ছাড়া হ'বে না। বিষয় দেখ্‌বার অন্য লোক বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি,—তুমি লেখাপড়া কর।" কিন্তু নীরদকুমার সে কথা শুনিলেন না। তাহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে সকলকে বলিয়া দিলেন,—"খবরদার! নীরদের সঙ্গে যেন কাহারও কোনও সম্বন্ধ না থাকে। আমি অমন হতভাগাকে জামাই ক'র্ব্ব না।" নীরদও সে কথা শুনিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ তুলিয়া দিলেন।

কিন্তু সব ভোলা যায়,—বাল্যপ্রণয় তো সহজে ভুলিবার নয়! অনুপমাকে নীরদ কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? প্রতিদিন বিষণ্ণবদনা বালিকা অনুপমা, হতাশনয়নে যখন ছাদের উপর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকে,—তাহাতে নীরদের মর্ম্মস্থলে পর্য্যন্ত সূচীকাবেধের জ্বালা অনুভূত হয়! কিন্তু উপায় কি? কাহার ক্ষমতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্য মত করায়? তিনি যখন একবার বলিয়াছেন,—নীরদের সহিত অনুপমার বিবাহ দিবেন না,—তখন স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি সে কার্য্য করিবেন না।

৫

অকস্মাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রায় মাসাবধি তিনি শয্যাশায়ী। রোগ এত অধিক বৃদ্ধি পাইত না,—যদ্যপি তিনি ডাক্তার মহাশয়দিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিয়া থাকিতেন। কিন্তু তাহা তো করিলেন না! যে ডাক্তার আসিয়া যখন যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে যান,—তিনি রোগীর জেরায় জ্বালাতন হইয়া পড়েন; সুতরাং পুনরায় ডাকিতে গেলে তিনি আসিতে চাহেন না। যাহা হউক,—ভগবানের কৃপায় রোগের অনেকটা উপশম হইল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে না সারিতেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খেয়াল ধরিলেন,—"কাশীতে হাওয়া খেতে যাই চল!" কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! কে বারণ করিয়া অনর্থ ঘটাইবে? অগত্যা সপরিবারে কাশীযাত্রার উদ্যোগ হইল; ভাগলপুরের বাড়ীতে রহিল—দ্বারবান ও একজন চাকর।

বেনারস্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া রুগ্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাওয়া খাইতে গেলেন। কাশী হইতে যে ডাক্তার আসেন,—কাহারও চিকিৎসা তাঁহার মনে ধরে না। ডাক্তারেরাও তাঁহার অদ্ভুত প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিতে চাহেন না। নিকটে একজন হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার থাকিতেন। পুত্র রামপদর পরামর্শে তাঁহাকে ডাকা

হইল। বাব্‌রি-কাটা চুল,—ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাড়ী,—ঘন গুম্ফ,—চোখে কালো চস্‌মা, পরিধানে কোট্‌ পেণ্টুলেন্‌,—ইত্যাকার ডাক্তার বাবু আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার বাবুর নাম হরিধন মুখোপাধ্যায়,—বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাঁহার স্বর অতি কর্কশ। লোকটী কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ,—একবার আসিয়াই রোগীর রোগ এবং স্বভাব বুঝিয়া তদনুরূপ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেমনটী চান—যেমনটী বলেন,—তিনি ঠিক সেইরূপই করেন। দুই চারি দিন আনাগোনা করিয়াই তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। অন্য রোগী ফেলিয়া তিনি প্রায় সমস্ত দিনরাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা ও সেবা করেন। একেবারের বেশী আর "ফি" লন না। তিনি বলেন,—"ডাক্তারি আমার পেশা নয়,—সখ্‌। লোককে আরাম করিতে পারিলেই আমার বিদ্যা ও পরিশ্রম সার্থক!" কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাইতে চাহেন না,—সুতরাং বাধ্য হইয়া ডাক্তার হরিধন বাবু দিনে একবারের "ফি" লইতেন।

ক্রমে ক্রমে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে সেখানে

হাওয়া খাইতে যান। কথাপ্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুনিলেন, ডাক্তার বাবুর নিবাস কলিকাতা—ভবানীপুরে। চালচলন দেখিয়া বুঝিলেন,—তাঁহার বেশ দু'পয়সার সংস্থান আছে। ডাক্তার বাবু অদ্যাবধি অবিবাহিত। ভাল ঘরের মনের মতন মেয়ে না পাওয়াতে—এতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহারই সহিত কন্যা অনুপমার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ডাক্তার বাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও—পিতৃতুল্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মত দিলেন।

এক মাথা চুল,—এক মুখ দাড়ীগোঁপশুদ্ধ জামাই হইবে শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তো কাঁদিয়াই আকুল! শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাশীতেই বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ভাগলপুর হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন কাশীতে আসিয়া বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। ডাক্তার বাবুরও ভাগলপুরবাসী দুই চারি জন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এ বিবাহে উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহে কাশীতেই ডাক্তার হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনুপমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ডাক্তার বাবু তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া দেশে যাইবেন,—এইরূপ স্থির হইল। বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। অনুপমা কাঁদিতে

লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাকে বলিলেন,—"কাঁদিস্ কেন? তোকে ভাল লোকের হাতেই দিয়েছি,—খুব সুখে থাক্‌বি!"

বর শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"চেনা ঘরে যেতে কান্নাই বা আসে কেন চাটুয্যে মশাই? আপনারই তো বাড়ীর পাশে আমার বাড়ী——"এই বলিয়া বর মহাশয় আপনার বাব্‌রি চুল, দাড়ী, গোঁপ এবং চস্‌মা খুলিয়া ফেলিলেন!

কি সর্ব্বনাশ! এ যে রঘুবরের পুত্র নীরদকুমার! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিলেন,——"একি? দিনে ডাকাতি?"

তৎক্ষণাৎ তিনি মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—অনুপমা ও নীরদের মুখদর্শন করিবেন না।

"দিনে ডাকাতি" করিয়া নীরদকুমার অনুপমাকে ভাগলপুরে নিজগৃহে আনিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

কাব্‌লারামের কৈলাস দর্শন

ক্যাব্‌লারাম ওরফে শ্রীমান কেবলরাম দেবশর্ম্মা—উপাধি মুখোপাধ্যায়—সহরে একজন বুনিয়াদি লোক। চার পুরুষ এই কলিকাতায় বাস। আগে বিষয়আশয় খুবই ছিল,—সহরে নাম-ডাকও যথেষ্ট। এখন আর কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে দু'শো বৎসরের এক ভগ্ন অট্টালিকা আর নিজের বৃদ্ধা মাতা। বাহির বাটীর রাস্তার ধারের দুখানা ঘর ভাড়া দেওয়া ছিল; একটায় স্যাক্‌রার দোকান,—অপরটীতে মুড়কীবাতাসাওয়ালা গৌরহরি থাকিত। ইহাদের ভাড়ায় ক্যাব্‌লারামের মায়ে-পোয়ের সংসার চলে। বিধবা বৃদ্ধা মাতা,—তাঁহার এক বেলা এক মুটো আলোচাল আর কাঁচকলা,—এক কাপড়েই বৎসর কাটে,—তাঁহার খরচ কিসের? উপরন্তু বুড়ীর হাতে কিছু গুপ্তধন আছে,—এইরূপ জনশ্রুতি; কিন্তু ক্যাব্‌লারাম বহু চেষ্টায়ও সে বিষয়ের সত্য তথ্য নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

ক্যাব্‌লারাম ছেলে বেলায় পাঠশালায় গিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনেকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কথামালা শেষ না হইতেই ক্যাব্‌লারাম তামাকে এমন দম্ মারিতে শিখিয়াছিলেন যে, একটী টানে কলিকাটী চিতানলের ন্যায় দপ্ করিয়া উঠিত। তাহার বয়স

তখন ৮।১০ বৎসরের অধিক হইবে না। গুরু মহাশয় একদিন স্বচক্ষে সেই তামাক টানার বহর দেখিয়া ক্যাব্লারামকে করজোড়ে বলিলেন,—"বাপু! তুমি এক দমেই সকল বিদ্যা মেরে দিয়েছ! সরস্বতীর ভাণ্ডারে আর এমন বিদ্যা কিছুই নাই—যাহা তোমার শিখিতে বা জানিতে বাকি আছে। তুমি অধ্যয়ন ছাড়িয়া এ'বার যোগ অভ্যাস কর। তোমাকে আমি"চতুর্ব্বেদ" উপাধি দিলাম।"সেই দিন থেকে পণ্ডিতমহলে তিনি "ক্যাব্লারাম চতুর্ব্বেদ" নামে বিদিত হইলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মেধাবী ক্যাব্লারাম আবগারী-শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পিপে পিপে ধান্যেশ্বরীতে (কাহারও কৃপায় ব্র্যাণ্ডি-হুইস্কি জুটিলে তাহাতেও) তিনি কাবু হইতেন না। প্রত্যহ তিনি সওয়া ভরি অহিফেন সেবন করিতেন। বড় দুঃখে একদিন তাহার এক সম্পর্কীয় বৃদ্ধ খুল্লতাতকে বলিলেন, "খুড়ো! মৌজ আর কিছুতেই হয় না; কি করি বল ত'?" খুড়োমহাশয় ভাইপোর সারল্যে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন, "বাবা ক্যাবল্! তুই যে কলিযুগের নীলকণ্ঠ রে বাপ্!" পাড়ার পাঁচজন বিজ্ঞ লোকের পরামর্শে ক্যাব্লারাম কালাচাঁদের প্রেমে জীবনযৌবন সমর্পণ করিলেন,—অল্প দিনেই প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্যাব্লারাম এ বেলা—ও বেলায় আরও সিকি ভরি মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। কাঁচায় পাকায় কালাচাঁদের প্রেমে ক্যাব্লারামের জীবনের স্রোত ফিরিয়া গেল।

ক্যাব্‌লারাম হুঁকা হাতে চব্বিশ ঘণ্টা চক্ষু বুঁজিয়া ভাঙ্গা সাতকুকুরে ঠাকুরদালানে দরবার পাতিয়া বসিলেন। একটী পুরাতন চার-পেয়ে; তাহার উপর আধ ইঞ্চি পুরু ময়লাবিশিষ্ট ছেঁড়া তোষক—একটী মাথার বালিশ (তারও ঐ ভাব)। পাশে একটী কাণাভাঙ্গা কুঁজো; একটী চুম্‌কি ঘটী। মাথার শিহরে এক খানি ছোট গামছা। দালানের মেজেতে—দেওয়ালে ইঁদুর গর্ত্ত; ছোট বড় মাঝারি রকমের ইঁদুর নির্ভয়ে বসবাস করিতেছে। পায়রা, বাদুড়, চাম্‌চিকে, টিকৃটিকি,—ক্যাব্‌লারামের চন্দ্রাতপের উপর মহানন্দে দিবারাত্রিই যাতায়াত করিতেছে। ক্যাব্‌লারাম "রাজা" হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া এই বিশাল রাজত্বে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

আশ্বিন মাস—মহাপূজার দিন প্রায় আগত। মা দুর্গা বৎসরান্তে বাঙ্গালীর ঘরে অন্নের অনাটন সত্ত্বেও বাঙ্গালায় আসিতেছেন। পূজার বাজার পড়িয়াছে। নীবু স্যাকরা ক্যাব্‌লারামকে বলিল,—"দাদাঠাকুর! একবার চোখ্‌টা মেলে চাও,—একটুকু বাড়ীর বাহিরে পা' দাও! বছর পরে মা দুর্গা আস্‌ছে—একটু হুঁস্‌ কর। আহা—আজ তোমাদের ঠাকুরদালানের এই দশা! আগে কর্ত্তাদের আমলে এমন দিনে এ বাড়ীতে কত ধুমধামই হ'ত! মা এসে এই দালানে আলো ক'রে ব'স্‌তেন,—এত বড় বাড়ী যেন গম্‌ গম্‌ ক'র্ত্ত!

সব বরাৎ—সব বরাৎ !” ক্যাব্‌লারাম ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া (কিন্তু চক্ষু চাহিলেন না,—) বলিলেন—“তা’ স্যাক্‌রার পো ! মা কি আর আস্‌বেন না ?”

নীবু। “কোথা থেকে আস্‌বে দাদাঠাকুর ? তোমরা আন্‌বার চেষ্টাচরিত্তির না ক’ল্লে—আরাধনা না ক’ল্লে—মা কি যেচে আস্‌বেন ? আহা ! কি দিনকালই পড়েছে ! একটা বনেদি ঘরেও আর মা এসেন না ! পূজোর সময় পূজো বলে মনেই হয় না। দোকানে একটা খদ্দের নাই। দু’চার দিন বাদেই পূজো,—তা একটা ঢোলের বাদ্যি শুনতে পাচ্ছি না ! মা কি আর বাংলায় আস্‌বেন ? যাক্‌, এস--একটু বেড়িয়ে আসি, সন্ধ্যার সময়টা ঘরের কোণে বসে থাকা ভাল নয়।”

ক্যাব্‌লারামের ভাব উথলিয়া উঠিল,—তিনি বলিলেন, ”না—নীবু—তুমি যাও ; আমি এখন বাজে সময় নষ্ট ক’র্ব্ব না। আমি একবার মাকে আন্‌বার বন্দোবস্ত করি !”

নীবু ভাবিল,—ক্যাব্‌লারামের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। ফস্ ক’রে নেশা চটিয়া গেলে হয়তো একটা বিপরীত কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিবে। নীবু আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

থেলো হুঁকায় আধ হাত লম্বা নল লাগাইয়া তাহাতে মুখ দিয়া ক্যাব্‌লারাম অকস্মাৎ ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভাবিলেন,—

"এঁ্যা—কি হ'ল ? বৎসরান্তে একবার ক'রে মা আস্তেন,—তাও আর আস্বেন না ? কেন ? মা কি চান্ ? সবই তো আছে ;— ব'ল্লেইতো আমি এনে হাজির ক'রে দিতে পারি ! এইতো এত বড় ঠাকুরদালান—এত বড় বাড়ী ! হলিই বা পুরাতন ? মা এলেই তো সব নূতন হ'য়ে যাবে—সব অন্ধকার দূরে যাবে, আবার আলো ফুট্‌বে, আবার চতুর্দ্দিক হাস্‌বে ! আনন্দময়ী এলেইতো সবারই আনন্দ হবে। তবে মা আস্বেন না কেন ? ভাল—না আন্‌লে যদি বেটী না আসে, না হয়—আমিই যাই ; গিয়ে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনি। কিন্তু সে যে অনেক দূর। কৈ-লা-স পর্ব্বত ? যাই কেমন ক'রে ? সেখানকার এক জনকে পেলেও না হয়—সঙ্গে যেতে পারি !"

ক্যাব্‌লারাম শুনিলেন—কে যেন তাহাকে বলিল, "চল—আমি তোমাকে কৈ-লা সে নিয়ে যাই !" ক্যাবলারাম যেন বোধ করিলেন —বক্তা তাহাকে চিম্‌টী কাটিতেছে ; চিম্‌টির জোরে ক্যাবলারাম ব্যথিত হইলেন। বলিলেন,—"আঃ—খিম্‌চোও কেন ভাই। আমার খুব হুঁস আছে ; কি ব'ল্‌ছ—স্থির হ'য়ে বল শুনি। আগে পরিচয় দাও—কে তুমি ?"

"আমি সিদ্ধিদাতার বাহন—মুষিকচাঁদ !"

পার্শ্বে হাত দিয়া অঙ্গস্পর্শ করিয়া ক্যাব্‌লারাম বলিলেন, "আরে কেও—ইঁদুর ভাই ? তা' ব'ল্‌তে হয় ! পালাচ্ছ কেন ? কি

আহার ক'চ্ছ ? আমার মুড়কীগুলি ? তা' খাওনা ! বেশ তো—তুমি খাবে—এর আর কথা কি ? খাও—খাও।" মুষিকচাঁদ বলিল "হ্যাঁ—তা'তো খাবই। তুমি না ব'ল্লেও খাব। আর ব'ল্লেতো ভাল করেই খাই। কিন্তু তুমি বড় ভাল লোক। চল—আমার ল্যাজ্ ধরে কৈলাসে যাবে ?"

ক্যা। হ্যাঁ-দাদা! এই উপকারটী কর। গেরোস্তোদের উপকার ক'র্ত্তেইতো তোমরা পৃথিবীতে এসেছ! আমার কৈলাসে যাবার বড় দরকার হয়েছে; আমি মাকে আন্‌ব মনে ক'চ্ছি! তুমি আমায় পথটা দেখিয়ে দাও দাদা! এই তোমার ন্যাজ ধরলুম।"

মুষিক তখন তাড়াতাড়ি মুড়কীগুলি নিঃশেষ করিয়া বলিল, "নিতান্তই যদি যাবে তো আমি যেখান দিয়ে নিয়ে যাব—বিনা বাক্যব্যয়ে চক্ষু বুঁজে সেইখান দিয়ে চল। একটু আধটু কষ্ট হবে বটে; তা'তে ভয় পেওনা।"

ক্যাব্‌লারাম সোৎসাহে বলিল "—না—তুমি চল! জয় দুর্গা! জয় মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি! আজ সশরীরে তোমাকে কৈলাস পর্ব্বত থেকে মাথায় ক'রে আন্‌ব। দেখি তুমি আস কি না।" ক্যাব্‌লারাম দেখিলেন—মুষিকচাঁদ একটা গর্ত্ত অভিমুখে যাইতেছে! বলিলেন,—"ওকি—কোথায় যাচ্ছ ? অতটুকু স্থানে আমি যেতে পার্ব্ব কেন ?" মুষিকচাঁদ আবার একটু চিম্‌টি কাটিয়া বলিল "চুপ

—কথা কোয়ো না। যেখানে যাই চুপ্ করে চলে এস ; তোমার কি আর এখন নরদেহ আছে ? তুমি সূক্ষ্ম শরীর লাভ ক'রেছ। চল—আগে আমার বাসায় যাই , ছেলেপুলেদের একটা বন্দোবস্ত না ক'রে কেমন ক'রে যাব ?" ক্যাব্‌লারাম দেখিলেন—মুষিকরাজ মিথ্যা কথা বলেন নাই ; তাঁহার সেই বৃহৎ রক্তমাংসবিশিষ্ট দেহ অম্লানবদনে মুষিকবরের বিবরে প্রবেশ লাভ করিল। উঃ—বেজায় অন্ধকার—কি দুর্গন্ধ ! এক পাল মুষিকরাজের সন্তান-সন্ততি আসিয়া ক্যাব্‌লারামকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরিয়া আনন্দে লাফাইতে লাগিল। প্রাণ যায়—ক্যাব্‌লারাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আঁধারে চ'খে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না,—কি করেন—চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া রহিলেন। মুষিক আপনার গৃহকর্ম্ম সারিতে—স্ত্রীপুত্র পরিবারের আহারের বন্দোবস্ত করিতে বিস্তর সময় অতিবাহিত করিল। ক্যাব্‌লারাম সেই অবসরে এক ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ পরে মুষিকচাঁদ বলিল, —"চল ঠাকুর ! অনেকটা দেরী হয়ে গেছে বটে ?" ক্যাব্‌লারাম বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিলেন—পুনরায় বাগিয়ে লাঙ্গুল ধরিলেন। মুষিকপ্রবর আবাস হইতে বাহিরে আসিল;—ক্যাব্‌লারামও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটা বিস্তীর্ণ মাঠ—কুলকিনারা দেখা যায় না। একটা গাছপালা নাই—জমীতে ঘাস পর্য্যন্ত নাই—কেবল দিগন্তব্যাপী মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। ক্যাব্‌লারাম

বলিলেন,—"ইঁদুর ভাই! এত বড় মাঠ আমার চৌদ্দপুরুষেও পেরুতে পার্ব্বে না! একে আমার বেতো শরীর,—কি উপায় বল দেখি!" মুষিকরাজ বলিল,—"এই রকম সাড়ে ছয়টী মাঠ—সাতটী সমুদ্দুর—আর তেরটী নদী পার হতে হবে। এর মধ্যেই কাবু হ'লে চ'ল্‌বে কেন? তা নিতান্তই যদি চ'ল্‌তে না পার—তবে উড়তে হবে।" ক্যাব্‌লারাম বলিল,—"উড়্‌ব কি ক'রে? আমার তো ডানা নেই!" মুষিকরাজ বলিল—"তোমার ডানা নেই? সে কি? এতকাল ধরে তবে কালাচাঁদের কি প্রেম ক'ল্লে? কিসের জন্যে আবগারী মহল একচেটে করেছ? ভাল করে দেখ দেখি—নিশ্চয়ই তোমার ডানা গজিয়েছে?" ক্যাব্‌লারাম নিজ অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিল—কি আশ্চর্য্য—এই যে দিব্যি ডানা গজিয়েছে! বাঃ—তবেতো বড় মজাই হয়েছে। ক্যাব্‌লারাম মহানন্দে ডানায় ভর করিয়া হুহু শব্দে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাবলারাম ভাবিলেন—আহা! এ কি! উড়িতে এত আরাম? তবে মিছে শক্ত মাটীতে পায়ে হেঁটে মরি কেন? এবার থেকে উড়িয়াই চলিব। আর মাটীতে পা দিব না! ক্যাব্‌লারাম মুষিকরাজকে লইয়া ফর্ ফর্ শব্দে উড়িতে লাগিলেন। উড়িতে উড়িতে ক্যাব্‌লারাম কত মাঠ—কত সমুদ্র—কত নদী পার হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—"ভাগ্যে ডানা দুটো গজিয়েছিল,—নইলে সমস্ত জীবনটাভোর—ইহার সিকির সিকি পথও অতিক্রম করিতে পারিতাম না।" উড়িয়া

উড়িয়া শেষে এক গগনস্পর্শী পর্ব্বততলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্যাব্‌লারাম সেইখানে তাঁহার গতিরোধ দেখিয়া মূষিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—" ইঁদুরদাদা ! এ কোথায় এলুম ? আরতো উড়ে যাবার পথ দেখ্‌ছি না। এ যে একটা খুব লম্বা উঁচু দেয়াল।" মূষিকচাঁদ বলিল,—"ঠাকুর ! এই তোমার কৈলাস পর্ব্বতের তলা। এইবার এই দেয়াল ধ'রে ধ'রে উঠে চল।" ক্যাবলারাম বলিলেন,—"এঁ্যা—সে কি ? এ পাহাড় তো দেখ্‌ছি ঐ আকাশে গিয়ে ঠেকেছে ! আর দেখে বোধ হ'চ্ছে খুব হড়্‌কানে ;—এক পা উঠ্‌লেই গড়িয়ে গড়িয়ে ধুপ্‌ করে মাটীতে পড়ে ছাতু হ'য়ে যাব।" ইঁদুর বলিল, "তবে—এক কাজ কর ;—আমার ল্যাজ্‌টা খুব জোরে টেনে বাড়িয়ে নিয়ে—বেশ করে নিজের কোমরে বেঁধে নাও,আমি তোমাকে হিঁচ্‌ড়ে হিঁচ্‌ড়ে টেনে ওপোরে তুলে নিয়ে যাই।" ক্যাবলারাম ভাবিল—"কি বিভ্রাট ! এতটা কষ্ট করে—এতটা পথ এসে স্বর্গের দরজা থেকে ফিরে যাওয়াও তো যুক্তিসিদ্ধ নয়। যা থাকে কপালে—আর একটু কষ্ট স্বীকার না হয় ক'রেই দেখা যাক্ !"

এই ভাবিয়া মূষিকচাঁদের লাঙ্গুল টানিয়া বড় করিয়া লইয়া খুব জোরে নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধিয়া চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। মূষিকচাঁদ গরুর গাড়ীর মতন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ক্যাবলারামের পিট ছড়িয়া যাইতে

লাগিল,—শ্রীফলের ন্যায় মস্তকটী পাহাড়ের গায়ে ঠকাঠক্ করিয়া ঠুকিতে লাগিল! তিনি মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন,—"মা সর্ব্বমঙ্গলে—শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! আর কষ্ট সহ্য হয় না,—এইবার দেখা দে জননি! এত কষ্ট ক'রে—এতদূর এসে যদি তোমায় না নিয়ে যেতে পারি,—তা'হ'লে বাংলাদেশে আর আমি মুখ দেখাতে পার্ব্ব না। দোহাই মা—আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি,—প্রাণ বেরিয়ে গেল!" দয়াময়ীর অসীম করুণা! তাঁহার চরণ স্মরণমাত্রেই ক্যাব্‌লারাম একেবারে চূড়ায় উঠিয়া পড়িলেন। মুষিকচাঁদ ক্যাব্‌লারামের কটীদেশ হইতে নিজের লাঙ্গুল খুলিয়া লইয়া বলিল, "এই সাম্‌নে মহাদেবের সিংদরজা,—এই তোমার কৈলাস পর্ব্বত! এইবার তুমি দেখাসাক্ষাৎ কর্ব্বার বন্দোবস্ত আপনি ক'রে নাও! আমি আর তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট ক'র্ত্তে পার্ব্ব না; মনিবের কাছে গিয়ে—হাজ্‌রে কেতাবে নাম সই করি,—নইলে মাহিনে কাটা যেতে পারে!" এই বলিয়া মুষিকচাঁদ কোথায় অদৃশ্য হইল। ক্যাব্‌লারাম সেইস্থানে খানিকক্ষণ থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। খালি অন্ধকার,—তাহার মধ্যে এক একবার তীব্র জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িতেছে—আবার তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতেছে। ক্যাব্‌লারাম এক পা'ও নড়িতে চড়িতে পারেন না। স্থির জানেন, —বেজায় উঁচু পাহাড়ে উঠিয়াছেন,—যদি নীচে পড়িয়া যান,—

তাহা হইলে হাড়ের একখানা কুঁচিও পাওয়া যাইবে না। এইরূপ স্থিরভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—ক্যাব্‌লারাম সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করা হয় নাই,—ক্যাব্‌লারামের পেট ফলিতে লাগিল। প্রাণের দায়ে তিনি মিহিস্বরে ডাকিলেন,—"ইঁদুর ভায়া! এখানে আছ কি?" যেমন কথা কহিয়াছেন—অম্‌নি হুম্‌ করিয়া একটা আওয়াজ হইল—, আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল,—ঠিক যেন নাট্যমন্দিরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরিয়া গিয়া দৃশ্যপট প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ক্যাব্‌লারাম যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সম্মুখে দেখিলেন—এক বৃহৎ সিংহদ্বার! কিন্তু ওরে বাবা—একি? ভয়ঙ্কর বিকট-দর্শন বৃহদাকার সিংহ সকল ফটকে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। ক্যাব্‌লারামের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল; বুকের ভিতর ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। ক্যাব্‌লারাম ভয়ে "মা মা" শব্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া গম্ভীরচালে একটী সিংহ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত,—সঙ্গে সঙ্গে ক্যাব্‌লারামও ধড়াস্‌ করিয়া ভূতলে পতিত! পশুরাজ ক্যাব্‌লা-রামের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিল,—"আরে ছিঃ—ক্যাব্‌লারাম! তুমি এমন ছেলেমানুষ? আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছ? আমরা হিংস্র জন্তু—মানুষ নই! তোমরা মানুষ হ'য়ে চতুষ্পদকে এত ভয় কর? আমরা তোমাদের পরম মিত্র—পরম

বিশ্বাসী—পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের শত্রু তোমাদের জাতিভাই। মানুষের পরম শত্রু মানুষ,—এত কাল পৃথিবীতে থেকেও তা বুঝ্‌তে পারনি? চল—অনেক দূর থেকে এসেছ, বিশ্রাম কর—তামাক খাও—হাত পা ধোও—জিরোও—জলটল খাও!” পশুরাজের মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট হইয়া ক্যাব্‌লারাম সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটু বুকে বল বাঁধিয়া বলিলেন,—“পশুরাজ! কথামালায় দু’ একটা গল্পেই কেবল আপনাদের মহত্ব ও উদারতার কথা শুনিয়াছি,—আজ তা’ চক্ষে দেখ্‌লেম। আপনারা এমন না হ’লে মা দুর্গা কি বিশ্বাস ক’রে আপনাদের ঘাড়ের উপর শ্রীচরণ রাখেন? তা’ সিঙ্গি মশাই! আপনি যখন আমার পরিচিত দেখ্‌ছি—তখন আমার এখানে আসার পরিশ্রম যা’তে বিফল না হয়—আপনি সেই বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য করুন।” সিংহ বলিল,—“আমি আর কি সাহায্য ক’র্ব্ব?”

ক্যাব্‌লারাম সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দপ্তরখানায় গিয়া হাজির হইলেন। সিংহ মহাশয় একটা ঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন,—“তুমি এইখানে বোসো—আমি খানসামাদের খবর দিই।” এই বলিয়া সিংহ মহাশয় বিদায় হইলেন। ক্যাব্‌লারাম একটা খাটিয়ায় খানিকক্ষণ বসিলেন,—কিন্তু ভাবিলেন,—“কৈলাসধামে এসেছি—এখানে তামাকের বন্দোবস্ত ঘরে ঘরে

থাকাই সম্ভব।” এই ভাবিয়া ঘরের চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু পাইলেন না। এমন সময় ছুটী মর্কটরূপী খানসামা—একজন গাঁজা সাজিয়া অন্যজন তামাক হুঁকা কলিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ক্যাব্লারাম সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমরা ছুটী কে বাবা?” একজন বলিল,—“এজ্ঞে—আমি নন্দী—ইনি ভৃঙ্গি! আপনি এসেছেন শুনে তাড়াতাড়ী বড় তামাক ছোট তামাক ছুই-ই সেজে এনেছি। যা' ইচ্ছা হয় খান।” ক্যাব্লারাম সিদ্ধ যোগী—দস্তুর মতন প্রাণ ভরিয়া ছুই রকমেরই সদ্গতি করিয়া ফেলিলেন। তামাকু-সেবন সমাপনান্তে ক্যাব্লারাম নন্দীভৃঙ্গির সহিত মানস-সরোবরে গিয়া মুখ হাত পা ধুইলেন এবং পুনরায় সেই ঘরে আসিয়া চারি জোড়া রাতাবী সন্দেশ ও এক ঘটী জল খাইয়া একটু সুস্থ হইলেন। জলযোগের পর ক্যাব্লারাম ম্যানেজার “চোরা” মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। চোরা মহাশয় তখন দপ্তরখানায় বসিয়া আম্‌লা মুহুরী (অর্থাৎ ভূত প্রেত) ইত্যাদির সহিত হিসাবেনিকাশকার্য্যে মহাব্যস্ত রহিয়াছেন। “চোরা” মহাশয়ের চেহারা দেখিয়া ক্যাব্লারাম ভাবিলেন,—“উঃ—এ ব্যাটাকেও ম্যানেজার করে? চেহারা তো নয়—যেন সাক্ষাৎ যম। চুরি ক'রে ব্যাটা ছু'দিনেই সমস্ত এষ্টেট্‌ নীলামে চড়াবে! কথা কইছে—যেন বাজ ডাক্‌ছে। দিনরাত্তির কেবল পোড়ার

মুখ খিঁচিয়েই আছেন। এ ব্যাটা পাষণ্ডের খোসামোদ ক'র্ত্তে হ'লেই তো গিয়েছি!" ক্যাব্লারাম এক পাশে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত ভাবিতেছেন,—এমন সময় চোরা মহাশয়ের কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। চোরা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি? কিসের নালীশ তোমার? কতদিনের খাজনা দাওনি? এ'বার এক পয়সাও ছাড়ব না। বাকি শোধ না দিলে, এবার তোমার ঘর জ্বালিয়ে দেবো"—ইত্যাদি বিস্তর' কথা কহিয়া গেল;—ক্যাবলারাম ইহার উত্তর দিবেন কি,—কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে—কি আজ্ঞা ক'চ্ছেন হুজুর? আমি ক'ল্‌কাতা থেকে মাকে নিতে এসেছি। আমি ক্যাব্লারাম।"

চোরা মহাশয় আরও একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"বুঝিছি বুঝিছি! মা ঠাক্‌রুণকে নিতে এসেছ? সে সব হবে টবে না! এ'বার তো তিনি যাবেন না—ব'লেছেন। কি ক'র্ত্তে যাবেন? বছর বছর অপমান ক'র্ত্তে তাঁ'কে তোমরা নিয়ে যা'চ্ছ বইতো না! আর তা'ও বলি বাপু! অত সখে আর কাজ কি? নিজে খেতে পাওনা—মাকে নিতে এসেছ?"

ক্যাব্লারাম বুঝিলেন,—"এ চোরা ব্যাটা—মানুষের চেয়েও দুর্ম্মুখ।" কথা শুনিয়া মনে মনে একটু চটিলেন; কিন্তু ভাবিলেন, অনর্থক রাগ করিয়া কোনও ফল নাই; কোনও রকমে স্বকার্য্য-

সাধন করাই আবশ্যক। এই ভাবিয়া নম্রস্বরে বলিলেন,—"আজ্ঞে আপনি যা ব'ল্‌ছেন—সবই সত্য বটে। তবে কি জানেন,—বৎসরান্তে একবার মাকে দেখ্‌ব—বড় আশা ক'রে সকলে বসে আছি। আপনি মহাশয় ব্যক্তি—আপনার যথেষ্ট নাম ডাক আছে। আপনার দয়ার উপর নির্ভর ক'রে—ভরসা ক'রে এতটা পথ প্রাণটা হাতে ক'রে এসেছি। আপনি যদি দয়া না করেন—তা'হ'লে আমি আপনার শ্রীচরণতলে আছাড় খেয়ে ম'র্ব্ব। আপনিই গরীবের মা বাপ্‌!" খোসা-মোদের বশ কে নয়? ক্যাব্‌লারামের কথায় চোরা মহাশয় একটু নরম হইলেন। একটু গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তা বাপু ক্যাব্‌লারাম! তুমি যখন এতটা পথ এসেছ,—তা'—মা ঠাকুরুণকে পাঠাবার সম্বন্ধে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে কি জান,—তোমাদের বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের বড় দুর্নাম হ'য়েছে, তাই আমরা এ'বার মাকে বাংলায় পাঠাব না স্থির ক'রেছি। তা তুমি যখন এসে পড়েছ—দেখ একবার সবাইকে ব'লে ক'য়ে। কর্ত্তা আছেন—মা ঠাকুরুণ আছেন—ছেলেবাবুরা আছেন,—দিদিমণিরা আছেন,—সবাইকে গিয়ে বল।" এই বলিয়া চোরা মশাই হাঁকিলেন,—"ওরে নন্দে!" নন্দী হাজির ছিল,—তটস্থ হইয়া বলিল,—"আজ্ঞে"! চোরা বলিল,—"যা—ক্যাব্‌লা বাবুকে সকল-কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিগে যা।" নন্দী "যে আজ্ঞে" বলিয়া

ক্যাব্‌লারামকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানামহলে কার্ত্তিক ঠাকুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক ঠাকুর তখন চুল ফিরাইতেছিলেন। তিনটী অপ্সরী তিন শিশি তেল হাতে লইয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সবাই বলে,—"ঠাকুর! আমার তেলটা দেখুন—কেমন মনোমুগ্ধকর গন্ধ! কেমন মাথা ঠাণ্ডা হয়—কেমন প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়!" কার্ত্তিক ঠাকুর মহা ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন,—কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে রাখিবেন! ক্যাব্‌লা-রামকে দেখিয়া কার্ত্তিক ঠাকুর তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন,—"তুমিতো বাবা সহুরে লোক! বল দেখি—কোন তেলটা ভাল! এরা তিনজনেতো লাঠালাঠি আরম্ভ ক'রেছে।" ক্যাব্‌লারাম হাসিয়া বলিলেন,—"হুজুর যদি অভয় দেন—তা'হ'লে বলি,—ও বাজারের শিশিতে ভরা—বিজ্ঞাপনে জাহীর করা—কোন তেলই ভাল নয়! ওতে সব সস্তাদরের বিষাক্ত তেল—(যথা, প্যারাফিন্, লিউব্রিকেটীং, মিনারেল্ ইত্যাদি খনিজ তেল) মিশ্রিত আছে! এমন বিশ্বভোলানো সুন্দর কেশ আপনার,—কেন ঐ সব বিষাক্ত তেল মেখে অল্পদিনে পাত্‌লা কটাবর্ণ—বিশ্রী ক'র্ব্বেন? শুধু কি তাই,—ঐ সব বাজারের তেল দিনকতক মাখ্‌লে যথার্থ ই আপনার বেয়ারাম জন্মাবে!"

কার্ত্তিক ঠাকুর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এঁ্যা—বল কি হে? এ সব এমন সর্ব্বনেশে তেল? এদিকে বিজ্ঞাপনে

তো খুব লেখে দেখ্‌তে পাই,—অত্যন্ত মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারী, মাথার টাকের মহৌষধ—দু'দিনেই ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি গজিয়ে ওঠে—ব্যবহারে সকল রকম মাথার বেয়ারাম সারিয়া যায়!" ক্যাব্‌লারাম বলিলেন—"ও সমস্ত দোকানদারী কথা না ব'ল্লে বিক্রী হবে কেন প্রভু? শুধু কি তাই? ঐ সঙ্গে বিলিতী এসেন্স্‌ টেসেন্স্‌ মিশিয়ে বেশ একটু সৌগন্ধ ক'রে দেয়,—পৃথিবীর মূর্খ লোকেরা খুব তাই কিনে কিনে ব্যবহার ক'চ্ছে! আপ'ন তো আর তা'দের মতন মূর্খ নন্‌! আপনি ভাল ফুলেল্‌ তেল ব্যবহার করুন—গোলাপ জল মাখুন—"

কার্ত্তিক বলিলেন,—"সে তো আমি গাজীপুর থেকে তৈরি করিয়ে এনে নিত্য ব্যবহার করি—এই দেখনা আমার টেবিলে সাজানো র'য়েছে। তা' এ' অপ্সরীগুল যখন ক্যান্‌ভাস্‌ ক'র্ত্তে এসেছে,—এদের (বিশেষতঃ অবলা স্ত্রীলোকদের) বিমুখ করা তো উচিত নয়—"

ক্যাব্‌লারাম হাসিয়া বলিলেন,—"হুজুর! তা' ক'র্ব্বেন কেন? স্ত্রীলোকদের প্রাণে কি ব্যথা দিতে আছে? আপনি তেল তিন্‌টাই কিনে নিন্‌,—কিন্তু মাখ্‌বেন না,—এই আমার অনুরোধ!"

কার্ত্তিক ঠাকুর বুঝিলেন,—"এ পরামর্শ মন্দ নয়।" তিনি তখন তিন জনকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ক্যাব্‌লারাম একটু নিরিবিলি দেখিয়া আপনার আর্জ্জি পেশ্‌ করিলেন।

কার্ত্তিক বলিলেন,—"আমার এতে আর অমত কি ? আমি আজ যেতে পেলে কাল চাই না। তবে আর ময়ূরে চ'ড়ে যেতে ইচ্ছে করেনা। একখানা এরোপ্লেন্ কিম্বা মোটর্ ট্যাক্সি যদি আন্‌তে ত' বড়ই ভাল হ'ত !"

ক্যাবলারাম বলিলেন,—"তা'র জন্য আর ভাবনা কি ? ক'ল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে আপনাকে ২৪ ঘণ্টা মোটরে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াব। এখানে আনাতো বড় সুবিধে নয়। আর এরোপ্লেনের এখন খুব চল্‌তি হ'চ্ছে ! সকালে বিকেলে চ'ড়তে পাবেন !"

কাৰ্ত্তিক। "বটে ? আচ্ছা—তাই হবে। আর দেখ—ক'ল্‌কাতায় অমুক বাইজীর খুব নাম শুনেছি,—তা'র গান শুন্‌তে আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আছে,—তা'র একটা বন্দোবস্ত ক'র্ত্তে পার ?" এই বলিয়া ক্যাব্লারামকে কাণে কাণে আরও কি বলিলেন। ক্যাব্লারাম এক গাল হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,— "যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—তা'র জন্য ভাবনা কি ? ক'ল্‌কাতার সহরে কত গাধা গরু—কত ফোতো বাবু (ট্যাঁকে এক কড়া কড়ি নেই) কেবল ধার করা জুড়ীগাড়ী আর ঝুটো হীরের আংটী দেখিয়ে কাপ্তেনী ক'চ্ছে—পসার মাচ্ছে ! আর আপনি বিশ্বপতির ব্যাটা—আপনি স্ফূর্ত্তি ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না ?"

কার্ত্তিক ঠাকুরকে আঠার আনা রাজী করাইয়া ক্যাব্লারাম গণেশ দাদার পাঠাগারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেশ দাদা

চারি ধারে মোটা মোটা কেতাব ছড়াইয়া মধ্যস্থলে কাগজ-কলমহস্তে গজগিরিটী হইয়া বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। ক্যাব্‌লারামের নিকট কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, —"আমি বাপু সে বাংলাদেশমুখো আর হ'চ্ছি না, আমার বড় ঘেন্না জন্মে গেছে!"

ক্যাবলা। "কেন দাদা! আপনি নির্ব্বিরোধী শান্তপ্রকৃতি,—আপনি হঠাৎ এতটা আমাদের দেশের উপর চ'টুলেন কেন?

গণেশ। "চ'টুব না? তোমাদের বাংলাদেশে আজকাল ক' ব্যাটা মুর্খ সমালোচকদের যে রকম দৌরাত্ম্য আরম্ভ হ'য়েছে, কোন্ ভদ্র লেখকের সেখানে যেতে ইচ্ছা হয়? আমার এতকালের সুলেখক বলে যে সুনামটা আছে,—না পড়ে না বুঝে ফস্ ক'রে একদিন এক ব্যাটা আহম্মক আমার লেখার উপর অন্যায় রকম সমালোচনা ক'রে ব'স্‌বে,—আর আমি সেই ব্যাটার মুর্খামি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্ব্ব বল দিকি? ব্যাটারা নিজেতো বিদ্যের জাহাজ! পরকে "ভাষা" শেখাতে যায়,—কিন্তু নিজের সেই দু' ছত্র সমালোচনার ভেতরই যে সাড়ে পনেরো আনা "ভাষার ভুল" থাকে,—ছুঁচো বেটারা তা দেখে না।"

ক্যাবল। যা' ব'ল্‌ছেন তা' বড় মিথ্যে নয়। বাংলায় আজ-কাল দু'একটা অকালকুষ্মাণ্ড ভুঁইফোঁড় সমালোচকের উৎপত্তি হ'য়েছে,—তা'রা গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল। তা'দের

"সমালোচনা" অর্থে "চ্যাংড়াপনা!" আজ হয়তো কোনরকম বিদ্বেষবশতঃ রাগের মাথায়—একজনের লেখার যা'চ্ছেতাই নিন্দে ক'ল্লে,—কাল সেই লেখকের সঙ্গে যেই সদ্ভাব হ'য়ে গেল,—কিম্বা তাঁ'র দ্বারা কোন রকম সাংসারিক বা আর্থিক উপকার হ'ল,—অম্নি তাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে—তাঁ'র লেখার সুখ্যাতি কর্ব্বার কি ঘটা! বাংলার সমালোচক ঘুস্ খেয়ে সুখ্যাতি করে,—খাতিরে প'ড়ে খারাপকে খুব ভাল ব'লে প্রচার করে,—প্রহার খাবার ভয়ে ডান্‌পিটে লেখকের মন জুগিয়ে সমালোচনা করে,—আর চট্ ক'রে নিজের নামটা সাহিত্যজগতে জাহীর কর্ব্বার জন্য "এলো-পাতাড়ি" ভদ্রলেখকদের অন্যায় রকম গালাগালি দিতে আরম্ভ করে! এই হ'ল বাংলাদেশে সমালোচকের ব্যাপার! তা' আপনি অনর্থক মাথা গরম ক'চ্ছেন কেন? তা'রা আপনারাই ঘেউ ঘেউ ক'রে মরে,—কেই বা তা'দের ডাকে কাণ দেয়,—কেই বা তা'দের গ্রাহ্য করে! মরুক্ না ব্যাটারা কেঁউ কেঁউ ক'রে,—আপনি রাগ করেন কেন? গুড়ের মাছিও আছে—আবার বিষ্ঠার মাছিও আছে। এ সব শ্রেণীর সমালোচক—যা'রা কেবল লোকের মন্দ খুঁজে বেড়ায়,—এদের বিষ্ঠার মাছি ব'লে ঘৃণা ক'রে উপেক্ষা করাই ভাল।"

গণেশ ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"তা' যা' বলেছ,—ন্যায্য কথা বটে। নীচ যদি উচ্চ ভাষে—সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে! কিন্তু

একটা ভারি মজার কথা শুনলুম,—সমালোচক প্রহারের ভয়ে সুখ্যাতি করে—হা—হা—হা—হা—ভারি রগড়ের কথা তো—" বলিয়া শুঁড় দুলাইয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। ক্যাবলারাম বলিলেন, "আজ্ঞে—ধর্ম্মাবতার! আপনার কাছে কি আমি মিথ্যা ব'লতে পারি? আমাদের ষষ্ঠিতলার বেন্‌দা ঘোষাল কেতাব লিখে-ছিল। "রাক্ষসী" কাগজের সমালোচক নাকি তা'র যথেষ্ট নিন্দে ক'রে তা'র লেখার দুর্নাম ক'রেছিল! দৈবের কল,—সমালোচনা বেরুবার দু'দিন পরে সেই সমালোচক একদিন রাত্রিবেলা বেন্‌দা বামুনের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে, বেন্‌দা বাঘের মতন লাফিয়ে তা'র গলার চাদর বাগিয়ে ধ'রে এই মারে তো এই মারে! সমালোচক ভয়ে কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ল্লে—"এমন কাজ কখনো ক'র্ব্বনা—দাদা! আগামী মাসে তোমার ব'য়ের ঝাড়া এক পৃষ্ঠা সুখ্যাতি বা'র ক'র্ব্ব!" বেন্‌দা তা'কে শাসিয়ে ব'ল্লে—"আচ্ছা আজ ছেড়ে দিলুম—চলে যাও! মোদ্দাৎ সাম্‌নে মাসে যদি সুখ্যাতি না কর—তোমাকে যেখানে পাব ধ'রে তোমার ডানহাতখানি গুঁড়ো ক'রে দোবো,—এতে না হয় দু চার বছর জেল খেটে আস্‌ব!" সমালোচক পরের মাসে বেন্‌দা ঘোষালের কেতাবের সুখ্যাতিতে সেই মাসিক পত্রের আড়াই পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিলে! এটা সত্যি ঘটনা হুজুর! মারের ভয় বড় ভয়।"

গণেশ। "সমালোচনা বড় শক্ত কাজ। ন্যায় বিচার ক'রে—যে

টুকু ভাল—সেইটুকু ভাল ব'লে উৎসাহ দিতে হবে! যে টুকু মন্দ, সেটুকু মন্দ ব'লে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে। একি যে সে আহাম্মক মূর্খের কাজ গা? তা যাক্—তুমি যখন এতটা পথ এসেছ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। এখন অন্যান্য সকলের মত নিয়ে উদ্যোগ কর্‌গে—আমি একটা প্রবন্ধ লিখ্‌তে ব্যস্ত আছি।"

ক্যাব্‌লারাম গণেশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নন্দীর সহিত বেলতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাবা বিশ্বনাথ আহারান্তে বিল্বতলায় লম্বা বাঘছাল বিছাইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছেন। এক পাশে তানপুরাটী পড়িয়া আছে,—এক পাশে গাঁজার কলিকা, ধুতুরা, ইত্যাদির সরঞ্জম রহিয়াছে; পাশ-তলায় বাহন "ষাঁড়টী" বড়লোকের মোসাহেবটীর মতন বসিয়া জাবর কাটিতেছে। নন্দী বলিল,—"তাইত! কর্ত্তাঠাকুর এখন খাওয়া দাওয়া ক'রে জিরুচ্ছেন,—এ'সময়ে ঘুম ভাঙ্গাই বা কি ক'রে? আপনি এইখানে একটু বসুন। এখুনি ঢুলে ঢুলে মাথা তুলে জেগে উঠ্‌বেন।" এই বলিয়া নন্দী প্রস্থান করিল। ক্যাব্‌লারাম মনে ভাবিলেন,—"আমি কেন এই অবসরে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি থেকে শিবের সেই ধ্যানটা আওড়াইতে থাকি না! তা'হ'লে ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হবেন।" এই ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন,—"ধ্যায়িত্যং রজতং গিরিনবং চারুচন্দ্রং বতংসং রত্নং কল্পং জলাঞ্জলং"—কথা কেমন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। অত থং হং সং বলাতো

ক্যাব্‌লারামের অভ্যাস নাই! কিন্তু সেই অর্দ্ধছত্র ধ্যানের খোঁচাতেই ভোলানাথ চম্‌কিয়া উঠিলেন। নেশার ঘোর বোধ হয় ততটা কাটে নাই,– ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন অর্দ্ধোন্মীলিত করিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে একটা হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি! দেখিয়া বিশ্বনাথ একটু যেন থতমত খাইলেন। বলিলেন,—"এঁ্যা – এঁ্যা—কে বাপু তুমি?"

ক্যাব্‌লারাম সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! আমি ক্যাব্‌লারাম!"

ভোলানাথ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"তুমি? ক্যাব্‌লারাম? এস বাবা এস—বস; এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি বটে? ওরে নন্দে! বাড়ীতে গিন্নীকে বল্‌—ক্যাব্‌লারামকে ভাত বেড়ে দিক্‌ –"

ক্যাবলা। "আজ্ঞে—প্রভু! তা'র জন্য আর ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? যখন আপনাদের চরণতলে এসে পড়েছি,—যখন মা অন্নপূর্ণার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, – তখন তো খাওয়াদাওয়া হবেই! এখন কৃপা ক'রে দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! আমি মাকে নিতে এসেছি– ছেলেমেয়েদের নিতে এসেছি—আমার প্রতি সদয় হোন্‌।"

ভোলানাথ। "বাপু ক্যাব্‌লারাম! তোমাদের এ দুঃসময়ে তাঁ'কে নিয়ে যাবার হাঙ্গাম ক'চ্ছ কেন? তোমাদের অবস্থা তো আর এখন তেমন নেই! তোমাদের বাংঙ্গালা দেশের সব রকম

সকম দেখে আমি সেখানকার সকল সম্পর্ক তুলে দেবার মতলব ক'চ্ছি! হিঁদুর হিঁদুয়ানি নেই,—ব্রাহ্মণে অনাচার ক'চ্ছে, দেবদ্বিজের অমর্য্যাদা হ'চ্ছে—চণ্ডালে বেদ পাঠ ক'রে সরস্বতীর অপমান ক'চ্ছে! লক্ষ্মীকে ধ'রে শুঁড়ীর ঘরে—ম্লেচ্ছের ঘরে—বেশ্যার ঘরে তুলে দিয়ে আস্‌ছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ১৭ আনা পাপ ঢুকেছে। সকল ব্যাটাই গুরু—চ্যালা কেউ হ'তে চায় না! গুণীর গুণ বোঝে না—মানীর মান রাখে না! দশ বছরের ছেলে মদ খাচ্ছে—বেশ্যা বাড়ী যাচ্ছে—বাপ মা গুরুজনকে অপমান ক'চ্ছে! আবার তা'র ওপোর বাঙ্গালীর চরিত্র এতদূর জঘন্য হ'য়েছে যে তা'দের কিছুতেই আর বিশ্বাস করা যায় না। ও সমস্ত মতলব ছেড়ে দাও। এখানে এসেছ—বেশ কথা! খাও দাও বেড়াও আরাম কর, যতদিন ইচ্ছে থাক—কোন ভাবনা নেই!" বাবা বিশ্বনাথের মুখে আপনার জাতিভায়ের অখ্যাতি শুনিয়া ক্যাব্‌লারাম মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যাহা হৌক্ স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য সকল রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে তিনি প্রস্তুত। কিছুক্ষণ নীরবথাকিয়া দেবাদিদেবকে বলিলেন,—"প্রভো! আর পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালীরা অনেক দোষে দোষী,—অনেক পাপে পাপী,—তা'র জন্যে আপনারা রাগ ক'রে থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন! কথায় বলে—কুপুত্র যদ্যপি হয়—কুমাতা কখনও নয়! আমরা যত অপরাধ করি না কেন—

আমরা তো মায়ের ছেলে বটে! মা কি ছেলেদের ত্যাগ ক'রে থাক্‌তে পার্ব্বেন? আর আপনিতো সদানন্দ আশুতোষ,—আপনার তো কা'রও উপর রাগ থাক্‌তেই পারেনা। ক্ষেমাঘেন্না ক'রে—মাকে যেতে অনুমতি দিন! শুধু বাংলাদেশ নয় বাবা,—সমস্ত ভারতবাসী মা'র আশাপথ চেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে রয়েছে!"

মহাদেব তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া নিমীলিতনেত্রে গুড়গুড়ির নল টানিতে টানিতে তন্নিবিষ্টচিত্তে ক্যাব্‌লারামের কথা শুনিতে-ছিলেন। ক্যাব্‌লারামের কথা শেষ হইলে উঠিয়া বসিয়া গুড়গুড়ির নলটী একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া নন্দীকে আর এক ছিলিম তাওয়া দিয়া তামাক আনিতে আদেশ করিলেন। নন্দী কলিকা লইয়া চলিয়া গেলে—ক্যাবলারামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ বাবা ক্যাবলারাম! তোমাকে তবে আসল কথাটা খুলে বলি। ভগবতীকে (ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিয়ে) ভারতবর্ষে পাঠাতে আমার কিছুতেই মন চাইছে না। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি বাবা—আমার বুড়ো বয়সে একটু ভয় হয়েছে! তোমাদের (অর্থাৎ ভারতবাসীদের) কি সঙ্গীন অবস্থা—তা' দেখতে পাচ্ছ তো? পাঞ্জাবে যে কাণ্ড কারখানাটা হ'ল—তা' দেখে কি আর ভারতে স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গকে পাঠাতে প্রাণ চায়? খবরের কাগজে যখন তোমাদের অবস্থার কথা পাঠ করি, তখন, শুনে আমারই পেটের ভেতোর হাত পা

সেঁধিয়ে গেছে ! এ সব দেখে শুনে কি সেখানে মাগছেলেদের পাঠাতে প্রাণ চায় ?" ক্যাবলারাম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এ সব তো আপনাদের দোষ ! আপনারা—দেবতারাই তো এ সব কাণ্ডকারখানা করেছেন ! সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় ভগবান আপনি—মনে কল্লেই তো এ সব না ঘ'টুতে দিতে পার্ত্তেন ! আপনি ইচ্ছা ক'ল্লেই তো সমস্ত গোলযোগ নিবারণ ক'র্ত্তে পার্ত্তেন ! হায় হায় ঠাকুর ! কলিতে দেবের দেবত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে !"

মহাদেব ক্যাবলারামকে উত্তেজিত দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, —"বাবা ক্যাব্‌লারাম ! মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ছেলে কিনা তুমি, আমার কোর্টে এসে আমাকে খুব দু'কথা শুনিয়ে দিলে ! দেবতাদের কিছু দোষ নেই বাপ ! মনে রেখো—কালই বলবান,—কালে সকলই হয় ! দেব যক্ষ রক্ষ নর কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলকারই লীলাখেলার একটা কাল নির্দ্দিষ্ট আছে ; সেই কাল পূর্ণ হ'লেই যা'র যা' কর্ম্মফল তখন প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে ! দেবত্ব আর কিছুই নয় বাপ,—কেবল কর্ম্মফলের প্রতিপত্তি । যে যেমন কর্ম্ম ক'র্ব্বে—সে ঠিক সেই ওজনে ফলভোগ ক'র্ব্বে,—তা'র জন্যে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না । তোমাদের এখন বড় দুঃসময়,—তা' নইলে অমন একটা লোকের মতন লোক, আমাদেরই অংশজাত,—অমন স্বদেশবৎসল

—প্রকৃত দেশহিতৈষী—অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগী—হিন্দুগৌরব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক,—তোমাদের ত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে আস্‌বেন কেন? বেচারী যদিও বা আরও দু' দশ বছর সেখানে থাক্‌তেন—কেবল জেলে গিয়ে গিয়ে দেহমন একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন! দেশের প্রতি অবিচার নিবারণ কর্ব্বার জন্য এবং জাতীয় উন্নতিকল্পে লোকমান্য তিলক যা' ব'ল্‌তেন—যা' লিখ্‌তেন,—যা' লোককে উপদেশ দিতেন,—সে সবই কপালদোষে বিদ্রোহসূচক হ'য়ে যেতো! হায়-হায়—বাবা ক্যাব্‌লারাম! এখনও একজন তোমাদের ভেতোর আছেন—**মহাত্মা গান্ধী**—"তাঁর জন্যে তো ভাবনায় আমার ঘুম হ'চ্ছে না!"

ক্যাব্‌লারাম হাসিয়া বলিলেন,—"তাঁ'র জন্যে কিছু চিন্তা ক'র্ত্তে হ'বে না ঠাকুর! তিনি অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ,—তিনি মাতৃভূমির মঙ্গলের আশায় সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রেছেন। তাঁর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে আছে! সমস্ত দৈবশক্তি সেই মহাত্মাতে পুঞ্জীকৃত,—তাঁর জন্যে কি ভাবনা বিশ্বনাথ?"

মহাদেব বলিলেন—"যাই হোক্ বাবা ক্যাবল্—তুমি যাই বল,—এবার আমি স্ত্রীপুত্রদের কিছুতেই ভারতে পাঠাতে পার্ব্ব না! একটা হাঙ্গাম্ হুজ্জোৎ বাঁধ্‌তেই বা কতক্ষণ! আবার কি শেষে সতীহারা হ'য়ে বুড়ো বয়সে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াব? যাও বাবা—আহারাদি ক'রে বিশ্রাম ক'রে—

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও! যদি কখনো তোমাদের সুদিন হয়—যদি কখনো ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচে—আবার সুখশান্তি ফিরে আসে,—আবার যদি ভারতবাসীর ভারতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস কর্ব্বার দিন আসে,—তা'হলে—তোমাকে আন্‌তে আস্‌তে হ'বে না,—সতী নিজেই হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাদের দেশে যা'বেন! নইলে এই পর্য্যন্ত!" এই বলিয়া মহাদেব গাত্রোত্থান করিয়া মানস-সরোবরে মুখ-প্রক্ষালনাদিকার্য্যে গমন করিলেন।

ভোলানাথের কথা শুনিয়া ক্যাব্‌লারাম একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! এ সমস্ত কথার উপর আর কথা চলে না। তবে বুঝি মাকে আর লইয়া যাওয়া হইল না! ক্যাবলারাম কাঁদিয়া ফেলিলেন! এ নৈরাশ্য-সাগরে একমাত্র বিশ্বপালিনী মা জগজ্জননীর চরণতরণী ভিন্ন আর তো অন্য উপায় নাই! ক্যাব্‌লারাম আকুল প্রাণে যুক্তকরে জানু পাতিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"মা—জগজ্জননি! দুর্গে! দয়াময়ি! ত্রিভুবনপালিনি—শিবে শঙ্করি! এ সঙ্কটে কোথায় তুমি মা! বড় আশা ক'রে তোমার দ্বারে এসেছি,—সন্তানকে কি নিরাশ ক'র্ব্বি? তোর দয়াময়ী নামে কলঙ্ক দিবি? মাগো! এত কষ্ট ক'রেও যদি তোমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে না পারুম,—তবে আমার এ ছার প্রাণে কাজ কি?" বলিয়া ক্যাব্‌লারাম ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে

নিমীলিতনেত্রে ক্যাব্লারাম শুনিলেন—মা বলিতেছেন,—"ভয় কি বাপ্! এই যে আমি তোর বাড়ীতে এসেছি! তুই ভক্তিভরে মা ব'লে আমায় ডাক্লি—আমি কি তোর প্রাণে ব্যথা দিতে পারি? তোর মতন সন্তানের বাসনা কি অপূর্ণ থাকে?" ক্যাব্লারাম চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার সেই পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার ঠাকুর-দালানে মা দশভুজা মূর্ত্তিতে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কাপ্তেনের মা

ললিতমোহন বসু কলিকাতা সহরের একজন বড় দরের 'কাপ্তেন।' "কাপ্তেন" খেতাব যে-সে পায়না; লোক বুঝিয়া লোকে এই খেতাব দিয়া থাকে। কথাটা বোধ হয়, জাহাজের কাপ্তেনের দুই হাতে অকাতরে, অবিচারে, অকাজে অর্থব্যয় হইতেই উঠিয়াছে! দোল, দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকলাপ, ঘটা করিয়া পিতামাতার শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডকরণ, কন্যার বিবাহ ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিতে অর্থব্যয় কর, বৃহৎ গোষ্ঠী প্রতিপালন কর,—অনাথ, দরিদ্র, বিপন্নকে সাহায্য কর,—কিন্তু সখের "কাপ্তেন বাবু" বলিয়া কেহই তোমাকে ডাকিবে না। সপ্তাহে সপ্তাহে বাগানে ভোজ দাও, বাইজীর সঙ্গীত-সমুদ্রে আহোরাত্র নিমজ্জিত থাকে, আশে পাশে বন্ধুবান্ধব লইয়া ল্যাণ্ডো মোটার—নিদেন একখানা টম্‌টম্ হাঁকাইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া বৈকাল বেলা কুপল্লীর অভিমুখে গমন কর,—শতকরা ত্রিশ টাকা হারে সুদ দিয়া, দশহাজার টাকা লিখিয়া হাজার টাকা কর্জ্জ লও, ভিটেয় রাত্রিবাস একেবারে পরিত্যাগ কর, পৈতৃক ভদ্রাসন খানি পর্য্যন্ত বন্ধক দাও, তাহা হইলেই তুমি কলিকাতা সহরের একজন আদর্শ "কাপ্তেন বাবু"। ললিতমোহন আমাদের সেই শ্রেণীরই "কাপ্তেন বাবু"। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য—তিনি একজন বড়

ঘরের ছেলে! স্বর্গীয় পিতৃদেব যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন,—তাহারই জোরে কাপ্তেনি করিয়া ললিতমোহন যথাসর্ব্বস্ব তো শেষ করিলেনই,—উপরন্তু বিষম ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পরে "কাপ্তেন" বাবুদের যাহা পরিণাম হইয়া থাকে, ললিতমোহন একেবারে সপুত্রপরিবার পথে বসিলেন!

ইহার উপর আরও একটা বিপদ,—ললিতমোহনের দুইটী কন্যা এবং দুইটি পুত্র। এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, তথাপি শরীরের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হেতু এই বয়সে দেহ যেন একেবারে শক্তিশূন্য—ভগ্নপ্রায়। ললিতমোহনের শ্বশুর রসিকলাল দত্ত কোন একটী সওদাগরি অফিসের বড় বাবু। তিনি সাহেবকে বলিয়া কহিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত জামাতাকে নিজের অফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী করিয়া দিলেন। হায়! কাপ্তেন বাবু ললিতমোহনের আজ কি অবস্থা! কিন্তু চল্লিশ টাকা উপার্জ্জনে বাড়ী ভাড়া দিয়া সংসার চালানো আজ কালের বাজারে একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং শ্বশুর মহাশয়কে জামাতার সংসারে প্রতি মাসে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ টাকা সাহায্য করিতে হইত। এইরূপে ললিতমোহনের অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ললিতমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কায়স্থ ঘরের কন্যা,—আর রাখা চলে না; যেমন করিয়া হৌক্—বিবাহ দিতেই হইবে। তাহা না

হইলে—হিন্দুসমাজে জাতকুল রক্ষ করা বিষম দায়! ললিতমোহন দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। চেষ্টার তেমন জোর হয় নাই,—কারণ, তখনও ললিত-মোহন ভাবিতেছিলেন, "মেয়ে তেমন বড় হয় নাই—এখনও ঢের সময় আছে।" কিন্তু সুরবালার যখন ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন ললিতমোহনের সহধর্ম্মিণী রাজলক্ষ্মী স্বামীকে দিবারাত্রি জ্বালাতন করিতে লাগিলেন! কথায় কথায়—উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে—রাজলক্ষ্মী ললিতমোহনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ওগো—তুমিএখনও কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ বল দেখি! মেয়ে যে চোদ্দোয় প'ড়লো! যেমন করেই হোক্ —ধারধোর ক'রে,—নিদেন ভিক্ষে ক'রে একটা পাত্র দেখে শুনে সুরিকে পার ক'রে দাও, আমি যে আর কারুর কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না!" ললিতমোহন কেবলই বলেন,—"হ্যাঁ—এই যোগাড় ক'চ্ছি!" কিন্তু হায়! সকল যোগাড়ের মূল যে রৌপ্য চক্র,—চক্রী বিধাতার চক্রান্তে ললিমোহনের সিন্ধুকে এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই! নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া অনেকে নিজপুত্রের সহিত সুরবালার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন বটে,—কিন্তু "বরের মা" তো আর ক'নের রূপ নিয়ে ধুয়ে খাবেন না! মেয়ে যতই সুন্দরী হোক্, ঘরযতই ভাল হোক্, তাঁহারা কেবল বলেন,—"দু' হাজার দাও,

পাঁচ-হাজার দাও, দশহাজার দাও!" সুতরাং, বড় ঘরে কিম্বা পাশ করা ছেলের সঙ্গে সুরবালার বিবাহের আশা ললিতমোহন একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দুই একজন দোজবরে তেজবরের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল; তাঁহারা মেয়ের বাপের নিকট হইতে কিছুই চান না বটে,—কিন্তু ললিতমোহন বা রাজলক্ষী কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া সোণার পুতলি আদরের মেয়ে সুরবালাকে "বুড়ো বরের" হাতে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না! বিশেষতঃ, ললিতমোহন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—জাত যায় সেও ভাল—তবু মেয়েকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিব না! কিন্তু উপায় কি? বিবাহ তো দিতেই হইবে! রাজলক্ষী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বাপের কাছে গিয়া পড়িলেন। রসিকলাল বাবু কন্যা রাজলক্ষ্মীর বিপদে অত্যন্ত অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সামান্য চাকুরে মানুষ, তিনি তো আর দৌহিত্রীর বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে পারেন না! দুশো আড়াইশো টাকা তিনি উপার্জ্জন করিলেও—সহরে নিজের বৃহৎ গোষ্ঠী প্রতিপালন করিতেই প্রতি মাসে তাঁহার বিশ পঞ্চাশ টাকা ধার হইয়া থাকে! তাহার উপর তিন চারিটী কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত! যা'ই হোক্—এমন অবস্থাতেও তিনি পাঁচশত টাকা দিয়া কন্যাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, "ইহাতেই যেমন করিয়া হয়—কন্যার বিবাহ দাও,

ইহার উপর আমি আর একটী পয়সাও দিতে পারিব না। এই পাঁচশত টাকাই আমাকে কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।" কপর্দ্দকবিহীন ললিতমোহন পাঁচশত টাকা পাইয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে কতকটা ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন বটে,—কিন্তু আজকালের বাজারে মনের মতন পাত্র ৫০০৲ টাকায় কেমন করিয়া জুটিবে? তথাপি নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল! অনেক দেখাশুনার পর শ্যামবাজারনিবাসী উকীল শ্রীরামহরি মিত্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথের সহিত সুরবালার বিবাহ স্থির হইল। রামহরিবাবু সুন্দরী কন্যা দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র রমেন্দ্রনাথ দুইটী পাশ করিলেও তিনি "ক'নের বাপের" নিকট বেশী কিছু চাহিলেন না; বলিলেন,—"নগদ আমি এক পয়সাও লইব না, তবে মেয়েটীকে গা সাজাইয়া গহনা দিতে হইবে!" সত্য কথা বলিতে হইলে, আজ কালের বাজারে রামহরিবাবুর ন্যায় মহৎলোক দেখা যায় না! তাঁহার শরীরে যে যথেষ্ট দয়ামায়া আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে! কারণ, নিজে তিনি সহরের একজন ধনবান গণ্যমান্য ব্যক্তি; মাসে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কলিকাতা সহরে বৃহৎ অট্টালিকা,—দমদমায় দু'শো বিঘা জমীর উপর বাগানবাড়ী; তাহার উপর সোণার চাঁদ ছেলে রমেন, ইন্‌টারমিডিয়েট্ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক

শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। রমেনের বয়স একবিংশতি বৎসর! দেখিতে দিব্য সুপুরুষ! এমন অবস্থায় রামহরিবাবু যে দশ হাজার টাকা চাহেন নাই, বাস্তবিক ইহা তাঁহার যথেষ্ট মহত্ত্বের পরিচয়। ললিতমোহন ভাবিলেন, "এমন পাত্রে যদি সুরবালাকে দান করিতে পারি, ইহাপেক্ষা আমার মতন ব্যক্তির আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? এত কমে এমন মনের মতন পাত্র ত্রিভুবন অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যাইবে না!" রাজলক্ষ্মী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো —তোমার দুটী পায়ে পড়ি, যেমন ক'রেই হোক্—ঐখানেই মেয়ের বিয়ে দাও!" ললিতমোহন অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়া একেবারে রামহরি বাবুকে বলিয়া বসিলেন, "আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, সেইরূপই করিব! মেয়েকে গা সাজাইয়া গহনা দিব!" রামহরি বাবু আশীর্ব্বাদের দিনস্থির করিয়া পাঠাইলেন।

ললিতমোহন স্যাকরা ডাকাইয়া গা-সাজানো গহনার হিসাব করিয়া দেখিলেন, অন্ততঃ দেড় হাজার টাকার কমে কিছুতেই আর মানানো হয় না! কিন্তু হাতে তো মজুৎ মোট পাঁচশত টাকা! তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলি সমস্তই স্যাকরাকে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি আপাততঃ ইহাতেই কাজ আরম্ভ কর, পরে আরও টাকা দিতেছি!" পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে ললিতমোহন যখন "কাপ্তেন বাবু" হইয়া দুই হাতে মুদ্রামধু ছড়াইতেছিলেন, তখন বড় ছোট মাঝারি—সকল রকমের অলিকুল তাঁহার

কুঞ্জে আসিয়া প্রতিদিন গুন্ গুন্ করিত! দেশের বড়লোক এমন কেহই নাই—যাহার সহিত তখন ললিতমোহনের বন্ধুত্ব না ছিল! কিন্তু যখন মধু ফুরাইয়া পাপ্ড়ী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল, তখন কেহ আর ভুলিয়াও ললিতমোহনের তল্লাস করিলেন না। এখন অনেকে তাঁহাকে চিনিতেই পারেন না! যাক্, এ সমস্ত অতি পুরাতন কথা,—একথা নূতন করিয়া বলা বিড়ম্বনা মাত্র! ললিতমোহন অনেকের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলেন; এমন কি, কন্যাদায়ে সাহায্যও চাহিয়াছিলেন; কিন্তু হে বুদ্ধিমান সংসারী পাঠকবৃন্দ! ফলে কি হইয়াছিল,—কোন্ বন্ধু কি বলিয়া ললিতমোহনকে মৌখিক আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন, তাহা আপনারই কল্পনা করিয়া লউন,—আমি আর সে বর্ণনা-বাহুল্য করিব না!

কমলাচরণ সরকার নামে ললিতমোহনের একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। পাঠশালায় দুইজনে বরাবর এক শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন; দুইজনেই সমানভাবে একই চালে চলিয়া একই সময়ে (অর্থাৎ অসময়ে) লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া "কাপ্তেন বাবু" খেতাব লইয়া সংসারসমুদ্রে ফূর্ত্তির জাহাজ ভাসাইয়া ছিলেন। ললিতমোহনের সুখের দশায় মাঝে মাঝে কমলাচরণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু আজ প্রায় সাত আট বৎসর যাবৎ কেহ কাহারও কোনও খোঁজখবর রাখেন

নাই! তাহারও একটু কারণ ছিল। কমলাচরণ দিনকতক মনের সাধে খুব "কাপ্তেনি" করিয়া, কি জানি কাহার পরামর্শে কলিকাতা সহরে একটী পাব্লিক থিয়েটার খুলিয়া বসিলেন। প্রথম দুই তিন বৎসর বিস্তর লোকসান দিয়া বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া অনেক প্রকারে দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া কমলাচরণের থিয়েটারে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতেছে! দেশে বিদেশ তাঁহার খুব নামডাক হইয়াছে! কমলাচরণ নিজে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং থিয়েটার চালাইয়া কি ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, সেরূপ কলকৌশল খুব ভাল রকম শিখিয়াছিলেন। যাহা হৌক্,—কমলাচরণের অদৃষ্ট খুবই ভাল; কারণ "কাপ্তেনি" চাল সমান ভাবে বজায় রাখিয়া কমলাচরণ আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। থিয়েটারের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার অগোচরে লোকে হয়তো তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু দু-একখানা ফ্রি-পাশের লোভে সম্মুখে আসিয়া অনেক ভদ্রলোক তাঁহার স্তুতিবাদও করে। সমস্ত দিবারাত্রি থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, সমাজে বা সংসারে কমলাচরণের গতিবিধি বা সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। ললিতমোহনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং কমলাচরণ ও ললিতমোহনের বহুকালাবধি দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই।

এই সময়ে দৈবাৎ একদিন ট্রামে ললিতমোহনের সহিত কমলাচরণের সাক্ষাৎ হইল। চিন্তাভারক্লিষ্ট বিশুষ্কবদন ললিতমোহন সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রমের পর অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কমলাচরণকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হে কমল বাবু? চিন্‌তে পার?" কমলাচরণ ললিতমোহনের এককালের সেই সুন্দরকান্তি এক্ষণে এরূপ বিকৃত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন. "আরে—কেও? ললিতমোহন যে? তোমার এমন চেহারা ক'দ্দিন হ'য়েছে? অসুখ বিসুখ ক'রেছে না কি? এতকাল কোথায় ছিলে? তোমাকে দেখ্‌তেই পাই না! আর কোন খবরও নাওনা, খবরও দাওনা। থিয়েটার করি, উচ্ছন্ন যাই, ব'খেই যাই, ছেলেবেলাকার বন্ধু তো বটে-" ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্টসম্ভাষণে ললিতমোহনের চিন্তাদগ্ধ হৃদয়ে কতকটা শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। ললিতমোহন বলিলেন, "আমার কথা আর ক'য়ো না দাদা! আমি না থাকারই সামিল! কোনরকমে বেঁচে আছি মাত্র! আজ তোমার দেখা পেলুম, ভালই হ'ল! একটা বিশেষ দরকার আছে,—কোথায় একবার নিরিবিলী তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই বল দেখি? আমার ভাই বড়ই বিপদ!" কমলাচরণ বলিলেন, "কোথায় কখন্ নিরিবিলী আমার সঙ্গে দেখা হবে, এ কথা তোমাকে এখন বলা বড়ই দুষ্কর! তা' এতকাল পরে আজ যখন দেখা সাক্ষাৎ

হ'য়েছে,—চলনা তোমার বাড়ীতেই যাই ; সেইখানেই দু-দণ্ড ব'সে তোমার বিপদের কথাটা শুনেই আসি। আমি আর তোমাকে বিপদে কি উদ্ধার ক'র্ব্ব বল, তবে দেখি যদি সাধ্য হয়—তা' হ'লে একটু চেষ্টাও তো ক'র্ত্তে পারি !" ললিতমোহন সংসারে নানারকম চরিত্রের লোক দেখিয়াছেন, অনেকের মুখে অনেক রকমের আত্মীয়তার কথা শুনিয়াছেন ; সুতরাং কথাবার্ত্তা শুনিয়া চালচলন দেখিয়া তিনি লোকজনকে বড় শীঘ্রই চিনিতে পারিতেন। কমলাচরণের কথা শুনিয়া এবং ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, "কমল যাহাই হৌক্, সাদাসিধে লোক বটে !" যাহা হউক্—ট্রামে বসিয়া আর অধিক কথাবার্ত্তা না কহিয়া কমলাচরণকে লইয়া ললিতমোহন গোয়াবাগানে আপন বাসাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! কমলাচরণ সেই ক্ষুদ্র বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি কিনেছ, না—ভাড়া দিয়ে বাস কর ?" একটু মৃদু হাসিয়া ললিতমোহন বলিলেন, "মাসে মাসে ১৪৲ টাকা ভাড়াই যোগাতে পারি না, তা আবার বাড়ী কিন্‌ব ?"

বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া নানাপ্রকার সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। ললিতমোহন কমলাচরণকে কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা অকপটে জানাইয়া বলিলেন, "জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তুমি তো এখন দু'দশ টাকা উপায় করিতেছ ! তুমি যদি আমাকে এই বিপদে অন্ততঃ পাঁচশত টাকা কর্জ্জ দাও, কিম্বা তোমার পরিচিত

কাহারও নিকট কর্জ্জ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে এ যাত্রা আমার জাত-কুল-মান সমস্ত রক্ষা হয়! নচেৎ আমার অবস্থা তো বুঝিতেই পারিতেছ,—হয়ত আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে!"

বাল্যবন্ধুকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে হৃদয়বিদারক মর্ম্মভেদী দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সমাজঘৃণ্য নট-ব্যবসায়ী কমলাচরণের চক্ষে যথার্থই জল আসিল। তিনি বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি এমন বুদ্ধিমান হ'য়ে বিপদে এত অধৈর্য্য হও কেন? আমি কতদিন তোমার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বিপদে পড়েছি,—কতবার কত দায়ে ঠেকেছি,—এমন কি দেনার দায়ে জেলে পর্য্যন্ত যেতে বসেছিলেম; কিন্তু তোমার বাপমার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ থেকেই উদ্ধার পেয়েছি! কিসে জান? সে কেবল একমাত্র জগদীশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করেছিলাম—এই জন্য! মানুষে কেহ কাহারও কিছু করিতে পারেনা, আমি জীবনে এই একটা কথা ধ্রুব বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছি। এই অবস্থায় প্রাণ খুলে তুমি যদি ভগবানকে ডাকৃতে পার, তা'হ'লে কি তোমার এ বিপদ থাকৃবে? যাহা হউক্—আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি, আগামী সোমবারে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাব!"

ললিতমোহন যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"সত্যি ব'লছ ভাই? তুমি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে?"

কমলাচরণ বলিলেন,"তুমি কি আমায় অবিশ্বাস ক'চ্ছ ? ভাই ! আমি সমাজের গণ্য মান্য বরেণ্য লোক নই, অথবা ধনবান জমীদারও নই যে, কোনরূপ সুনামের প্রত্যাশায় চাঁদার খাতায় মস্ত একটা সহি করিয়া যাইব ; তা'র পর টাকা দিই আর না দিই, চারিদিকে দাতাকর্ণ নাম বাজিয়া উঠিবে,—ক্রমে গবর্ণমেণ্টের কাণে উঠলে ভবিষ্যতে "রায় বাহাদুর" খেতাব পাইব ! জানতো ভাই—আমাদের মতন লোকের সে সবের প্রত্যাশা কিছুই নাই ! তবে অনর্থক কেন তোমার এমন দুঃসময়ে একটা অসম্ভব আশা দিয়ে তোমার কাছে মিছে বড়াই ক'রে বাহাদুরী নিয়ে স'রে প'ড়ব ? সত্যমিথ্যা প্রমাণ হতে বেশী দিন তো লাগবে না !—বড় জোর চার পাঁচ দিন মাত্র বাকি ! একবার না হয় পরীক্ষা ক'রেই দেখলে !"

জলমগ্ন ব্যক্তি অতি তুচ্ছ তৃণখণ্ডকেও প্রাণের দায়ে অবলম্বন করিতে যায় ! সুতরাং কমলাচরণের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ললিতমোহন একটা অতি ক্ষীণ আশালতা ধরিয়া রহিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মীকে এই কথা জানাইলে, তিনি স্বামীকে বলিলেন —"তুমিও যেমন পাগল ! ও একটা মাতাল,—থিয়েটারে দিন রাত্রি বেশ্যা নিয়ে প'ড়ে থাকে ! ও এসে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাবে ? পোড়া কপাল ! তুমিও কি শেষে খেপলে নাকি ? ও সব বাজে আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য চেষ্টা কর !

মঙ্গলবারে তো পাকা দেখ্‌তে আস্‌ছে—তা'র কি যোগাড় ক'ল্লে বল দিকি ?" পত্নীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ললিতমোহন আবার ভীষণ নৈরাশ্যসাগরে ডুবিলেন। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখিতে পাইলেন না! অগত্যা সোমবার পর্য্যন্ত কি হয় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে সোমবার আসিল। ললিতমোহনের অদৃষ্টে ভালমন্দ যাহা হউক্ আজ একটা রকম কিছু নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। সমস্ত দিবস উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়া বৈকালে একটু সকাল সকাল অফিস হইতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঝীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও বাবু তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলেন কি না! শুনিলেন, কেহই আসেন নাই! তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ—তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না! ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল,—তবু কাহারও দেখা নাই! ললিতমোহন যথার্থই এইবার হতাশ হইয়া পড়িলেন; পত্নীকে বলিলেন, "তুমি যা' ব'লেছ—তাই ফ'লে গেল দেখ্‌ছ! কমল বোধ হয় আমার কথা একেবারে ভুলে গেছে!" রাজলক্ষ্মী এইবার বড়ই রাগ করিলেন; বলিলেন, "তুমি এখনও সেই হতভাগাটার আশায় ব'সে আছ? কাল রাত পোহালেই মেয়েকে পাকা দেখ্‌তে আস্‌বে,—এখনও তা'র কোনও রকম যোগাড়যন্ত্র ক'ল্লে না! এই নাও আমার বালা দু'গাছা—রাত্রেই বেচে—"

এমন সময় সদর দরজায় কে কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "ললিত বাবু—বাড়ী আছেন ?"

কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই ললিতমোহন একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের মতন ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে কমলাচরণ ! দেখিবামাত্র ললিতমোহন একেবারে তাঁহাকে বাহু-পাশে বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"এলে ভাই কমল ! আঃ বাঁচলুম !" কমলাচরণ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ক্ষমা কর ভাই, বিশেষ একটু কাজের জন্য দেরী হয়ে গেছে !" এই বলিয়া উভয়ে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। ললিতমোহন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কমলাচরণ বলিলেন,—"এই নাও আটশো টাকা ! একটা "সাহায্য-রজনী" অভিনয় ক'রেছিলুম,—তোমার অদৃষ্টে এর বেশী আর হ'লনা,—কি কর্ব্ব ভাই ! কিছুদিন আগে হ'লে দু' পাঁচজনকে আরও জোর ক'রে দু'দশখানা টিকিট বেচ্‌তে পার্ত্তুম,—তা'তো আর হ'লোনা ! এতেই কোন রকমে চালিয়ে নিও ভাই !"

ললিতমোহন আনন্দ ও বিস্ময়ের আধিক্যে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে অকস্মাৎ কমলাচরণের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"কমল ! সত্য সত্যই তুমি আমার পিতারও অধিক !"

কমলাচরণের কৃপায় সুরবালার বিবাহকার্য্য কোনরকমে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ললিতমোহন কন্যাকে আন্দাজ বারশত

টাকার গহনা দিয়া গা সাজাইয়া শ্বশুরালয়ে বিদায় দিলেন। বিবাহের খরচ ইত্যাদিতে প্রায় পাঁচশত টাকার উপর ব্যয় হইল। হতভাগ্য ললিতমোহনের বাজারদেনা প্রায় চারিশত টাকার অধিক হইল। যাহা হউক,—ঈশ্বরেচ্ছায় এ যাত্রা কোনমতে তিনি জ্ঞাতিকুল রক্ষা করিতে পারিলেন।

সুরবালার তো বিবাহ হইয়া গেল,—কিন্তু সুশৃঙ্খলে কি বিশৃঙ্খলে—সে বিষয় একটু বিচার্য্য বটে! বড়লোক রামহরি বাবু খুব ধূমধাম করিয়া—বাজনাবাদ্য করিয়া বর লইয়া আসিলেন; কিন্তু বড়লোক বরযাত্রদিগের তেমন ভাল করিয়া খাতিরযত্ন হইল না। প্রথমতঃ,—তাঁহাদের বসাইবার উপযুক্ত স্থান ললিতমোহন নিজের ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কোথায় পাইবেন? সুতরাং অনেকেই না খাইয়া চলিয়া গেলেন। এই প্রধান কারণে রামহরি বাবু ললিত-মোহনের উপর একটু বিশেষ রকম চটিলেন। তাহার পর,—সম্প্রদানের সময়—বরাভরণ এবং কন্যার গা-সাজানো গহনার শ্রী দেখিয়া মিত্রজা যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বৈবাহিককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ রকম ধাষ্টামো কর্ব্বার কি আবশ্যক ছিল? ব'ল্লেই তো হ'ত—গহনাগাঁটী কিছুই দিতে পার্ব্বনা! আমি কুলি হাতে দিয়ে চুপি চুপি পাল্‌কী ক'রে বৌ নিয়ে যেতুম!" মিত্র মহাশয়ের একজন পারিষদ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আমিতো আপনাকে বরাবরই

ব'লেছি যে, আপনার ছেলের বিবাহের জন্য বড় মানুষের ঘরের অভাব কি? আপনার মতন লোকের উচিৎ কি—এত খরচপত্র ক'রে এখানে ছেলের বিয়ে দিতে এসে পাঁচজনের সামনে অপদস্থ হওয়া?" কথাবার্ত্তা এই ভাবেই চলিতে লাগিল; কন্যাপক্ষীয়গণ অপরাধীর মতন চুপ করিয়া সে সমস্ত কথা শুনিয়া গেলেন। কেহ কোন উত্তর করিতে ভরসা করিলেন না! কেবল পাড়ার একজন বখা ছোকরা, রামহরি বাবুকে শুনাইয়া তাহার একজন সমবয়স্ক বন্ধুকে বলিয়া উঠিল,—"লালচাঁদ! রামা হাড়ী আজকাল পাঁটা খুব চড়া দরে বেচ্ছে,—না হে?" লালচাঁদ কি উত্তর করিতে যাইতেছিল,—কন্যাপক্ষীয় জনৈক ভদ্রলোকের চোখরাঙ্গানীতে থামিয়া গেল!

এইতো গেল বিবাহরাত্রের ব্যাপার! পরদিন যখন বর-ক'নে বিদায় করিবার উদ্যোগ হইতেছিল,—কমলাচরণ ঠিক সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এইখানে বলিয়া রাখি, রামহরি বাবুর সহিত কমলাচরণের অনেক দিনের আলাপ! কমলাচরণ যখন-তখন রামহরি বাবু এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখাইয়া – তাঁহার নিকট খুব খাতির অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কমলাচরণ রামহরি বাবুকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন। রামহরি বাবু আজ অকস্মাৎ বৈবাহিক ললিতমোহনের বাটীতে কমলাচরণকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—,

"একি? কমল বাবু! তুমি হঠাৎ এখানে যে?"

কমল। "আজ্ঞে—আমার তো সমস্তক্ষণই এখানে থাক্‌বার কথা! ললিত আর আমি—এক মায়ের পেটে না জন্মালেও—আমরা দু'জন সহোদরের অধিক! কাল রাত্রে অন্য একস্থানে আমাদের থিয়েটারের বায়না ছিল.—তাই বিয়ের সময় থাক্‌তে পারিনি!"

রামহরি বাবু একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বটে—বটে! বেহাইয়ের সঙ্গে তোমার এমন ঘনিষ্ঠতা—তা জানিনে! তা বেশ—বেশ!"

কমলাচরণ পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা লোকপরম্পরায় কতকটা শুনিয়াছিলেন এবং রামহরি বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া কতকটা অনুমানও করিয়া লইলেন.—"বরকর্ত্তা ছেলের বিয়ে দিয়ে বড় খুসী নন!" তিনি বরক'নে বিদায়ের সময় রামহরি বাবুকে একটু আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,— "মিত্র মশাই! দেশে আপনার মতন দু' দশ জন উদারহৃদয় লোক হ'লে মেয়ের বিয়ে এত দায় ব'লে গৃহস্থ লোকের মনে হ'তনা! আপনি যেরূপ মহত্ব দেখিয়ে—এক রকম বিনা অর্থে ললিতের মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে গেলেন,—দেশের লোক সকলেই আপনাকে ধন্য ধন্য ক'র্ব্বে! কি আর ব'ল্‌ব মশাই,—ভগবান আপনার আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন! দেখুন—এই (Non-Co-Operation) নন্‌-কো-অপারেশনের জন্যে এ দেশের লোক যেমন উঠে প'ড়ে লেগেছে,—এই সঙ্গে যদি এবার কংগ্রেসে

এই পুত্রকন্যাবিবাহে দানপণ আদানপ্রদানসম্বন্ধে একটা কড়া রকমের ব্যবস্থা করা হ'ত—তা'হ'লে বাঙ্গালীজাতি একটা মহা সর্ব্বনেশে দায় থেকে নিষ্কৃতি পেত! এমন একটা কিছু আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে নিয়ম করা দরকার,—যা'তে পুত্রের বিবাহে কন্যা-কর্ত্তার কাছ থেকে যিনি টাকা নেবেন;—কিম্বা কন্যার বিবাহে বরকর্ত্তাকে যিনি টাকা দেবেন,—তাঁ'রা উভয়েই দেশের লোকেদের কাছ থেকে রীতিমত শিক্ষা পান! অর্থাৎ তাঁ'রা সমাজে একঘরে তো হবেনই—উপরন্তু তাঁদের পথেঘাটে বেরুনো পর্য্যন্ত বন্ধ হয়,—তা' হাততালির ভয়ে হোক্—বা অপমানের ভয়েই হোক্! বাঙ্গালীসমাজের এ দোষটা না দূর হ'লে—কিছুতেই বাঙ্গালীর দুঃখ ঘুচ্‌বেনা, কিছুতেই বাঙ্গালীজাতির উন্নতি হবেনা! আর এ দোষ দেখ্‌ছি শুধু বক্তৃতায়—শুধু বাক্যাড়ম্বরে—শুধু উপদেশে যা'বার নয়! খুব একটা কড়ারকমের কিছু করা চাই! জগতে কার্য্যসাধনের নিয়ম হ'চ্ছে এই,—প্রথমে অনুরোধ ক'রে ভাল কথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'ল্‌তে হবে,—তা'রপর হাতে পায়ে ধ'রতে হবে,—তা'রপর যত রকম সদুপায় আছে অবলম্বন ক'র্ত্তে হবে,—তা'রপর আপনার মতন দু'দশজন বড়লোক লোকের দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে;—এতেও যখন কার্য্যসিদ্ধি না হবে,—তখন অগত্যা একটা সামাজিক কঠোরতা অবলম্বন করা দরকার”—বলিয়া কমলাচরণ নিজেই একচোট খুব হাসিয়া লইলেন। রামহরি বাবু

কমলার এ সমস্ত কথায় কোন উত্তর করিলেন না,—"বৌ-বেটা" লইয়া মুখটী ভার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাঠক! ইহার পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীর অর্থাৎ রামহরি বাবুর পত্নীর নিকট হইতে"ক'নে"(সুরবালা)কিরূপ লাঞ্ছনা পাইয়াছিল,—তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমরা অক্ষম। সংসাররহস্যানভিজ্ঞা বালিকা গা-সাজানো গহনা লইয়া গিয়া যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিল,—বোধ হয় নরকযন্ত্রণা তাহার অপেক্ষা ভীষণ নয়। হতভাগ্য ললিতমোহন তো কন্যার শ্বশুরালয়ে "জোচ্চোর—ঠগ্—বাটপাড়্ দাগাবাজ" ইত্যাদি নানারূপ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। আর "ক'নের মা"? তাঁহার নাম তো "সর্ব্বনাশী,—শতেকখোয়ারী—ভাতারপুতের মাথাখাগী, ডাইনি—রাক্ষসী!" লাঞ্ছনাগঞ্জনা সুরবালার অঙ্গের ভূষণ হইল,—তাহার উপর আবার হতভাগিনী শ্বশুরালয়ে আধপেটা খাইতে পায়,—কোনও দিন বা অনাহারে দিনরাত্রি যাপন করে। "কনের-মা" মেয়েকে দেখিতে লোক পাঠাইলে—বেহাইন্ ঠাকুরাণীর আদেশে তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ।

ললিতমোহন এবং রাজলক্ষ্মী সমস্ত কথা শুনিলেন এবং দু'জনের চক্ষের জলে দু'জনে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন! এখন জাতিকুল রক্ষা হইয়াছে বটে—কিন্তু কন্যার প্রাণরক্ষা করাও তো পিতামাতার মহাকর্ত্তব্য! অনেক সাধ্যসাধনার পর রাম

বাবু সুরবালাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। বেহাইন্ ঠাকুরাণী ঝিকে বলিয়া দিলেন.—"সর্ব্বনাশী ক'নের মাকে বোলো,—এমন চুলোমুখী বৌকে আমি আর এ ভিটেতে ঢুক্‌তে দোবোনা। আমি রমেনের আবার বিয়ে দোবো।"

রামহরি বাবুর পুত্র রমেন—আধুনিক কালেজ্ ষ্টুডেণ্ট্ হইলেও একটু যেন সেকেলে ধরণের! শান্ত-ধীর-নম্র,—আজকালের চস্‌মা-ধারী কড়া-মেজাজী ইয়ং বেঙ্গলের ন্যায় স্ত্রীর কজ্ (cause) লইয়া—ওল্‌ড্ ফুল্ পিতামাতার বিরুদ্ধে সিভিল্ ওয়ার্ ঘোষণা করিতে পারিল না! ফুলশয্যার রাত্রে তাহার পত্নীর সহিত প্রথম ও শেষ আলাপ হইয়াছিল; মাতার কঠোর আদেশে বেচারা তাহার পর আর একদিনের জন্যও স্ত্রীর দর্শন পায় নাই। সুরবালা বুঝিয়াছিল, অদৃষ্টে বুঝি স্বামীসন্দর্শনসুখলাভও নাই! এইরূপেই দিন যায়। রামহরি বাবু প্রায় বৎসরাবধি পুত্রবধূর কোনও তত্ত্ব লন নাই। ললিতমোহনও জোর করিয়া কন্যাকে শ্বশুরবাটী পাঠাইতে সাহস করিলেন না। নিজে গিয়া বৈবাহিকের কত খোসামোদ করিয়াছেন,—রাজলক্ষ্মীকে দিয়া বেহাইন ঠাকুরাণীকে মিনতি করিয়া কত পত্র লিখিয়াছেন—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। রামহরিবাবু বলেন,—"এত তাড়াতাড়ি কেন? বৌমা এখন বাপের বাড়ী থাকুন না। রমেনের এখন লেখাপড়ার সময়,—এসময় "বৌমা" কাছে থাকিলে—পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিবার

বিশেষ সম্ভাবনা!" আর বেহাইন ঠাকুরাণী "কনের-মার" পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আঁস্তাকুড়ে কুঁচি-কুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। ক্রমে লোকপরম্পরায় ললিতমোহন শুনিতে পাইলেন, রামহরি বাবু পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী আহারনিদ্রা ত্যাগ কবিয়া দিবারাত্রি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আর অভাগিনী সুরবালা! সে হাসেও না —কাঁদেও না—ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথাও কহে না,— ভাতে নাম মাত্র বসে! সে যেন সূর্য্যকরঝলসিত কোমল কলিকার ন্যায় দিন দিন শুকাইতে লাগিল। হায় বঙ্গসমাজ!

একদিন কমলাচরণ আসিয়া ললিতমোহনকে বলিলেন,— "আজ তোমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলের থিয়েটার দেখিবার নিমন্ত্রণ রহিল;—অতি অবশ্যই যাইতে হইবে!" ললিতমোহন প্রথমে অস্বীকার করিলেন,—কিন্তু কমলাচরণের সহিত গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া সকলে থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী সুরবালাকে খুব যত্নপূর্ব্বক বেশভূষা পরাইলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর পুত্রকন্যাগণকে লইয়া স্বামীর সহিত থিয়েটার দেখিতে গমন করিলেন। সে দিন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বলিদান" নাটকের অভিনয় হইতেছিল। রাজলক্ষ্মী স্ত্রীলোকদিগের বসিবার

স্থানে গিয়া অবগুণ্ঠনবতী কন্যাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছাখ্ দিকি সুরি—এর মধ্যে তোর শ্বাশুড়ী কোন্‌খানে ব'সে আছেন ?" শ্বাশুড়ীর নাম শুনিবামাত্র সুরবালার গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। কিন্তু মাতার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—একধারে তাহার শ্বাশুড়ী, ননদ, জা—প্রভৃতি সকলে বসিয়া তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতেছেন। রাজলক্ষ্মী অবগুণ্ঠন-বতী সুরবালাকে লইয়া ধীরে ধীরে তথায় গিয়া—একেবারে ঠিক বেহাইনের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সুরবালার মুখ কেহ দেখিতে পাইল না,—সুতরাং রামহরি বাবুর বাটীর কোন স্ত্রীলোক রাজলক্ষ্মীকে অথবা সুরবালাকে চিনিতে পারিল না।

"বলিদানে" একটী দৃশ্যে—মোহিতের মাতা মাতঙ্গিনী—তাহার পুত্রবধূকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতেছে—এমন কি কথায় কথায় মুষ্ট্যাঘাত পর্য্যন্ত করিতেছে! দর্শকমণ্ডলী এই দৃশ্যে বালিকার দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং "মাতঙ্গিনী"কে অজস্র গালিবর্ষণ ও নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। রামহরি বাবুর পার্শ্ববর্ত্তিনী কোন আত্মীয়াকে বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ—শ্বাশুড়ী মাগীটা কি সয়তান! মেয়েটাকে বিনাদোষে এমন কষ্ট দিচ্ছে গা?"

ঠিক পার্শ্বে রাজলক্ষ্মী বসিয়াছিলেন,—তিনি সময় পাইয়া বেহাইন্‌কে বলিলেন,—"আহা—দিদি! কত পাপ ক'ল্লে তবে মেয়ের

মা হয়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েরও যন্ত্রণা,—মেয়ের মা'রও নাকালের একশেষ!" অপরিচিতা রমণীর কথা শুনিয়া—রমেনের মাতা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন : সে সময় কন্‌সার্ট বাজিতেছিল;—সুতরাং উভয়ে আলাপপরিচয় করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলেন। তিনি রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন,—"আজকালের কথা আর বোলোনা বোন্! আমার ছোট মেয়ের শাশুড়ীটা ঠিক এই রকম বৌ-কাঁট্‌কী! কচি মেয়েটাকে আমার যে যন্ত্রণা দেয়,—তা' আর তোমায় কি বোল্‌বো?"

রাজলক্ষ্মী। "তবে থিয়েটারে যা' সব দেখায়—কিছুইতো তার মিথ্যে নয় দিদি! কিন্তু এতেও তো লোকের চোখ ফোটে না?"

মিত্রগৃহিণী। "যা ব'ল্লে বোন্—এততেও পোড়া লোকের চোখ ফোটে না! আহা! মেয়েটার দুর্দ্দশা দেখে আমার প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে ভাই! কি পোড়া থিয়েটার দেখাতে কমল বাবু এত খোসামোদ ক'রে আমাদের নিয়ে এল গা? এ যে কেবল কেঁদে কেঁদেই ম'চ্ছি!"

রাজলক্ষ্মী। "আহা—কাঁদবারই তো কথা দিদি! বিনা দোষে একটা দুধের মেয়ের এমন যন্ত্রণা দেখে—কোন স্ত্রীলোকের প্রাণ না কেঁদে থাক্‌তে পারে? তা' দিদি! এমন মায়ার শরীর তোমার,—আর আমার দুঃখিনী মেয়ে স্বামীসুখে বঞ্চিতা?"

মিত্রগৃহিণী কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—"কি বোল্‌ছো

বোন ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা ! এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে কথা কইছি,—এখনও পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় নেওয়া হয়নি !”

রাজলক্ষ্মী তখন উন্মাদিনীর ন্যায় সুরবালাকে টানিয়া আনিয়া মিত্রগৃহিণীর দুটী পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“দিদি ! আমি তোমার সেই সর্ব্বনাশী—রাক্ষসী “কনের—মা’ ! আমি তোমার শ্রীচরণাশ্রিতা দাসী ! আমি আজ থিয়েটার দেখ্‌তে—আমোদ ক’র্ত্তে আসিনি,—তোমার জিনিষ তোমারি পায়ে সমর্পণ ক’র্ত্তে এসেছি ! এই নাও দিদি—আমার জনমদুঃখিনী মেয়েকে শ্রীচরণে স্থান দাও—পোড়ারমুখী “কনের-মাকে” ক্ষমা কর” !

* * * * * *

কমলাচরণের কৌশলে সুরবালা সেই রাত্রি হইতেই মহা-সমাদরে শ্বশুরালয়ে স্থান পাইল ।

———

গেঁটে নন্দা

নন্দরাম মুখোপাধ্যায়কে সকলে "গেঁটে নন্দা" বলিয়াই জানিত। ভাল নাম বলিলে তাহাকে কেহ চিনিতে পারিত না। বামনাকৃতি— স্থূলকায় নন্দরাম,—দৈর্ঘ্যে বড় বৃদ্ধি পায় নাই,—বরং আড়েই বাড়িতেছিল। লোকে বলিত—"একে বেঁটে—তায় ষণ্ডা, নন্দার গেঁটে গেঁটে বুদ্ধ—পেটে পেটে নষ্টামি!" যাহা হউক্—নন্দরাম সহরের একজন অতি তুখোড় লোক। সমবয়সীরা "নন্দা" বলিত, প্রাচীন লোকেরা "গেঁটে" বলিত, যাহারা খাতির করিত বা ভয় করিত—তাহারা তাহার সম্মুখে বলিত "মুখুয্যে মশাই",—আড়ালে বলিত—"গেঁটে নন্দা!"

নন্দরামের পৈতৃক বাসস্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক পল্লীগ্রামে। তাহার পিতামহ সহরে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন,—সেই অবধি তাহাদের কলিকাতায় বাস। মাঝে মাঝে—কিম্বা আবশ্যক হইলে দেশে যাইত। সেকালে কলিকাতার জমীর দর এত মহার্ঘ ছিল না,—নন্দরামের পিতামহ চেষ্টাচরিত করিয়া একখানি মাঝারি রকমের বসতবাটী প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন।

সহরের সুবিখ্যাত মিত্রবংশ নন্দরামের পৈতৃক আশ্রয়দাতা—অন্নদাতা। মিত্রবংশের কর্ত্তারা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া কোন একটী বড় সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া আসিতেছিলেন। নন্দরামের পিতামহ মিত্রবংশে বাজারসরকার হইয়া প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে বাবুকে খোসামোদ করিয়া অফিসে Bill-Collecting সরকারের পদ পান। সেই অবধি মিত্রবংশধরগণের মুৎসুদ্দিগিরিলাভের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরামের পৈতৃক সরকারিপদও লাভ হইল।

শৈশবকাল হইতেই নন্দরামের দেহের শক্তি,—বুদ্ধিচাতুর্য্য—কথাবার্ত্তা খুব প্রশংসনীয়। দাঙ্গাহাঙ্গামে নন্দ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া লাঠি চালায়; কেহ কোনও বিপদে পড়িলে নন্দের বুদ্ধিকৌশল ভিন্ন উদ্ধার হয়না ; মজলিসে নন্দ এমন রগড়ের কথা কহিত যে হাসিয়া হাসিয়া লোকের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত। লেখাপড়ার দৌড় ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত! নন্দ কখনো বই কিনিয়া পড়ে নাই। এর-তার কাছে চাহিয়া যতদূর হইত—তাহাতেই চালাইত। বই কিনিবার কথা শিক্ষক উত্থাপন করিলে বলিত,—"গরীব মানুষ কোথায় পয়সা পাব? আপনি একখানা কিনে দিন্‌না! আমি তো আপনার ছেলের মতন!" শিক্ষকও আর কিছু বলিতেন না। নন্দরাম ক্লাসে বড় গোলমাল করিত;—একদিন শিক্ষক মহাশয়ের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল,—তিনি নন্দরামের মাথা দেওয়ালে

ঠুকিয়া দিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পর পথে সেই হতভাগ্য শিক্ষকটীকে ধরিয়া নন্দরাম তাঁহার ছুটী কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিল! সেই অবধি নন্দরামের লেখাপড়া ত্যাগ। নন্দরাম বলিল,—"দূর হৌক্ ঘোড়ার ডিমের বই পড়া! আমাদের তিনপুরুষের সরকারি বজায় থাক্!"

"গেঁটে নন্দার" দৌরাত্ম্যে সকলেই অস্থির। পাড়ায় একটী পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী ছিল। নন্দরামপ্রমুখ যত বদ্ছেলের আড্ডা সেই বাড়ীতে। সন্ধ্যার পর কুল্পি-বরফওয়ালা—চানাচুর-ওয়ালা ইত্যাদি ডাকিয়া সকলে মিলিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া পশ্চাদ্দিকের পাঁচীল টপ্‌কাইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িত। বেচারীরা ডাকিয়া হাঁকিয়া অস্থির,—পরে জুয়াচুরী বুঝিতে পারিয়া তাহারা গোলমাল করিত,—পাড়ার লোকজন জড় করিত। শেষে কোন উপায় না করিতে পারিয়া চৌদ্দপুরুষান্ত করিয়া চলিয়া যাইত। পাড়ার লোকে কেহ কোন কথা বলিত না,—কারণ—"গেঁটে নন্দার" সঙ্গে লাগা বড় সোজা কথা নয়।

নন্দরাম তাহার খুল্লতাত-পুত্র হরেকৃষ্ণের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে দেশে গমন করিতেছিল। ষ্টেশন হইতে নামিয়া প্রায় চারিক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া তবে বাড়ী পৌছিতে হয়। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে দুই ভায়ে বিশ্রাম করিতে বসিল। এমন সময় একজন গোয়ালা একভার টাট্‌কা

ছানা আনিয়া তথায় উপস্থিত হইল। নন্দরাম তামাকু সেবন করিতেছিল,—কলিকাটী লইয়া বলিল—'বড় ছেরোম হ'য়েছে —একবার তামাক ইচ্ছে কর!" ঘোষের পো যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। নন্দরাম অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়া—একটু ন্যাকাহাবা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "তোমার ঝুড়িতে কি বাপু? চূণ নাকি?" গোয়ালা বলিল,— "না—না—চূণ নয়—টাটকা ছানা। ক'ল্‌কেতায় চালান দিতে নিয়ে যাচ্ছি!"

নন্দরাম যেন অবাক্ হইয়া বলিল,—"ছা—না? কি পাখীর ছানা? গাছ থেকে পেড়ে এনেছ?" গোয়ালা হাসিয়া বলিল,— "সেকি ঠাকুর? ছানা জাননা? দুধে তৈরি হয়! এই থেকে মোণ্ডা সন্দেশ রসগোল্লা তৈরি হয়! তুমি ছানা কখনো খাওনি—কখনো দেখনি?"

হরেকৃষ্ণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নন্দরাম তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গোয়ালাকে বলিল,—"এঁ্যা —ছানা এমন জিনিষ? আহা—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—এ সব জিনিষের স্বাদ কি ক'রে বুঝ্‌বো? আমরা নারকুল দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়—তাই বরাবর জানি,—তাই বরাবর খেয়ে থাকি! আহা! ছা—না! পাখীর নয়—জানোয়ারের নয়—একেবারে দুধের! আহা—না জানি—কি রকমই বা খেতে লাগে!"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া গোয়ালার মনে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইল। ঝুড়ী হইতে খানিকটা ছানা লইয়া নন্দরামকে দিয়া বলিল,—"এই নাও ঠাকুর,—খানিকটা সেবা কর!" একগাল দেঁতো হাসি হাসিয়া বাহুবিস্তার পূর্ব্বক আগ্রহে ছানা লইয়া নন্দ বলিল,—"আহা—বেঁচে থাক—বেঁচে থাক! তোমার গয়লাবংশের শ্রীবৃদ্ধি হোক্! একটু ছা-না খেয়ে দেখি!" এই বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই সমস্ত ছানাটা গলাধঃকরণ করিল। ছানা খাওয়া শেষ হইবামাত্রই নন্দরাম চোখ কপালে তুলিয়া—মুখ বিকৃত করিয়া—হাত পা ছুঁড়িয়া—মাটীতে পড়িয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিল,—"হরা! গলা কাটু—গলা কাটু! ওরে—কি জিনিষ খাওয়ালে রে—" হরেকৃষ্ণ নন্দরামকে বিলক্ষণ চিনিত,—হাজার হোক্—ভাইতো বটে! দাদার মতলব তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া একেবারে গোয়ালার উপর ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া—তাহাকে উপর্য্যুপরি কিল চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"ওরে ব্যাটা—কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লি? কি বিষ এনে খাওয়ালি? ব্রহ্মহত্যা ক'ল্লি? আমার দাদা যে সিঁটকে প'ড়ল! দাদা যে আর নড়ে না রে শালা গয়লা! চল্—তোকে ফাঁসি দোবো!" ঘোষের পো প্রথমটা যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল! কিন্তু নন্দরামের অকস্মাৎ এই রকম দশাপ্রাপ্তি দেখিয়া ভাবিল,—"হয়তো ছানাতে কোনরকম বিষাক্ত সাপে মুখ দিয়ে—সমস্ত ছানাটা বিষাক্ত ক'রেছে,—বামুন

তাই খেয়ে একেবারে সন্ত সন্ত মারা পড়্‌ল!" যেমন এই কথা ভাবা—আর অম্‌নি ছানার বোঝা ফেলিয়া গোয়ালানন্দন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়—দৌড়! হরেকৃষ্ণ "ধর্‌—ধর্‌—খুনে ধর্‌" বলিয়া খানিকদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল;—যখন দেখিল সে একেবারে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে—তখন হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দরামকে বলিল,—"দাদা—এইবার ওঠো!"

নন্দ হাসিমুখে উঠিয়া বলিল,—"এইবেলা ছানার বোঝাটা নিয়ে সরে পড়ি চল্‌! দু'জনে ভাগাভাগী ক'রে গাম্‌ছায় বেঁধে নিয়ে যাই চল্‌—শিগ্‌গীর পৌঁছে যাব! ব্যাটাকে খুব ভাগানো গেছে কিন্তু!" এই বলিয়া দুই ভ্রাতায় পরামর্শমত ছানা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

মিত্রবংশের বাবুরা নন্দরামকে যেরূপ ভালবাসিত এবং যত্ন করিত,—আপনার গুণে নন্দরাম অফিসের সাহেবদিগেরও সেইরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। বিল্‌কলেক্‌টিং সরকারের কাজ, তাদৃশ লেখাপড়া জানিবার আবশ্যকও নাই,—নন্দরাম তো সাক্ষাৎ "মা স্বরস্বতী!" কোন রকমে ইংরাজি বাঙ্গালা হিন্দি মিশাইয়া সাহেবদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত। তাহার কথা শুনিয়া—হাতমুখ নাড়া দেখিয়া সাহেবেরাও পরম পরিতোষ লাভ করিত। একদিন ছোট সাহেবের ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একটী

গর্দ্দভ কিনিবার প্রয়োজন হয়। নন্দরামকে ছোটসাহেব নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব মেম ঘরে বসিয়া আছেন,—নন্দরাম লম্বা সেলাম ঠুকিয়া—Good Morning Father Mother বলিয়া গিয়া দাঁড়াইল! (নন্দরাম সাহেবদিগকে "ফাদার" এবং মেম দেখিলেই "মাদার" সম্বোধন করিত।) সাহেব ইংরাজিতে বলিলেন,—"আমাদের ছোট ছেলেটীর জন্য একটী ভাল দেখিয়া গর্দ্দভ কিনিয়া দিতে পারিবে?" নন্দরাম আপনার ইংরাজিতে বলিল,—"কেন পার্ব্বনা ফাদার? এখুনিই এনে দিচ্ছি!" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত টাকার দরকার?" নন্দ বলিল,—"অন্ততঃ শতাবধি টাকার নীচে একটা ভাল গাধা পাওয়া যায় না!" সাহেব তৎক্ষণাৎ এক শত টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"যত শীঘ্র পার আনিয়া দাও।" নন্দরাম—"বেশ" বলিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ফাদার!" কি রকম গাধা চাই?" সাহেব বলিলেন, "খুব ভাল।" নন্দরাম মহামুস্কিলে পড়িল; তাহার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে,—পুরুষ কিম্বা স্ত্রী চাই! কিন্তু ইংরাজিতে কি বলিতে হয় তাহা জানে না। অগত্যা বলিল,—"Father! you ass or memsahib ass? (তোমার মত গাধা কিম্বা মেমসাহেবের মতন গাধা)!" সাহেবমেম পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করিয়া চেয়ারে বসিয়া

হাসিয়া লুটোপুটী খাইবার উপক্রম। নন্দরাম একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ—মেমসাহেবের মতন গাধা!" নন্দরাম হুকুম বুঝিয়া লইয়া ২৫৲ টাকায় একটী ভাল স্ত্রীগর্দ্দভ কিনিয়া আনিয়া বলিল,—"২৭৷৴১৫ টাকায় কিনিয়াছি"—এই বলিয়া বক্রী ২৷৵৫ সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। সাহেব বলিলেন,—"বখ্‌শিস্ নিয়ে যাও।" নন্দরাম উঠিয়া পড়িয়া সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিল,—"তোমরাই ফাদার—তোমরাই মাদার! আমি গরীব, আমার এই দু'টাকা ছ' আনাই দু লক্ষ টাকা!"

অফিস হইতে চিফ্ জষ্টিসের বাড়ীতে প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে একটা জিনিষ অর্ডার মতন পাঠানো হইয়াছিল,—অদ্যাবধি তাহার বিলের টাকা আদায় হইতেছে না। অফিসের বড় সাহেব মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্—যাহার উপর এই বিল তাগাদার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার অপরাধ কি বলুন! আমি প্রত্যহই তাগাদা করিতে যাই, কিন্তু দরোয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে দেয়না।" বড় সাহেব নন্দকে সে কাজের ভার দিলেন। নন্দ তাহার পরদিন ঠিক বেলা একটার সময় চিফ্ জষ্টিসের বাড়ী গিয়া দ্বারবানকে তাড়াতাড়ি বলিল,—"শীগ্‌গির সাহেবকে খবর দাও—গ্ল্যাডষ্টোন্ সাহেব দেখা ক'র্ত্তে এসেছে।"

দ্বারবান বলিল,—"সাহেব নাই, কোর্টে গেছেন।" নন্দ বলিল—"মেমসাহেব তো আছেন, তাঁহাকে খবর দিলেও চলিবে যাও—যাও—দেরী কোরোনা—নইলে তোমার এখুনি চাক্‌রী যাবে।" দ্বারবান তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে খবর দিতে গেল। ইত্যবসরে নন্দ সেই ময়লা পোষাকে দ্বারবানের পশ্চাতে পশ্চাতে উপরতলায় নিঃশব্দে গিয়া উপস্থিত। মেমসাহেব দ্বিপ্রহর রৌদ্রে চারিদিক বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; দ্বারবানের নিকট শুনিলেন,—"গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব হাজির",—কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে যেমন ব্যাপার কি দেখিতে আসিলেন,- অমনি তৎক্ষণাৎ সেই অপূর্ব্ব চেহারা "গেঁটে নন্দা" বিলখানি লইয়া খুব মাথা নীচু করিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "Mr. Gladstone is understood Mother! I his Bill collecting Sircar! one Bill has Mother;—every day ten times come and ten times go—No money—No payment—six months gone." "অর্থাৎ" মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ আসেনি মাদার! আমি তাঁর বিলকালেক্‌টিং সরকার। একখানি বিল আছে মাদার,—রোজ দশ বার আসি—দশবার ফিরে যাই! আজ ছ মাস হ'ল—টাকা পাচ্ছি না—" বলিয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে জোড়হস্তে ভাল মানুষটার মতন দাঁড়াইয়া রহিল। মেমসাহেব মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলের টাকা তো সমস্ত

চুকাইয়া দিলেন, উপরন্তু নন্দরামকে ৫৲ টাকা বখসিস্ করিয়া বিদায় দিলেন। আফিসের বড় সাহেব নন্দরামের কাজে খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ দু টাকা বখ্সিসের হুকুম করিলেন।

সেবার নন্দরাম তাহার এক ভগ্নীপতিকে বড় জব্দ করিয়াছিল। ভগ্নীপতি এক অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক। যেদিন শ্বশুরবাড়ীতে আসিত, একবার বৈঠকখানায় না বসিয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীর ভিতরে সটান গিয়া উপস্থিত হইত। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা হয় তো মাথায় কাপড় খুলিয়া অন্যমনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, একেবারে জামাই হঠাৎ গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। নন্দরাম বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবকে লইয়া গল্পগুজব করিতেছে—এমন সময় জুতার শব্দ শুনিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে হে—কে যায়?" জামাইবাবু কথা না কহিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। তাহার পর নন্দ উঠিয়া খবর লইল—জামাইবাবু আসিয়াছেন। নন্দ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মাকে বলিল,—"এ কি রকম লোক? কথার উত্তর দিতে পারে না?" নন্দর মা বলিলেন, —"আহা ছেলেমানুষ—তায় মুখচোরা—কিছু বলিস্‌নি বাবা!" নন্দ মনে মনে স্থির করিল, "এক দিন ইহার ঔষধ দিতে হইবে!" এই বলিয়া ওৎ করিয়া এক দিন বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বসিয়া রহিল। জামাইবাবুর দুরদৃষ্ট,—ঠিক সেই ভাবে নিঃশব্দে সাড়া না দিয়া যেমন বাড়ীর ভিতর যাইবেন, অমনি নন্দরাম

ছুটিয়া গিয়া অন্ধকারে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া খুব উত্তমমধ্যম প্রহার দিল। জামাইবাবু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি আলো লইয়া আসিয়া দেখিল,—নন্দরাম জামাই ঠ্যাঙ্গাইতেছে! নন্দরামের মা বলিল,—"হাঁ—হাঁ—ক'রিস্ কি—ক'রিস্ কি নন্দ!" নন্দরাম যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"ইস্—বড্ডই ভুল হয়ে গেছে মা! অন্ধকারে চিন্‌তে পারিনি। কাল সন্ধ্যের সময় বাড়ী থেকে রূপোর হুঁকোটা চুরি গেছে,—আমি চোর মনে ক'রে ধ'রে দু'ঘা দিয়েছি! আমি ঐ জন্যেইতো দশবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম—কে-হে—কে-হে! জামাইবাবু কথা না কওয়াতেই বড্ডই বিভ্রাট ঘটে গেল!" নন্দরাম মৌখিক অনুতাপ করিতে করিতে জামাইবাবুর পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে লাগিল এবং বলিল,—"কিছু মনে কোরোনা ভাই—হঠাৎ হয়ে গেছে!" জামাই বাবুর যথেষ্ট আক্কেল হইল।

নন্দরাম ভাঙ্গাবাড়ীতে অনুচরবর্গ লইয়া এক সখের যাত্রার দল বসাইল। দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহার মহলাই চলিতে লাগিল। সেটা তো আর যাত্রার দল নয়,—একটা মদের ভাঁটী। যত মাতাল একত্রে জুটিয়া মদ খাইয়া প্রত্যহ হল্লা করে। যাহা হউক্,—পালা স্থির হইল "সাবিত্রী-সত্যবান।" নন্দরাম "যম" সাজিবে। বহুদিন ধরিয়া রিহার্স্যাল্ দিয়া সকলেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। এইবার পূজায় পালা গাহিতেই হইবে। কিন্তু

কোন ভদ্রলোক গেঁটে নন্দার দলের নাম শুনিয়া বাড়ীতে যাত্রা দিতে চাহেনা। অনেক সন্ধান করিয়া শেষে এক ধনবান শুঁড়ীর বাড়ী অভিনয় করা স্থির হইল। দলস্থ সকলের মহা আনন্দ। নন্দরাম বলিল,—"খবরদার! যাত্রার সময় কেহ মদ খাইও না। যাত্রা শেষ হইলে যাহা হয় হইবে!" সকলেই নন্দরামের আজ্ঞাধীন। শুঁড়ী সখের দলের জন্য বাড়ীতে যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিল,—নবমীর রাত্রে পঞ্চাশখানি সেকেণ্ড্ ক্লাস্ গাড়ীতে করিয়া যাত্রার দল বাড়ীতে লইয়া গেল। রাত্রি চারিটার সময় গাওনা আরম্ভ হইল। নন্দরামের আদেশে কেহ মদ স্পর্শ করে নাই। বাড়ীওয়ালাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যেন যাত্রার সময় একবিন্দু মদও সাজ ঘরে না আনা হয়। ক্রমে দু'ঘণ্টা গাওনার পর—নন্দরাম নিজে বাহিরে গিয়া দোকান হইতে একপাত্র টানিয়া আসিল। ক্রমে তাহার দেখাদেখি দলস্থ অন্যান্য সকলে সসজ্জায় বাহির হইতে একটু একটু টানিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ীওয়ালা দেখিল—ইহাতে যাত্রার বড় অসুবিধা হইতেছে। তখন সে আসিয়া নন্দরামকে বলিল,—"আপনাদের লোকজন—বাহিরে গিয়া কেন এত কষ্ট ক'চ্ছেন?—আমার ঘরে কেস্ কেস্ হুইস্কি ব্রাণ্ডি মজুৎ—একবার হুকুম করুন—এখুনি আনিয়া দিই!" নন্দরামপ্রমুখ দলস্থ অনেকেই সবেমাত্র গলাটুকু ভিজাইয়াছে,—তৎক্ষণাৎ হুকুম

হইল "মদ লেয়াও! আর না হ'লে গলা বেরুচ্ছে না!" হুকুম হইতে না হইতেই একেবারে তিন কেস্ বিলাতি মদ—সোডা—লেমনেড ইত্যাদি সাজঘরে আসিয়া হাজির। নন্দরাম বলিল,—"কেউ বেশী খেওনা! মাতাল হ'লে যাত্রা গাইতে পার্ব্বে না!" সকলেই বিজ্ঞের মতন বলিল—"আরে রাম বল,—বেশী খাব কেন? আমরা কি এত মূর্খ?" একটু একটু করিয়া চলিতে চলিতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সকলে একেবারে গভীর জলে গিয়া সাঁতার দিতে সুরু করিল। তখন পালা অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আসরে সাবিত্রীও টলিতেছেন—সত্যবানও পড়েন আর কি! তবে সত্যবানের এক ভরসা,—তিনি একটু বাদেই মরিতে পাইবেন। তা'হ'লেই তাঁহার নিষ্কৃতি! এইবার "যম" স্বয়ং "নন্দরাম" আসরে নামিবেন; তিনি পোষাক আঁটিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছেন। সকলে দেখিল,—যমের অবস্থা বড়ই শোচনীয়—মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। বাড়ীওয়ালাটী অতি ভাল মানুষ। যমের অবস্থা দেখিয়া বলিল—"পালা এবার না হয়—এই পর্য্যন্ত থাক্—একটু কন্সার্ট্ বাজিয়ে যাত্রা ভাঙ্গিয়ে দিই!" নন্দরাম বলিল—"কি? এত বড় কথা? আমার বেরুবার সময় যাত্রা ভেঙ্গে যাবে? তা হবেনা! ঐ বেল্ দিচ্ছে—আমায় আসরে ডাক্‌ছে! ছেড়ে দাও!" বলিয়া ধস্তাধস্তি করিতে করিতে যমরূপী নন্দরাম সেই পোষাকপরা অবস্থায়,—সাজঘরে যে খুব বড় এক

কড়া হালুয়া রাখা হইয়াছিল,—তাহারই উপরে বসিয়া পড়িল। পড়িয়াই পাঁচজনের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া—সকলকে ধাক্কা মারিয়া,—পশ্চাদ্ভাগে হালুয়ামাখাশুদ্ধ আসরে গিয়া উপস্থিত! শ্রোতারা যমের রকম দেখিয়া হৈ-হৈ শব্দে উঠিয়া পড়িল। সেই পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা এই সুযোগে যমের অঙ্গ হইতে খাব্‌লা খাব্‌লা হালুয়া তুলিয়া খাইতে লাগিল। বাড়ীওলা অনেক কষ্টে যাত্রা ভাঙ্গাইয়া দর্শকবৃন্দকে বিদায় করিল। সেই অবধি "গেঁটে নন্দার" যাত্রার দল উঠিয়া গেল।

একবার পূজার সময় নন্দরাম তাহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণকে লইয়া পাড়ার কোনও এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণবাড়ীতে অন্নব্যঞ্জন মৎস্যাদির যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। পাতা প্রস্তুত,—ব্রাহ্মণদিগের ডাক হইয়াছে; একেবারে প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ একত্রে বসিবে—এইরূপ ভাবে আহারের স্থান হইয়াছে। নন্দরাম ও হরেকৃষ্ণ উভয়ে পাশা-পাশি উপবেশন করিল। এমন সময় নন্দরাম ভ্রাতাকে বলিল,—"হরা! এক কাজ কর্ দিকি! আমাদের দুজনের জুতোটা একটা ঠিকানায় সরিয়ে রেখে আয়,—নইলে এত গোলমালে—এত ভীড়ে শেষে খুঁজে পাওয়া দায় হবে। তুই যা' ভাই—আমি তোর পাতা আগ্‌লে রাখ্‌ছি!" হরেকৃষ্ণ উঠিয়া নন্দের আদেশমত কার্য্য করিতে গেল। এমন সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সেই পাতে

আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। নন্দরাম বলিল,—"আজ্ঞে—এটা এক-জনের পাতা! সে এইমাত্র উঠে একটা কাজে গেছে—।" বৃদ্ধ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"পাতায় কি নাম লেখা আছে নাকি? আর-ওতো বিস্তর পাতা রয়েছে,—সে এসে ব'স্‌তে পার্ব্বেনা?" নন্দ-রাম বৃদ্ধকে কিছু বলিল না,—চুপ করিয়া রহিল। হরেকৃষ্ণ তাহার পাতে অন্যজন বসিয়াছে দেখিয়া অন্যস্থানে আহার করিতে বসিল। নানা প্রকার ভাজাভুজি তরকারী পরিবেশনের পর—মৎস্য বাহির হইল। বাড়ীওয়ালার আদেশ ছিল—"বয়স অনুসারে ছোট বড় মাছের মুড়া দেওয়া হইবে।" নন্দরামের পার্শ্বের সেই বৃদ্ধের পাতে পরিবেশনকারী এক বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুড়া দিল। বৃদ্ধ মহা খুসী হইয়া পরিবেশনকারীর দিকে চাহিয়া তাহাকে একটু আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন,—"কেমন আছ—তোমাদের বাড়ীর সকলে কেমন আছে"—ইত্যাদি। ইত্যবসরে বৃদ্ধকে অন্যমনস্ক দেখিয়া নন্দরাম বেমালুম তাহার পাত হইতে মাছের বৃহৎ মুড়াটী নিজের পাতে লইয়া তন্নিবিষ্টচিত্তে তাহার সদ্গতি করিতে আরম্ভ করিল। পরিবেশনকারী চলিয়া গেলে—বৃদ্ধ আহার করিতে গিয়া দেখিল,—সাধের মুড়াটী তো নাই! কোথায় গেল? নন্দরামের পাতে চাহিয়া দেখে—সেই বেঁটে ছোক্‌রাটী প্রাণ ভরিয়া তাঁহার মুড়া লইয়া চুষিতেছে! বৃদ্ধ অবাক! এত বড় পাষণ্ড—অর্ব্বাচীন কখনো তিনি জীবনে দেখেন নাই!

বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ নন্দরামকে বলিলেন,—"তোমার এ কি রকম আক্কেল হে ছোক্‌রা! আমার খাওয়া নষ্ট ক'ল্লে?" নন্দ সে কথায় বাধা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"নাঃ—আমাদের খাওয়া নষ্ট হবে কেন? আপনার অসুখ ক'চ্ছে? আপনি সচ্ছন্দে উঠে যান!" এই কথা বলিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া নন্দরাম উচ্চৈস্বরে বলিল,—"মশাইরা যদি অনুমতি করেন—তা'হ'লে এই প্রাচীন লোকটী উঠ্‌তে পারেন! এঁর হঠাৎ পেটের পীড়া হ'য়েছে!" তখন সকলের সবেমাত্র অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে! সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উঠুন-উঠুন—উনি স্বচ্ছন্দে উঠুন—আমাদের কোনও আপত্তি নাই!" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তরে অন্তরে ক্রোধানল প্রজ্জলিত করিয়া এবং প্রজ্জলিত জঠরানল লইয়া—অগত্যা লোকের তাড়নায় আহারস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধ আসল কথা কিছু প্রকাশ না করিয়া—একেবারে নিজবাটী প্রস্থান করিলেন। নন্দরামের জোড়া মেলা ভার!

গন্ধগোকুল

গন্ধগোকুল নাম শুনিয়া আপনারা হয়ত একটা জানোয়ারের কথা ভাবিতেছেন,—কিন্তু আমি যাহার কথা বলিতে বসিয়াছি, সেটা আচারব্যবহারে, চালচলনে, অনেকটা চতুষ্পদ এবং লাঙ্গুল-বিশিষ্ট জানোয়ারের মতন হইলেও—বাহ্যিক আকারে মনুষ্যশ্রেণী-ভুক্ত। ইহার দুই হাত, দুই পা, দুই কাণ, দুই চোখ—একটী নাক,—ঘাড়ের উপর একটী মাথা, তাহাতে আবার মনুষ্যের মতন চুল,—যেখানকার যাহা—পুরাদস্তুর ঠিকই বজায় আছে ; সুতরাং এ হেন গন্ধগোকুল প্রাণীটাকে আপনারা মনুষ্য বলিতে বাধ্য কিনা ?

আমরা যখন স্কুলে থার্ড ক্লাশে পড়ি, একদিন মান্যবর সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় একটী কোট্‌পেণ্ট্‌লুন্‌শোভিত স্থূলকায় বালককে সঙ্গে লইয়া আমাদের ক্লাশে বসাইয়া দিলেন। বাল্যকালে, বিশেষতঃ পাঠ্যজীবনে ক্লাসে বসিয়া একটা কিছু কিম্ভুতকিমাকার রকমের দেখিলেই সদানন্দ প্রাণে আনন্দের মাত্রাটা যেন সহস্রগুণ বাড়িয়া উঠে। উক্ত বালকের আকৃতি দেখিয়া ক্লাশের সকল ছেলেরাই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। জনকয়েক "দুষ্ট" উপাধি-ধারী বালক মুখ টিপিয়া হাসিতে অক্ষম হইয়া হাসির মাত্রা এঁকে-

বারে বাড়াইয়া ফেলিল। মাষ্টার মহাশয় এরূপ অরাজকতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহী বালক কয়জনকে যথোচিত শাস্তিপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ক্লাশরাজ্যে তখনকার মতন শান্তি সংস্থাপিত করিলেন।

সে আজ বহুদিনের কথা। বয়সবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া শুধু চপলমতি বালক কেন,—অনেক গম্ভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধেরও হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর। সংক্ষেপে সে মূর্ত্তির কতকটা বর্ণনা করিলে আপনারাও প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারিবেন,—ব্যাপারটা কি! মনে করুন, একটা "বিশমনি" তুলার বস্তা,—তাহার দুই পার্শ্বে দুই হাত—নীচে ছোট দুটী পা,—উপরে একটী মুণ্ড আঁটা। সেটা যদি অকস্মাৎ সজীব হইয়া আপনার সম্মুখ দিয়া গুড় গুড় করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে—তাহা হইলে সে দৃশ্য দেখিয়া আপনি কতক্ষণ গম্ভীর হইয়া না হাসিয়া থাকিতে পারেন? উক্ত বালকের সেই বিপুল দেহখানি ঠিক সেইরূপ! দেখিয়া প্রথমেই মনে হইবে—ইহা একটী বৃহৎ "মাংসপিণ্ড"; শরীরে হাড়ের সম্পর্ক নাই। গাত্রের বর্ণ খুব "সাদা,"—সুতরাং ইহাকে তুলার বস্তা বলা যায় কি না? চোখ্ দুটী বড় বড়—কিন্তু গোলাকার! তন্মধ্যে তারা দুটী যেন "গোলদিঘিতে" ছিনিমণি খেলিয়া ঘোরপাক খাইতেছে। নাসিকা যেন "ছাঁচি কুমড়ার বড়ি"; মধ্যভাগ সমতল ভূমি,—যেন তাহার উপর দিয়া "রেলের গাড়ী" চলিয়া

গিয়াছে,—মাত্র অগ্রভাগে দুইটী ছিদ্র-বিশিষ্ট খানিকটা মাংস পরিত্যক্ত। ওষ্ঠদ্বয় যেন কাবুলিওয়ালাসেব্য দুইখানি পুরু পুরু রুটী; ইহাতেও একটী বিশেষত্ব এই যে,—উপর ঠোঁটের সহিত নীচের ঠোঁটের যেন জাতিগত মহাশত্রুতা আছে,—কোনমতেই কেহ কাহারও নিকট অগ্রসর হয়না;—আবার তাহার মধ্যে বাদ সাধিয়াছে—উপর পাটীর মূলার ন্যায় দন্তশ্রেণী! সে তো দন্ত নয়, যেন চাষার বাড়ীর "আগড়!" এই ভীষণ মুখ-কন্দরে অহোরাত্র তাম্বূল নিষ্পেষিত হইয়া শোণিততুল্য রসে সেই মহাদন্ত ও ভীষণ ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত হইতেছে। সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আসিয়া ক্লাশের শিক্ষকের সম্মুখস্থ বেঞ্চিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। গজেন্দ্র-গমনে নূতন বালকটী আসিয়া মধ্যস্থলের দুটী বালককে একটু ঠেলিয়া কোনমতে "রাজবাড়ীর থামের" ন্যায় দুটী পা ডবল বেঞ্চির ভিতরে প্রবেশ করাইয়া যেমন বসিবেন,—অমনি বেঞ্চির শেষের দিকে দুই ধারের দুটী বালক ভূমিতে পড়িয়া গেল;—তাঁহার দুই পার্শ্বস্থিত দুই বালক "উহু—উহু—মরে গেলুম—পিশে মরে গেলুম" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সেই বেঞ্চ্‌স্থিত আরও দুই চারিটী বালক নিষ্পেষণে প্রাণের দায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে অবস্থায় সে দৃশ্য দেখিয়া কোন্ শান্তপ্রকৃতি বালক হাস্যসম্বরণ করিতে পারে?

নূতন বালকটীর নাম শ্রীমান গোকুলকিশোরেশ্বর পাত্র। নাম শুনিলেই তো চক্ষুস্থির—তাহার উপর এই মূর্ত্তি! শুনিলাম,—কোন্ দেশের রাজার ছেলে। অতি শৈশবকালে রাজা—রাজপুত্র—মন্ত্রীর কথা গল্পেই শুনিয়াছি। রাজা—রাজপুত্র দেখা কখনও অদৃষ্টে ঘটে নাই; এইবার একেবারে হাতের পাশে রাজার ছেলে দেখিলাম! রাজার ছেলে—একটা দেখিবার জিনিস বটে! কিন্তু কোথাকার রাজা,—কাহার ছেলে,—কি বৃত্তান্ত,—সে সময় অত কিছু পরিচয় পাই নাই! তবে জুড়ীগাড়ী, দরোয়ান প্রত্যহ স্কুলে আসিয়া রাজার ছেলেকে বাড়ী লইয়া যাইত,—মাষ্টার, পণ্ডিত, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সকলে তাহাকে বিশেষ রকম খাতির করিত। সে কি যে সে খাতির? রাজার ছেলের টিফিন্ খাইবার জন্য একটা পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল;—দেড়টার সময় রাজার ছেলে ঘরে ঢুকিলে ভিতর হইতে তাহার অর্গল বদ্ধ হইয়া যাইত। আহারটা অবশ্য "রাজভোগই" হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজার ছেলে কি আর কচুরী—জিলিপী—গজা—আলুর দম্ খাইতে পারে? আবার দুইটার পর দ্বার খুলিয়া রাজার ছেলে হেলিতে দুলিতে জোড়া থামের ন্যায় পা ফেলিয়া, তুলার বস্তারূপ বিপুল দেহ লইয়া ক্লাশে গিয়া বসিতেন। রাজার ছেলের অঙ্গে কখনও রৌদ্র লাগিবার হুকুম ছিল না। কারণ,—তিনি গাড়ী হইতে যেমন নামিতেন, অমনি তাঁহার দ্বারবান

ছত্রধারী হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া একেবারে তাঁহাকে ক্লাশে পৌঁছিয়া দিয়া যাইত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ক্লাশ্ বসিবার পূর্ব্বে কিম্বা দেড়টা বেলায় টিফিনের ছুটীর সময় অথবা চারিটা বাজিলে বাড়ী যাইবার সময়, রাজপুত্র যখন ক্লাশ্ হইতে বাহির হইতেন,—তখন স্কুলের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ—তাঁহার নিকটে আসিয়া জমায়েৎ হইত এবং সেই অদ্ভুত দেহধারী "রাজার ছেলের" চালচলন দেখিয়া প্রাণে প্রাণে আনন্দলাভ করিত।

একে রাজার ছেলে—তাহার উপর জুড়ীগাড়ী চাপিয়া চোপ-দার দ্বারবান সঙ্গে লইয়া স্কুলে আসেন,—সুতরাং মাষ্টার পণ্ডিতের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাকে একটু সমিহ করিয়া চলিতেন। ভুলেও কেহ একদিন রাজপুত্রকে পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন না। রাজপুত্র চেহারাতে যেরূপই হউন্ না কেন,—ব্যবহারে কিন্তু গোবেচারি। সাড়ে দশটা বাজিবার পাঁচ মিনিট আগে আসিয়া ক্লাশে এককোণে আসন লইতেন এবং আপনার মনে নূতন চক্‌চকে বইখানি খুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেন, ভুলেও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার এরূপ শিষ্টতা ক্লাশের ছেলেদের কিন্তু আদৌ ভাল লাগিত না। প্রায় সকলেই তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিত,—রাজপুত্র কিন্তু একটী কথারও জবাব দিতেন না। ইহাতে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর

তাঁহার উপর চটিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই কেহ তাঁহাকে কাগজের পুঁটুলি করিয়া ছুঁড়িয়া মারিত, কেহ ছাতির বক্র অগ্রভাগের দ্বারায় টেবিলের তলা হইতে তাঁহার পা টানিয়া ধরিত। কেহ পান চিবাইয়া দূর হইতে তাঁহার গায়ে ফেলিত। ছুটীর সময় দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গায়ে পড়িত। এইরূপে প্রায় ক্লাশ্‌শুদ্ধ বালক তাঁহার প্রতি প্রত্যহ অযথা অন্যায় অত্যাচার উপদ্রব করিত। নিরীহ "রাজপুত্র" কিন্তু একটী কথাও কহিতেন না। এইরূপ অত্যাচার করা অপরাধে বালকগণও মাষ্টার-পণ্ডিতের কাছে যথেষ্ট শাস্তিলাভ করিত। অত্যাচারের মাত্রা এক একদিন যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত,—তখন "রাজপুত্রের" কাতরভাব দেখিয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইত। সেদিন আমি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া দস্যুর মতন বালকদিগের সহিত বিবাদ করিতাম এবং দলের দুই একজন "সর্দ্দারকে" সুপারিন্‌-টেণ্ডের কাছে ধরাইয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইতাম। সুতরাং আমার জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস করিত না।

আমাদের ক্লাশের অঙ্কের মাষ্টার অসুখে পড়িয়া মাসখানেক কামাই করেন। প্রথম শ্রেণীর অঙ্কশিক্ষক "সদয়বাবু" সে সময় আমাদের অঙ্ক কসাইতেন। সদয়বাবু অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, ক্লাশের সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

তাঁহার একটী বিশেষ গুণ ছিল; ছেলেরা যদি "জিওমেট্রির" পড়া বলিতে পারিত এবং ক্লাশে নির্ভুল অঙ্ক কসিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু পড়াশুনায় একটু অবহেলা করিলেই—তাঁহার কাছে আর নিস্তার থাকিত না। সদয়বাবু প্রথমদিন ক্লাশে পড়াইতে আসিয়া, প্রথমে গম্ভীরভাবে একবার সমস্ত ক্লাশ্টা দেখিয়া লইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি পড়া আছে?" আমরা বলিলাম—"পুরাতন পড়া, "জিওমেট্রির" প্রথম বুকের প্রথম হইতে দশটা প্রপোজিসান্।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সকলে ফিফ্‌ত প্রপোজিসান্টা খাতায় লেখো! খবরদার—কেহ বই দেখে কিম্বা কারুর খাতা দেখে লিখ্‌লে—তা'কে দূর ক'রে দোবো।" সকলে লিখিবার জন্য তৎপর হইলাম। ঠিক দশ মিনিট পরে তিনি আদেশ করিলেন,— "পুরাণো পড়া—দশ মিনিট সময় যথেষ্ট। সকলে লেখা বন্ধ কর।" সকলে কলের পুতুলের মত হাত গুটাইয়া বসিলাম। তিনি আপন ইচ্ছামত এক একজনকে ডাকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাল মন্দ যে যেমন লিখিয়াছে, তাহাকে তিনি সেই ওজনে ভালমন্দ কথা বলিতেছেন। দু'পাঁচজনকে পরীক্ষা করিবার পর—হঠাৎ "রাজপুত্রের" প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তিনি রাজপুত্রকে খাতা লইয়া উঠিয়া আসিতে বলিলেন। আজ চারি মাস যাবৎ রাজপুত্র স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন—আজ প্রথম দিন

শিক্ষক তাঁহাকে লেখাপড়ার "কৈফিয়ৎ" দিবার জন্য আদেশ করিলেন। সদয়বাবু যত বলেন,—"উঠে এসহে ছোক্‌রা",—"রাজপুত্র" অচল অটল গজগিরিটী হইয়া নিজস্থানে বসিয়া–সেই গোল গোল ভাঁটার মত চক্ষু দুটী এক একবার সদয়বাবুর প্রতি নিক্ষেপ করে, এক একবার নিজের অঙ্কের খাতার প্রতি নিপাতিত করে, এক একবার কৌতূহলাক্রান্ত সমগ্র ছাত্রবৃন্দের প্রতি ঘুরাইয়া লইয়া যায়। সদয়বাবু ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; শুধু অবাধ্যতা নহে—রাজপুত্র সদয়বাবু কর্ত্তৃক আক্রান্ত অবস্থায় একমুখ পানসুপারি করাল বদনে লইয়া চিবাইতেছিলেন,—তাহাতে সদয়বাবুর ক্রোধের মাত্রাটা যেন সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি ঘৃণিত নয়নে–দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বলিয়া উঠিলেন (কারণ আমারই ঠিক পার্শ্বে সেদিন রাজপুত্র আসন লইয়াছিলেন),—"বিনোদ! ষ্টুপিডের কাণ ধ'রে আমার কাছে তুলে নিয়ে আয়তো!" আমি রাজপুত্রকে ধীরে ধীরে বলিলাম,—"যাওনাহে ছোক্‌রা! স্যার্ ডাক্‌ছেন—খাতা নিয়ে কাছে যাওনা!" আমার কথা শুনিয়া এবং সদয়বাবুর ভীষণ ভাব ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়া—রাজকুমার "কাঁদো কাঁদো" মুখে—সেই "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শাল-প্রাংশু মহাভুজ"—বিশিষ্ট বিশাল (দেহযষ্টি নয়) দেহমেরুখানি লইয়া গজেন্দ্রগমনে সদয়বাবুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সদয়বাবু

আমাকে একটু স্নেহ করিতেন, সেই ভরসায় এবং রাজকুমারের কাতর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলাম, "ও ছোক্‌রা নতুন ভর্ত্তি হ'য়েছে স্যার্‌,—তাই ভয়ে এতক্ষণ যায়নি!" সদয়-বাবু উগ্রভাবে আমাকে বলিলেন,—"নতুন পুরাণো কি? লেখা-পড়া ক'র্ত্তে এসেছে না মামার বাড়ীতে আদর পেতে এসেছে?" তৎক্ষণে রাজপুত্র সদয়বাবুর নিকটে (দুইহাত তফাতে) গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সদয়বাবু। (পূর্ব্ববৎ রাগান্বিত স্বরে) এতক্ষণ ডাক্‌ছিলুম, উঠে আস্‌ছিলে না যে?

রাজপুত্র পূর্ব্বের ন্যায় চারিদিকে চান এবং নিরুত্তর থাকিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করেন। সদয়বাবু এ ধৃষ্টতা আর সহ্য করিতে না পারিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া সেই বিশাল দেহে একটী ধাক্কা দিয়া বলিলেন,—"অসভ্য—বর্ব্বর! ক্লাশে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছ? জাবর কাট্‌ছ? যাও—দূর হও! পান ফেলে এস!" রাজপুত্র জানালার নিকট গিয়া বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়া বদনবিবর হইতে পানের পুঁটুলিটী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শিক্ষকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সদয়। তোমার নাম কি?

রাজপুত্র। (রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বরে) কুমার গোকুলকিশোরেশ্বর পাত্র।

সদয়। ম'র্ত্তে থার্ড্‌ ক্লাশে ভর্ত্তি হ'য়েছ কেন? নাইন্‌থ্‌-ক্লাশেও যে বস্‌বার উপযুক্ত হওনি! এখনও নাম ব'ল্‌তে শেখনি? নিজের নাম বল্‌বার সময় "কুমার—কুমোর" কেন? চেহারাতে শ্রী নেই,—বুদ্ধিতেও শ্রী নেই,—নামেতেও শ্রী নেই? মুখে আগুন!

রাজপুত্র। আজ্ঞে শ্রীগোকুলকিশোরেশ্বর পাত্র।

সদয়। কি নাম দেখ! "গোকুল কিশোরেশ্বর"। তোমার নাম "গন্ধগোকুল" রাখাই ঠিক উচিত ছিল! যে রকম এসেন্স্‌ মেখে গন্ধ ছড়িয়েছ—তা'তে এবার থেকে সকলে তোমায় "গন্ধ-গোকুল" ব'লে ডাক্‌বে।

বহুক্ষণ যাবৎ আমরা (ক্লাশের ছাত্রগণ) সদয়বাবুর ভয়ে প করিয়াছিলাম; গন্ধগোকুল নাম শুনিয়া হাস্যবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সদয়বাবুর তীক্ষ্ণ কটাক্ষশর-বর্ষণে পরক্ষণেই সব জড় পদার্থের ন্যায় অচল অটল পুত্তলিকাপ্রায় বসিয়া রহিলাম। শিক্ষক মহাশয় "রাজপুত্রকে" বলিলেন, "খাতা দেখি—কি লিখেছ!"

কম্পিত-হস্তে রাজপুত্র খাতাখানি সদয়বাবুকে দিলেন।

এইবার বিষম ব্যাপার! খাতায় কি জানি কি লেখা ছিল; সদয়বাবু একবারমাত্র তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াই একেবারে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক—রাজপুত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে লেখা দেখা-

ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি! কি লিখেছ?" এই বলিয়া খাতা-খানি লইয়া তিনি আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখহে—গন্ধগোকুল ফিফ্‌থ্‌ প্রোপোজিসান প্রুফ্‌ ক'র্‌তে একেবারে ডিম্ব প্রসব ক'রেছে!"

যথার্থ—ডিম্বপ্রসবই বটে! সদয়বাবুর অনুমতি পাইয়া রাজ-পুত্রের খাতা লইয়া দেখি—ফিফ্‌থ প্রপোজিসনের সমদ্বিভুজ ত্রিকোণ (Isosceles traingle) অঙ্কিত করিতে গিয়া একটী ডিম্বাকার রেখা টানিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়া সদয়বাবুর "ক্লাশ্‌" হইয়া গেল। তিনি তখন আমাদের নিকট হইতে রাজপুত্রের খাতা লইয়া এবং "রাজপুত্র" ওরফে গন্ধগোকুলকে সঙ্গে লইয়া ক্লাশ্‌ হইতে বাহির হইলেন এবং প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া "গন্ধগোকুল" এবং তাঁহার প্রসূত "ডিম্ব" দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে সেদিন একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

এই ব্যাপারের পর রাজপুত্র আর মাসখানেক মাত্র স্কুলে আসিয়াছিলেন। এখন আর কেহ তাঁহাকে রাজপুত্র বলেনা,—সকলেই "গন্ধগোকুল" বলিয়া ডাকে। সমগ্র ছাত্রের ভিতর রাজপুত্র কেবল আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেন; তাহার কারণ, আমি কখনো তাঁহার সহিত অন্যায় আচরণ করিতাম না। বরং সাধ্যমত তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব রক্ষা করিতাম। এই কারণে আমার সহিত শুধু বাক্যালাপ নয়,—

ছুটীর দিনে তিনি আমাদের বাটীতে আসিতেন, আমার পিতা-মাতা ভ্রাতা এবং অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন। কতদিন তিনি আমাকে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাসাবাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য মোটরকার অথবা জুড়ীগাড়ী লইয়া আসিয়া পিতাকে অনুরোধ করিতেন,—কিন্তু পিতা কিছুতেই সম্মত হইতেন না। স্কুল ছাড়িবার পরেও "রাজপুত্র" মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। কিছুদিনে পরে শুনিলাম, "রাজ-পুত্র ওরফে "গন্ধগোকুল" স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার আর বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই।

* * *

তাহার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারের অবস্থাতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি এক্ষণে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধীধারী ডাক্তার ; ঈশ্বরেচ্ছায় সহরে চিকিৎসাব্যবসায়ে একটু পসার জমাইতে সক্ষম হইয়াছি। পিতামাতার পরলোকগমনের পর– সংসারে আমিই এক্ষণে "কর্ত্তা।"

প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাইতে যাই। একদিন রবিবারে আমি বেঞ্চিতে বসিয়া মৃদুমন্দ শীতল বায়ুসংস্পর্শে আরাম অনুভব করিতেছি,—এমন সময় দেখি—

একটি স্থূলকায় গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া একেবারে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"বাঃ!—খুব তো ডাক্তার! বাড়ী গেলে দেখা কর না;—কি রকম বল দেখি?" আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার ভাব দেখিয়া সে ব্যক্তি দন্তপংক্তি বিস্তার করিয়া উচ্চ হাস্যে বলিয়া উঠিল, "কি হে বিনোদ বাবু! ডাক্তার হ'য়ে লোকের নাড়ী টিপে "গন্ধগোকুলকে" এরি মধ্যে ভুলে গেলে?"

এতক্ষণে আমার চৈতন্যের উদ্রেক হইল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে খাতির করিয়া বলিলাম,—"কিছু মনে করোনা ভাই—আজ দশ বৎসর হ'ল দেখাশুনা নেই,—প্রথমটা চিন্তে পারিনি। তোমার চেহারা অনেকটা ব'দ্‌লে গেছে;—আগেকার চেয়ে ভয়ানক মোটা হ'য়েছ!" গন্ধগোকুল হাসিয়া বলিলেন, "তোমার চেহারাও তো খুব ব'দ্‌লে গেছে; কিন্তু আমি তোমাকে দেখ্‌বামাত্রই চিনে ফেলেছি।"

দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শুনিলাম "রাজপুত্র"—পিতৃবিয়োগে পিতার অগাধ সম্পত্তি হস্তগত হওয়াতে (গভর্মেণ্ট্ প্রদত্ত উপাধি না হইলেও) নিজ প্রজাবর্গের দ্বারায় "রাজা" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

নানারূপ আলাপপরিচয় কুশলসংবাদাদির পর গন্ধগোকুল বলিলেন,—"গন্ধগোকুল নামটা আমার এখনও খুব বজায় আছে

—বুঝ্‌লে ডাক্তার! যাই হোক, নামটাতে খুব মানে আছে শুনিছি! আমার গা দিয়ে দিনরাত্তির গন্ধ বেরুচ্ছে, সেকি একটা—হা হা হা হা—ছোটখাটো ব্যাপার? কি বল? সেই অবধি আমি দিনরাত্তির গন্ধ মেখে থাকি। রোজ কুড়ী শিশি আমার এসেন্স্‌ খরচ হয়। মাষ্টারটা অনেক বুঝে তবে নামটা দিয়েছিল,—কি বল?" এই বলিয়া আবার হা হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম—"রাজা" হইলে কি হইবে, গন্ধগোকুল এখনও পূর্ব্বের মতই "আহাম্মক" (Idiot) আছেন! আমি আর কিছু বলিলাম না;—একটু হাসিয়া নীরব হইলাম।

গন্ধগোকুল অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আমাকে তাঁহার নূতন বাসাবাটী (বালিগঞ্জে) যাইবার জন্য সম্মত করাইলেন। মহানন্দে গন্ধগোকুল আমাকে তাঁহার বৃহৎ জুড়ীতে আরোহণ করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,—"আমার গাড়ী আছে,—তা'তেই যাই না।"

গন্ধ। আরে না—না—তা' কি হয়? তোমার গাড়ী ফিরে যেতে বল।

অগত্যা তাহাই করিলাম। সহিসকে বলিয়া দিলাম—আমার বাড়ী ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। তখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়াছে। আমি গন্ধগোকুলের বাসায় যাইবার জন্য তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গন্ধগোকুল

গম্ভীরভাবে তাঁহার একজন সহিসকে আদেশ করিলেন,—"নাচ্‌না-ওয়ালী সব্‌ বোলাও।"

সহিস—"যো হুকুম" বলিয়া বাগানের ভিতর ছুটিল।

নাচ্‌নাওয়ালী? কি সর্ব্বনাশ! কথাটা শুনিয়া ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। গন্ধগোকুল কি বারাঙ্গনা লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিল? ভাবিলাম—"আশ্চর্য্যই বা কি? জমিদারের ছেলে বাপের বিষয় পাইয়া হয়তো অধঃপাতে গিয়াছে। কিন্তু আমি কি দায়ে পড়িলাম! কেমন করিয়া বারাঙ্গনার সহিত এক গাড়ীতে যাইব? নামিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ।" আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া গন্ধগোকুল বলিলেন, "নাচ্‌নাওয়ালী শুনে ভয় পেলে নাকি?" আমি ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "ভয় পাবার অপরাধ কি? সহরের ভিতর—ভদ্রসন্তান—কেমন করে এক গাড়ীতে নাচ্‌নাউলি নিয়ে যেতে পারে বল দিকি?"

গন্ধগোকুল আমার কথা শুনিয়া তাহার চিরাভ্যস্ত ভীষণ হাস্যের রোল তুলিয়া দিল।

এমন সময় সহিসের সহিত একপাল "যাত্রার দলের ছেলে"—কেহ হাতে চানাচুর, কেহ হাতে ঘুগনিদানা—কেহ রবারের ফানুস—কেহ সোলার খেল্‌না লইয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। গন্ধগোকুল আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছ ডাক্তার—আমার নাচ্‌নাওয়ালীদের দেখ্‌ছ?"

এতক্ষণে আমার ধড়ে প্রাণ আসিল। গন্ধগোকুলের অন্য পাঁচখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডো এই সকল অর্ব্বাচীন বালকদের বোঝাই করিয়া আনিয়াছিল। সেই বালকদল "রাজা মশাইকে" (অর্থাৎ গন্ধগোকুলকে) গাড়ীতে বসিতে দেখিয়া—যে যাহার গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। গন্ধগোকুল তাহাদের ভিতর হইতে—দুইজনকে ডাকিলেন, "বেলু—চাম্‌লু! তোমরা এই গাড়ীতে উঠে এস!" দুইটী শীর্ণকায় (গাল চড়া—ঘাড় ছাঁটা—মাথায় দুতলা চৌতলা চুলকাটা—ঝোটন বাঁধা) পাঞ্জাবীপরা বালক আমাদের গাড়ীতে আসিয়া বসিল। গন্ধগোকুল বাসায় যাইতে যাইতে এই সমস্ত "নাচ্‌নাওয়ালীগণের" পরিচয় দিতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতে গন্ধগোকুলের নাট্যাভিনয়ে এবং সঙ্গীত-চর্চ্চায় বড়ই অনুরাগ। পিতার জীবদ্দশায় এই দুইটী কলাবিদ্যার অনুশীলনের কোনও সুবিধা হয় নাই। ঈশ্বরের কৃপায় পিতামাতা দুইজনেরই পরলোকগমনে তাঁহার সকল সাধ মিটাইবার সুযোগ হইয়াছে। তিনি পেশাদারী যাত্রার দলের কতকগুলি অজাত-গুম্ফ শ্মশ্রু বালককে বেতন ও খোরাক পোযাক দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া আপন ইচ্ছামত নাটক অভিনয় এবং নৃত্যগীত-বাদ্যের চর্চ্চা করিতেন। সেই সকল বালকদিগের "হরে" "মেধো" "প্যামা" "রামা" ইত্যাদি গ্রাম্য নামের পরিবর্ত্তে "বেলা" "চামেলি" "টগর" "আতর" "গোলাপ" "কুঙ্কুম" ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছেন।

বালকগণ ছায়ার মতন সদাসর্ব্বদা গন্ধগোকুলের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং ইহাদের দেশস্থ পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য গন্ধগোকুলের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ভাবে বুঝিলাম—"বেলু চাম্‌লু" (অর্থাৎ বেলা, চামেলি) নামধেয় যে দুইটী বালক আমাদের জুড়িতে বসিয়াছিল—গন্ধগোকুলের তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং আদরের সামগ্রী।

দশদিক বিকম্পিত করিয়া আমাদের জুড়ি বালিগঞ্জে গন্ধগোকুলের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীখানি প্রাসাদতুল্য,—রাজামহাশয়ের বাসের উপযুক্ত বটে! ফটকে সঙ্গীনতরবারীধারী যোগ্যপরিচ্ছদে শোভিত চারিজন শিখজাতীয় দ্বাররক্ষক,—আমাদের গাড়ী থামিবামাত্রই দস্তুরমতন আদবকায়দার সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া কুর্ণীশ করিতে লাগিল। গন্ধগোকুল দ্বারে আসিয়াও গাড়ী হইতে নামেন না; সুতরাং আমাকেও তদবস্থায় গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইল। কি করি—নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে পায়জামা চাপ্‌কান পাগ্‌ড়ী আঁটা প্রায় ত্রিশজন কর্ম্মচারী ফটকের দুইপার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি চারিজন আব্‌দালি গন্ধগোকুলের পথে (ফটক হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত) এক সুদীর্ঘ মখমল পাতিয়া দিল। দুইজন চামরধারী আসিয়া গাড়ীর দুইপার্শ্ব হইতে গন্ধগোকুলকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নয়,—জনকয়েক শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে

সঙ্গে একদল লক্ষ্ণৌ সহরের "রশুন্‌চৌকি" মহোৎসাহে বাজাইতে আরম্ভ করিল। গন্ধগোকুল অপূর্ব্ব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। আমি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া যেন "হতভম্ব" হইয়া গেলাম; ভাবিলাম, "আজ গন্ধগোকুলের বিবাহ নাকি ?"

মহারাজ এতক্ষণে সদয় হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁহার সহিত গাড়ী হইতে নামিলাম। তাহাতেই কি নিস্তার আছে ? গন্ধগোকুল মহারাজ যে মূহূর্ত্তে সেই বিপুল দেহ-পর্ব্বত মাটীতে স্থাপিত করিলেন, অমনি দুইপার্শ্বে চারিটী বড় "ভূঁইপটকার" আওয়াজ হইল। আমি ভাবিলাম—"যাক্—বাঁচা গেল; (Royal salute) রাজ-অভ্যর্থনাটা বড় কামানে না হইয়া পট্‌কার উপর দিয়াই সমাধা হইয়াছে!" মহারাজ গজেন্দ্রগমনে সম্মুখে ও পশ্চাতে "বেলা চামেলিকে" এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আমাকে লইয়া "নবাবী কেতায়" চলিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্রে অগ্রে আশা-সোঁটাধারী বরকন্দাজগণ—পথের দুই পার্শ্বে দুইজন অশ্বারোহী শরীররক্ষক এবং মিছিলের পশ্চাতে সেই "রশুন্ চৌকির" দল। রাজার মুখে অন্য কোন কথা নাই;—মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাকেন,—"বেলু—চাম্‌লু"! "বেলা" "চামেলী" নামক সেই অগ্রপশ্চাদ্‌গামী বালক দুইটী জোড়হস্তে অমনি উত্তর দেয়,—"মহারাজ!"

রাজ-কেতায় আমিতো অস্থির,—তাহার উপর রংমশাল জ্বালানোর গন্ধকের গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত! নাচ্‌নাওয়ালী বালকবৃন্দে পরিবৃত গন্ধগোকুল যেই সুসজ্জিত নাচঘরে প্রবেশ করিলেন, অমনি দুইজন শুভ্র-যজ্ঞোপবীতধারী মুণ্ডিতমস্তক "লম্বিত শিখা" পুরোহিত ধানদূর্ব্বা পুষ্পমাল্য লইয়া "গন্ধগোকুলকে" আশীর্ব্বাদ করিলেন। গন্ধগোকুল যখন মখ্‌মলের বিছানায় গিয়া উপবেশন করিলেন, অমনি চকিতের মধ্যে ঘুমুরপরা (পুরুষের সাজের উপরই) মাথায় ওড়না-ঢাকা অদ্ভুতমূর্ত্তিতে সেই বালকদল স্ত্রীলোকের ন্যায় হাবভাব করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল,—

"এস প্রীতিনাগর সুন্দর!
এস কমনীয়—এস রমণীয়
এস মধুর মধুর নরবর!!"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ নৃত্যগীত চলিল। সত্যকথা বলিতে কি,—রাজকেতায় জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছিলাম,—বালক-গণের মিষ্ট গলায় সমবেতসঙ্গীত বড় মন্দ লাগিল না। "মহারাজ" তন্ময় হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় প্রীতির স্বপ্নে যেন বিভোর ছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে—তিনি আমাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার! কষ্ট হ'চ্ছে কি?"

আমি যেন পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম, "বলেন কি

মহারাজ! স্বর্গধামে এসে কষ্ট হ'বে?" যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ! এইখানে আসিয়া প্রাণের দায়ে গন্ধগোকুলকে আমি মহারাজ সম্ভাষণ করিলাম। মহারাজ তখন আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার! তুমি একখানি গীত গাও!" আমি জোড়হস্তে বলিলাম, "মহারাজ! অধম ঐ বিষয়ে একেবারে একটী নিরেট! আমাকে গান বাজনা করিতে বলিলে আমার তৎক্ষণাৎ বাতশ্লেষ্মা বিকার উপস্থিত হয়!"

গন্ধগোকুল মহারাজ তখন মহাবিজ্ঞভাবে গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—গানবাজনা বড় শক্ত জিনিষ! ওসব কি যে সে পারে? তা'হ'লে এইবার আমার একখানা গান শুনিয়ে দিই,—কি বল ডাক্তার?"

আমি পরম সন্তোষের সহিত বলিলাম—"বেশ্ তো—বেশ্ তো মহারাজ! সেতো আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়! আমি এমন অদৃষ্ট কি ক'রেছি?" মহারাজ বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন "বেলু - চাম্‌লু!" অমনি তাহারা তৎক্ষণাৎ হার্‌মোনিয়াম্, বাঁয়াতবলা লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহারাজের সঙ্গীতে স্বরলয়ের "জোগান" দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মহারাজা হাত—পা—মাথা নাড়িয়া—নানা ভঙ্গীতে—"হুম্—হ্যাঁ—ম্—ই—উ—আ—এ—" ইত্যাদি অবোধ্য ভাষায় স্বর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর বায়স-নিন্দিত—রাসভ-লাঞ্ছিত

হইলেও আমার তত কষ্ট বোধ হয় নাই, কিন্তু "মহারাজ" সেই বৃহৎ "কুষ্মাণ্ডাকার" শ্মশ্রুগুম্ফবর্জ্জিত বদনমণ্ডল যখন বিকৃত করিয়া "মূলার দোকান" খুলিতেছিলেন,—যথার্থই সে যেন একটা ভয়াবহ দৃশ্য !

মহারাজ গাহিলেন,—"মাসী বলে মাথা খেলিরে !"

এই মরেছে রে ! গানের সুর ভাঁজা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম—"মহারাজ" কিছু গাহিতে জানুন আর নাই জানুন—অন্ততঃ মহারাজযোগ্য একটা বড় দরের "ঠাকুর—ঠাকরুণ" নাম গাহিবেন ! ও হরি ! এত রাজকেতা আদব-কায়দার পর—হতভাগা গান ধরিল কি না—

"মাসী বলে মাথা খেলিরে !"

কি করি,—চুপ্ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রসাদ-ভোজী পারিষদ্‌বর্গ মহারাজের গানের প্রতি কথায় চীৎকার করিয়া ওঠে—"বাঃ—বাঃ—কি চমৎকার। কি সুন্দর ! কি আওয়াজ !"

মহারাজ সেই বাহবাতে যেন আরও মাতিয়া উঠেন ! একটী একটী গানের কথা উচ্চারণ করেন আর সুরের সঙ্গে গলা হইতে "গিট্‌কারী" বাহির করিবার জন্য হেঁট হইয়া ভীষণরূপে মাথা চালেন,—যেন নাড়িয়া চাড়িয়া বিছানার উপর "গিট্‌কারী" উদ্গার করিয়া আমাদের ভাসাইয়া দিবেন। সে যে কি সুর—কি রাগরাগিণী—কি তাল—কি কায়দা, তাহা সুরলয়-বোধহীন

মূর্খ আমি,—হে সঙ্গীত-বিদ্যাকুশল পাঠকগণ! আপনারা স্বকর্ণে না শুনিলে সে সকলের মর্ম্ম কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারিবেন না।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে দেখিয়া আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য মহারাজের অনুমতি চাহিলাম। মহারাজ শশব্যস্তে বলিলেন,—"আরে তাও কি হয়? তুমি আমার বাল্যবন্ধু—কতকাল পরে তোমায় পেয়েছি: তুমি এখন আমার অতিথি; তোমার সৎকার না ক'রে ছাড়্‌তে পারি?" আমি জোড়হস্তে নিবেদন করিলাম, "সৎকারের কথা যদি ব'ল্লেন মহারাজ—সে আমার বহুক্ষণ হ'য়ে চুকে গেছে! শুধু সৎকার নয়,—আমার অস্থি পর্য্যন্ত গঙ্গায় দেওয়া হ'য়েছে! এখন পুনর্জ্জন্ম লাভের জন্য আমি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি। অধীনকে বিদায় দিন।" রাজা-মহারাজ লোক কি আর ছোট কথায় কাণ দেন? তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন,—"ব-য়!" চীৎকারমাত্রেই দুইজন মুসলমান খানসামা সসজ্জে উপস্থিত হইল।

মহারাজ তাঁহাদের দিকে বক্রদৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খানা?"

বারম্বার কুর্ণীশ করিতে করিতে খানসামাদ্বয় একসঙ্গে এক-স্বরে গলা মিলাইয়া উত্তর করিল, "তৈয়ার—জাঁহাপনা!"

"ঘণ্টি লাগাও!" বলিয়া মহারাজ আমার দিকে ফিরিয়া

বলিলেন,—"চল—ডাক্তার! একবার টিফিনরুমে ঘুরে আসি!" মুসলমান খানসামা দেখিয়া আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। আমি কাতরভাবে মহারাজকে বলিলাম,—"মহারাজ! অনেক দিনের বন্ধু—থুড়ি—অনুগত ব্যক্তি আমি; যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি,—প্রাণে মারুন—তা'তে ক্ষতি নাই, ব্রাহ্মণের জাতটী মারিবেন না!" হো-হো করিয়া বিকট হাস্যে মহারাজ বলিলেন,—"এঁ্যা—সে কি হে? তুমি কোল্‌কাতার লোক,—তা'র ওপোর এত বড় একজন ডাক্তার,—তোমার কুসংস্কার এখনও গেল না? আচ্ছা তা' থাক্! আমি হিন্দুখানার ব্যবস্থা ক'চ্ছি!"

আমি বলিলাম,—"দোহাই মহারাজ—আমি রোগা মানুষ,—রাত্রে কিছু আহার করি না। বৈকালে আহারাদি সেরে বেড়াতে বেরিয়েছি; রাত্রে কেবল এক গ্লাস্ ঠাণ্ডা জল খেয়ে শোবো! আমি আজ কিছুতেই খেতে পার্ব্বনা; বরং আর একদিন বৈকালে আস্‌বো, খাওয়া দাওয়া ক'র্ব্ব।"

মহারাজ একটু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তাইতো—তোমাকে কিছুই খাতিরযত্ন ক'র্ত্তে পাল্লুম না! তা'হলে তোমাকে একান্তই যদি এখনিই বিদায় দিতে হয়—তুমি ততক্ষণ "বিদায় সঙ্গীত" শোন,—আমি একটা "বিদায়-অশ্রু" কাব্য লিখে দিই!" সর্ব্বনাশ! ইহার উপর আবার কাব্যরচনা? তা'হলে

তো রাত্রি কাবার! আমি করজোড়ে বলিলাম,—"অনেক রাত্রি হ'য়েছে! ইহার উপর কাব্য-রচনা শুনিয়া যাইতে হইলে আজ রাত্রে তো আর বাড়ী ফেরা হ'বে না! দোহাই—দোহাই—মহারাজ—অধিরাজ! আমার একুল ওকুল দুকুল নষ্ট করিবেন না!"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন,—"আরে না—না—দশ মিনিট! আমার কি অদ্ভুত ক্ষমতা—তুমি তা'তো এখনও দেখনি। বলনা হে—"বলিয়া পার্শ্বচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে যেমন অরণ্যমধ্যে শৃগালদল একসঙ্গে কলরব করে—পার্শ্বচরগণ সকলে সমবেতকণ্ঠে মহারাজের ইঙ্গিতমাত্রেই তাঁহার অসাধারণ কাব্যরচনার গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। আমি অগত্যা সে অগ্নিপরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইলাম।

মহারাজ কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন; ইত্যবসরে সেই "নাচ্‌নাওয়ালা" (?) বালকবৃন্দ জঘন্য হাবভাবের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া গাইতে লাগিল,—"যাও হে নিঠুর কালা আর প্রেম ক'র্ব্বনা।"

যদি পরের বাটী না হইত—যদি এক দণ্ডের জন্য রাজত্বটা আমার হইত—তাহা হইলে (সে সময়ে আমার মানসিক অবস্থা যেরূপ—তাহাতে) আমি এই গন্ধগোকুলের পুরীশুদ্ধ একগাড় করিতাম!

গীত শেষ হইলে পর—একটী সালঙ্কৃতা প্রৌঢ়া (পরে জানিলাম—ইনি দাসী)—আসিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "কই—মহারাজ গেল কোথায়?" মহারাজ কাব্যলেখা ত্যাগ করিয়া সেই দাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি—কি—কি সংবাদ মাধবিকে?"

অতি রুক্ষস্বরে "মাধবিকে" (অর্থাৎ দাসী) বলিলেন—"সংবাদ আবার কি? আজ ১২ দিন যে অন্দর-মহল-মুখো হ'চ্ছেন না—ব্যাপারখানা কি? মহারাণী মা রেগে আগুন হ'য়েছেন! আজো রাত্তির এগারোটা বাজে: তিনি জান্‌তে চান, আপনি এখুনি তাঁর দরবারে গিয়ে হাজীর হ'বেন কি না?" দাসীর কথা শুনিয়া প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম,—কিন্তু "মহারাণী-মার" ব্যাপারটী মনে মনে আঁচ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম! অসুরনাশিনী মা জগদম্বা মহারাণীর স্কন্ধে ভর করিয়া বোধ হয় দীনের একটা গতি করিবেন ও করিতে পারেন।

মহারাজ ভীত হইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ মাধবিকে! আমি নিশ্চয়ই আজ সন্ধ্যার সময়—মহারাণীর দরবারে হাজির হ'তাম! কি করি,—আমার একটী বাল্যবন্ধু এসেছেন, তা'রই জন্য একটু রাত্রি হয়েছে!—তা—তা—আমি এখুনিই যাচ্ছি। তুমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখ,—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি।" "মাধবিকে" একটু প্রসন্না হইয়া ফিরিতে ফিরিতে বলিতে

লাগিলেন,—"যে রকম আজ মূর্ত্তি ধ'রেছেন,—তা'তে এগোয় কা'র সাধ্যি? যাই—একটু বুঝাইগে—"

মহারাজ কাব্যলেখা-কাগজহস্তে কম্পিত কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার! আজ তা'হ'লে যতটা লিখেছি—ততটাই শুনিয়ে দিই—"

আমি বলিলাম—"আজ থাক্‌না—আর একদিন ধীরে সুস্থে—"

মহারাজ। "না-না—তা'ও কি হয়! আমার লেখা বৃথা যা'বে? শোন! সব স্থির হ'য়ে ব'সো—

"কি আনন্দ আজ তোমায়
পেয়ে হে ডাক্তার।
মক্কেল পেলে খুসী
হয় যেমন মোক্তার॥
তুমি আমার বাল্যবন্ধু
হে বিনোদ।
তাই হাজির হ'য়েছ হেতা
গুজ্‌রোৎ খোদ॥
যখন তুমি আদর ক'রে
বল গন্ধগোকুল।
যেন মিষ্টি লাগে
আমার চৌপাফুল॥

আশীর্ব্বাদ করি তোমায়—"

এই পর্য্যন্ত শেষ হইতে না হইতে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল—"হটো—হটো—হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার!" দরবার শুদ্ধ সকলেই আসন ছাড়িয়া উঠিতে না উঠিতে এক ভীষণ রমণীমূর্ত্তি সম্মার্জ্জনী-হস্তে আলুলায়িতকেশে—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। হতভাগ্য আমি—সে প্রহারস্রোতে আমিও নিষ্কৃতি পাই নাই! দৌড়—দৌড়—দৌড়! যে যেখানে ছিল—উর্দ্ধশ্বাসে দরবারগৃহ ত্যাগ করিয়া—রাজপ্রাসাদ হইতে দৌড়! কর্ম্মচারী—পারিষদ—নাচ্‌নাওয়ালী বালকদল,—যে যেখানে ছিল—সকলেই ছুটিতেছে! কোথায় বা জুতা—কোথায় বা ছড়ি,—কোথায় বা উত্তরীয়! দুরদৃষ্ট আমার,—নগ্নপদে শুধু কামিজ-গায়ে—কাপড়ের কোঁচা হাতে করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে—একেবারে সদর রাস্তার অর্দ্ধপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কি ভীষণ ব্যাপার! বুঝিলাম—উগ্রচণ্ডারূপিণী স্বয়ং মহারাণীমা "গন্ধগোকুল"—দমনে স্বয়ং আসরে অবতীর্ণা! সে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল,—ততই ভয়ে ছুটিতে লাগিলাম!

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। বালিগঞ্জের পথে একখানিও গাড়ী নাই। দুঃখের কথা বলব কি,—সেই রাত্রে পদব্রজে বাড়ী ফিরিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল! এরূপ অবস্থায় বাড়ী

ফিরিয়া গৃহিণীকে কৈফিয়ৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে কি নাকাল হইয়াছিলাম, তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া লউন !

"ভুঁদে" গোপাল

"ভুঁদে"গোপালকে আপনারা চেনেন কি? কখনো নাম শুনেন নাই? যদি আজও না চিনিয়া শুনিয়া জানিয়া থাকেন—আপনাদিগের এক হিসাবে সৌভাগ্য,—অন্য হিসাবে খুবই দুর্ভাগ্য। সৌভাগ্য কিসে? সংসারে নির্ঝঞ্ঝাটে,—পরম সুখ-শান্তিতে বাস করিতে হইলে, (প্রাতঃস্মরণীয় নয়—) রাত্রিস্মরণীয় শ্রীযুক্ত "ভুঁদে"গোপালের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির সহিত কোনও রকম আলাপ পরিচয় চেনাশুনা না থাকাই ভাল। আলাপ পরিচয় তো দূরের কথা,—পথে যাইতে যাইতে "ভুঁদে"গোপালের সহিত অপরিচিতভাবে যদি অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে একটা না একটা ফ্যাঁসাদ্ অনিবার্য্য। আর দুর্ভাগ্য বলিলাম কেন? দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া এই বৈচিত্র্যময় সংসারে আসিয়া জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি "ভুঁদে"গোপালরূপী অত্যাশ্চর্য্য জীবের কোনও সন্ধান না রাখিয়া—তাহার অদ্ভুত চরিত্র, রহস্যপূর্ণ কার্য্যাবলীর বিষয় অবগত না হইয়া,—জীবনের একটা মহাকর্ত্তব্য-পালন—মহাশিক্ষালাভ অসম্পূর্ণ থাকিবে? যাহা হউক, কোনও ভয় নাই—কিছু ভাবনা নাই। দূরে দূরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীভুঁদেগোপালচরিতামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হউন।

হুঁদেগোপালের আসল নাম কি? শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপালচাঁদ নন্দী! আদিম নিবাস—কলিকাতার সন্নিকটস্থ সাঁই-পাড়া গ্রামে। জাতিতে শঙ্খবণিক,—৺কৃষ্ণদাস নন্দীর পুত্র। দেশে একখান পুরাতন ভাঙ্গা একতলা কোঠাবাড়ী। ৺কৃষ্ণ নন্দী জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য বেতনের চাকুরী করিতেন, তাহাতেই কোনও প্রকারে মোটাভাত মোটাকাপড়ে সংসার চলিত। আর সংসারে তাঁহার ছিলই বা কে? এক স্ত্রী ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণীকে কেষ্ট নন্দীর ভরণপোষণ করিতে হইত না। উপর্য্যুপরি সাতটী পুত্রকন্যা সুতিকাগৃহে নষ্ট হইবার পর—পূর্ণ অমাবস্যারজনীতে কৃষ্ণনন্দীর সহধর্ম্মিণী অষ্টমগর্ভজাত পুত্র,—কলির শ্রীকৃষ্ণের অবতার, মসীবিনিন্দিত—ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ শ্রীগোপালচাঁদকে প্রসব করিলেন! শ্রীগোপালচাঁদও রাত্রি দ্বিপ্রহরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন,—আর ঠিক পরদিন প্রভাতেই কৃষ্ণ নন্দী ভীষণ বিসূচীকারোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

বিধবা জননীর অন্ধের যষ্ঠি—আঁধার ঘরের আলো,—নয়নের মণি, শিবরাত্রির শলিতা হইয়া গোপাল কত যত্নে—কত স্নেহে—কত আদরে দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। জননী অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকে কোলে করিয়া ঘুরিতেন ফিরিতেন। বিধবার দেহে যে অযুতহস্তীর বল ছিল—তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ, গোপাল যখন মাত্র পঞ্চম

বৎসরের শিশু,—তখন তাহার দেহের আকৃতি যেন একটী ছোট-খাটো মৈনাক-পর্ব্বত। সেই "তিলভাণ্ডেশ্বর"—বিগ্রহরূপ বর্দ্ধনশীল পুত্রকে আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত বহন করা কি সামান্য শক্তির পরিচয়? জননী পুত্রকে কখনো ভুলেও "গোপাল" বলিয়া ডাকিতেন না! কখনো "খোকা" বলিতেন—কখনো বা "দুধের গোপাল" বলিয়া ডাকিতেন! পাড়াপ্রতিবাসী যদি কেহ (—গোপ্‌লা বলা তো দূরের কথা—) কখনো "গোপাল" বলিয়া ডাকিত, তাহা হইলে গোপালের জননীর হস্তে তাহার নিস্তার থাকিত না। গোপালের মাকে সকলেই ভয় করিত; আবালবৃদ্ধবনিতা আড়ালে তাহাকে "গুণ্ডো মাগী" বলিয়া ডাকিত। সুতরাং "গুণ্ডো মাগীর" ভয়ে সাঁইপাড়া গ্রামের সমস্ত লোক গোপালকে "দুধের গোপাল" বলিয়া সম্বোধন করিতে বাধ্য হইত। পুত্রের এগারো বারো বৎসর পর্য্যন্ত গোপালের মা বলিতেন, "দুধের গোপাল আমার আঁতুড়ের কচি ছেলে! আহা—বাছার আমার এখনও কথা ফোটেনি গো!" মাতার কাছে যখন থাকিত, তখন বাস্তবিকই গোপাল আধ-আধ মিষ্ট কথা কহিত; ক্ষুধা পাইলে বলিত, "মা—কাবা দে!" মাতার কোলে উঠিবার ইচ্ছা হইলে বলিত,—"মা—কোয়ে!" কিন্তু কাহাকেও গালাগালি করিতে হইলে—দুধের গোপাল তখন সাক্ষাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অথবা শব্দকল্পদ্রুম! বারো তেরো বৎসর বয়স

হইলেও দুধের গোপাল উলঙ্গ অবস্থায় কোমরে একটী রাঙ্গা ঘুন্‌সী বাঁধিয়া বেড়াইত। সেই কালো বরণ,—সেই গুজ্‌রুটী হাতীর ন্যায় দেহের আয়তন,—তাহার উপর পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর বয়স,—এই অবস্থায় "দুধের গোপাল" যখন উলঙ্গ হইয়া খেলা করিয়া বেড়াইত,—গ্রামের লোক সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাস্তবিকই কম্পিত হইত এবং শিহরিয়া উঠিত। চৌদ্দ বছরের "দুধের গোপাল" পাঠশালায় ভবতারণ ভটচাযির কাছে "অ-আ" শিখিতে গেল। গুরুমশাই তো ভয়েই অস্থির! একে "গুণ্ডো মাগী" —তাহার উপর তাঁহার স্বনামখ্যাত "দুধের গোপাল!" কি করেন,—অগত্যা ব্রাহ্মণ গোপালের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

"দুধের গোপালের" দৌরাত্ম্যে পাঠশালার ছাত্রগণ সকলেই অস্থির। কথায় কথায় গোপাল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় সুকুমার-মতি বালকগণকে প্রহার করিত; তাহাদের বই ছিঁড়িয়া দিত,—কাগজ পেন্‌সিল্ কাড়িয়া লইত; নূতন জামা কাপড় কাহারও অঙ্গে দেখিলে—তাহাকে কাদায় কিম্বা মাটীতে গড়াগড়ি খাওয়াইত। পড়িতে বসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বালকগণকে কনুইয়ের গুঁতা মারিত। কাহারও কিছু বলিবার যো নাই,—কেহ সাহস করিয়া গুরুমশায়ের কাছে নালিশ করিত না। গুরুমহাশয়ও সহজে "দুধের গোপালকে" কিছু বলিতেন না; তাহার ভীষণ

অত্যাচারের কথা জানিলে শুনিলেও গুম্ খাইয়া থাকিতেন। ক্রমে বালকদিগের উপর অত্যাচার হইতে হইতে—তাহার ঢেউ আসিয়া স্বয়ং গুরুমশাইকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তিনি স্বহস্তে অতি যত্নে তামাক সাজিয়া—হুঁকা ফিরাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে রাখিয়া কি কার্য্যের জন্য দুই পাঁচ মিনিট এদিক উদিক গিয়াছেন,—"দুধের গোপাল" তাড়াতাড়ি আসিয়া সজোরে দুই টানে ব্রাহ্মণের হুঁকাটী মারিয়া এবং তামাকটী পুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। গুরুমশাই তামাক টানিয়া দেখেন—"একি হোলো? এতটা তামাক এর মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে?" ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই গোপালের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া ভয়ে একবাক্যে বলিল, "কেউ তো হুঁকোয় হাত দেয়নি মশাই!" গোয়ালা আসিয়া গুরুমশাইয়ের দুগ্ধপূর্ণ ঘটী ছাত্রগণের সম্মুখে রাখিয়া গেল,—গোপাল তাহার তিন ভাগ চোঁ-চোঁ করিয়া পান করিয়া তাহাতে পুষ্করিণীর জল মিশাইয়া দুগ্ধের ঘটী পূর্ণ করিয়া রাখিল। গুরুমশাই "অজান্তে" "জোলো-দুধ" পান করিয়া কাহিল হইতে লাগিলেন, "দুধের গোপাল" খাঁটী দুধে গায়ের বল বাড়াইতে লাগিল।

গোপাল এক দিবস কথায় কথায় খেলিতে খেলিতে একটী বালককে এমনি চপেটাঘাত করিল যে বালকটি তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। গুরুমশাই সেদিন আর ক্রোধ সম্বরণ

করিতে পারিলেন না। উত্তমমধ্যম বেত্রাঘাতে সে দিন গোপালের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু দুধের গোপাল কি সে বেত্রাঘাত খাইয়া হজম করিলেন? রাধামাধব! গোপাল প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বড় দিঘীতে গ্রামের সকলে স্নান করিত। বেলা দ্বিপ্রহরে পাঠশালার ছুটীর পর গোপাল একা পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। লাফানো-ঝাঁপানো সাঁতারের চোটে দিঘী তোলপাড়,—মৎস্যকুল ভয়ে মৃতপ্রায়। এমন সময় গুরুমশাই দাঁতন করিতে করিতে কেশবিহীন মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে তথায় স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। গুরুমশাইকে দেখিয়া গোপাল শান্ত ছেলেটীর মত এক পাশে দাঁড়াইয়া স্নান করিতে লাগিল। গুরুমশাই বলিলেন,—"কি রে গোপ্‌লা! এতক্ষণ জলে প'ড়ে কি ক'চ্ছিস্?"

গোপাল বলিল,—"এই সাঁতার শিখ্‌ছিলুন গুরুমশাই!"

গুরুমশাই জানিতেন না যে গোপাল মৎস্যের ন্যায় জলে বিচরণ করিতে পারে! গুরুমশাই বলিলেন,—"দেখিস্—ডুবে যাস্‌নে যেন!"

গোপাল বলিল,—"আজ্ঞে, দেখনা গুরুমশাই—আমি একটু একটু সাঁতার দিতে শিখেছি"—এই বলিয়া শিক্ষানবিসের মতন গুরুমশাইয়ের আশে-পাশে সাঁতার দিতে লাগিল। গুরুমশাই আপন মনে স্নান করিতে লাগিলেন; অকস্মাৎ গোপাল তাঁহাকে

জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"ও গুরুমশাই! ডুবে গেলুম"—বলিয়া তাঁহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া নিজে ডুব দিতে আরম্ভ করিল। গুরুমশাই মহা বিপদে পতিত! সাঁতার জানিলেও সাঁতার দিবার উপায় নাই,—কিম্বা ভাসিবার পন্থা নাই!—কারণ, মত্ত মাতঙ্গবৎ বিশালদেহ গোপাল তাঁহাকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। গোপাল গুরুমশাইকে ধরিয়া একবার ডুবাইতে লাগিল—একবার ভাসাইতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! ভবতারণের ভবলীলা সাঙ্গ হয় বুঝি! গুরুমশাই বেচারার জল খাইয়া পেট ঢাকের মতন হইয়া উঠিল—ক্রমে দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম। দয়ার্দ্র হৃদয় হুঁদের গোপাল গুরুমশায়ের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে বিরত হইল। গুরুমশাই কোন রকমে সাঁতার দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া কাংলা মাছের মতন খাবি খাইতে লাগিলেন। গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ভাগ্যিস্ গুরুমশাই ছিলেন—তাইতে প্রাণটা আমার বাঁচ্‌লো,—নইলে আজ ডুবে মরি'ছিলুম আর কি!"

দেশে কাহারও বাগানে আম, জাম, নীচু, কাঁঠাল ইত্যাদি কোনও ফলমূল থাকিবার যো নাই। কাঠবিড়ালীর মতন গোপাল সড় সড় করিয়া নারিকেল গাছে উঠিয়া নারিকেল পাড়ে; কোমরে দড়ী বাঁধিয়া তালগাছে উঠিয়া রস খায়। শীতকালে ভোরে খেজুরগাছের ভাঁড় খুলিয়া আনিয়া গোপাল টাট্‌কা খেজুর-

রস পান করে। পথে কাহারও ঝি চাকর ময়রার দোকান হইতে খাবার কিনিয়া লইয়া যাইতেছে,—চিলের মতন কোথা হইতে আসিয়া গোপাল ছোঁ মারিয়া খাবার কাড়িয়া লইয়া উধাও হইল। গ্রামের দু' দশজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোক গোপালকে ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহার মাতা "গুণ্ডো মাগী" ক্রন্দনের চোটে গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"ওগো—আমার দুধের গোপালকে মিনি দোষে বাবুরা খুন ক'ল্লে গো! ওগো—আমি গরীব বিধবা ব'লে এমনি কোরে আমার সঙ্গে কি লাগ্‌তে হয় গো! ওরে আমার দুধের গোপাল রে,—ওরে তুই যে কিছু জানিস্‌নে রে বাবা!" বাহিরে মাতা এইরূপ চীৎকারে গ্রামবাসীদের ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল,—ভিতরে অবরুদ্ধ দুধের গোপালও ভীষণ ক্রন্দনের রোল তুলিয়া গৃহস্থকে বধির করিবার উপক্রম করিল। সুতরাং এমন অবস্থায় কে আর গোপালকে শাস্তি দিবে? গোপাল বে-কসুর খালাস পাইয়া নাচিতে নাচিতে মাতার সহিত মিলিত হইল।

কাহারও বাগানের পুকুরে মাছ ধরিতে গেলে—মালী যদি বাধা দিত, তাহা হইলে একদিন সন্ধ্যার পর একখানি এগার ইঞ্চি ইঁটে সেই হতভাগ্য উৎকলবাসীর মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। এই-রূপ অত্যাচারের জন্য একদিন ফাঁড়ির দারোগা মশাই গোপালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পঁচিশ বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সেই

অবধি গোপাল যদি কাহাকেও ভয় করিত—সে এক দারোগা মশাইকে। কিন্তু সুচতুর "দুধের গোপাল" শীঘ্রই সে সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। বেত্রাঘাতের পর ফাঁড়িতে গিয়া দারোগা মশাইকে গোপাল খুব তোয়াজ করিতে আরম্ভ করিল। ছলে-বলে-কৌশলে যেখানে যাহা কিছু আহরণ করিত—তাহার প্রায় তিনভাগ দারোগা মশাইকে ভেট প্রদান করিত। নিজহস্তে দারোগা মশাইকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইত; দারোগা মশাই আহারাদি কিম্বা জলযোগের পর খাটিয়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলে—গোপাল তাহার গা-হাত-পা টিপিয়া দিত। গোপাল দারোগা পত্নীর ফাইফরমাজ খাটিত,—তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিত। সুতরাং অতঃপর দারোগা মশাইকে ভয় করিবার গোপালের আর কোন কারণ রহিল না, এবং ফলে এই হইল, অসুরাবতার গোপালের অত্যাচার দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। যৌবনে উপনীত "দুধের" গোপালকে ক্রমে গ্রামবাসী "দুঁদে গোপাল" বলিয়া নামকরণ করিল।

"দুঁদে" গোপাল বড় রঙ্গপ্রিয় ছিল; লোকজনের সহিত মজা করিতে সে বড় ভালবাসিত। ভিন্ন দেশের কোনও ভদ্র-লোক সাঁইপাড়ায় আসিয়া যদি দুর্ভাগ্যক্রমে গোপালকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"মশাই! অমুক বাবুর বাড়ী কোথায়?" গোপাল অতি ভদ্রতার সহিত বলিত, "আসুন না—আমি সেই দিকেই

যাচ্ছি—," বলিয়া সেই ক্লান্ত শ্রান্ত ভদ্রলোককে দুই ক্রোশ তফাতে লইয়া গিয়া—একজন অপর লোকের বাটী দেখাইয়া দিত। সন্দেহবশে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ্ঞে—এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এদিকে তো তাঁ'র বাড়ী নয়!—" গোপাল বলিত,—"আজ্ঞে না—আপনাকে যে ব'লে দিয়েছে—সে ভুল ব'লেছে; আমারই যে বাড়ীর ঠিক পাশে!"

কোথাও কিছু নাই,—গোপাল একদিন দ্বিপ্রহরে (যখন বাটীর পুরুষমানুষ সকলে কাজকর্ম্মে গিয়াছেন) একটু দূরের ভদ্রলোকদিগের বাটীতে বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগের বাটীর চাকর দাসী অথবা স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া আসিল,—"আগামী রবিবারে সাঁইপাড়ার অমুক বাবুর বাপের সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল! বাবুরা বাড়ী এলে অবশ্য অবশ্য বলিবেন। ছেলেপুলে নিয়ে সকলে যেন নিশ্চয় যান—" ইত্যাদি। যে ভদ্রলোকের নাম করিয়া আসিল—তিনি কিছুই জানেন না; অকস্মাৎ রবিবারে দ্বিপ্রহরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া তাঁহার তো চক্ষুঃস্থির! কে নিমন্ত্রণ করিল—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অভুক্ত ব্রাহ্মণগণ দিবা দ্বিপ্রহরে (যে রূপেই হৌক)—তাঁহার গৃহে অতিথি; ভদ্রলোক কোনও রকমে সন্ধ্যার ভিতর তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া মানরক্ষা করিলেন।

গ্রামস্থ কোনও ভদ্রলোক হয়ত' কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে

লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; "ভুঁদে'গোপাল নিমন্ত্রণের দিবস প্রাতে অথবা তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় নিজ অধীনস্থ জনকয়েক অনুচরবর্গকে লইয়া অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাটীতে গিয়া সংবাদ দিল,—"(যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—) অমুক বাবু হঠাৎ ওলাউঠা রোগে ঘণ্টাখানেক হ'ল মারা গেছেন ; অতএব নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল।" সংবাদ শুনিয়া—তাঁহারা নিমন্ত্রণে গেলেন না ; পরে সেই ভদ্রলোকের সহিত যখন দেখাসাক্ষাৎ হইল—তখন পরস্পর পরস্পরের কথা শুনিয়া অবাক্ ! চতুর গোপাল এ সমস্ত কার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত গোপনে সাধন করিত,—যে, কেহই তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিত না।

গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পশ্চিম প্রদেশে চাকুরী করেন ; প্রতিবেশী প্রবীণ ব্যক্তি মহিম চক্রবর্ত্তীর নাম দিয়া তাঁহার নিকট পত্র গেল,—'গত কল্য তোমার পিতার বসন্তরোগে গঙ্গালাভ হইয়াছে,—তুমি পত্রপাঠমাত্র দেশে চলিয়া আসিবে এবং পিতার অস্থি গঙ্গায় দিয়া পুত্রকার্য্য সম্পন্ন করিবে।' পত্রপাঠমাত্র হারাধনের পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে আসিয়া দেখেন—পিতা সশরীরে জীবিত ! জামাই ষষ্ঠীর দিবস সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে দলবদ্ধ হইয়া বসিয়া ভুঁদে গোপাল,—নানা সুখের আশায় উৎফুল্লহৃদয় জামাতৃগণকে বাটী ফিরাইতে আরম্ভ করিল। কাহাকে বলে—"আহা কি সর্ব্বনাশ হ'ল - এইমাত্র (অমুক বাবু—)

আপনার শ্বশুর মশাই কলেরায় মারা গেলেন! আসুন—আমার বাড়ীতে আজ আহারাদি ক'রে শয়ন ক'র্ব্বেন!" কাহাকে বলে—"এই মাত্র প্লেগে তোমার বড় শালাটী মারা গেল,—" কাহাকে বা বলে—"এই মাত্র তোমার খুড়শ্বশুর মারা গেল—হায়-হায়! মস্ত লোকটা ছিল গো!" সুতরাং এরূপ সংবাদ শুনিলে কে আর তখন সে অবস্থায় "জামাই-ষষ্ঠীর" নিমন্ত্রণ খাইতে শ্বশুরবাড়ী যাইতে চায়? দুই একজন হয়ত বিপদ শুনিয়া সহায়তা করিতে অথবা সহানুভূতি দেখাইতে শ্বশুরালয়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুঁদে গোপাল এবং তাহার অনুচরবর্গের কথাবার্ত্তায় অগত্যা হতাশ-অন্তরে বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

অকস্মাৎ মিত্রপরিবারে মহা কান্নাকাটীর রোল উঠিল। কি ব্যাপার? এই মাত্র সংবাদ আসিয়াছে 'কর্ত্তাবাবুর একমাত্র পুত্র কলিকাতায় কলেজ যাইবার সময় পথে মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লাস হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সংবাদ আসিবামাত্রই মিত্রগোষ্ঠী কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে ছুটিলেন; সেখানে কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। তথা হইতে সকলে মেয়ো হাঁসপাতাল অভিমুখে যাইতে যাইতে পথের মাঝে অকস্মাৎ দেখিলেন, কর্ত্তার ছেলে একজন সমপাঠীর সহিত কথা কহিতে কহিতে কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। দেখিবামাত্র সকলের মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। তাড়াতাড়ী

গ্রামে আসিয়া কান্নাকাটী থামাইতে মিত্রগোষ্ঠীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হইল।

জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেওয়া দায় হইয়া উঠিল। যখনই যে বড়লোকের বাড়ী সম্বন্ধ হয়,—পাকাদেখার পর হুঁদে গোপাল কন্যাকর্ত্তার নিকট কোনও রকমে সংবাদ পাঠায়,—"মশাই —অনেক খরচপত্র কোরে—অমন সুন্দরী মেয়েটীর ভাল ঘরে বিবাহ দিচ্ছেন বটে—তবে একটু গোলযোগ আছে! ছেলেটীর যক্ষ্মার ব্যায়ারাম আছে!" সুতরাং এরূপ নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া কোন্ কন্যার পিতা সহজে এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিতে সম্মত হন?

এইরূপ প্রায় বিংশতি বৎসর ধরিয়া দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া—প্রতাপশালিনী মাতার পরলোকগমনের পর—শ্রীযুক্ত গোপালচাঁদ নন্দী ওরফে "হুঁদে" গোপাল কলিকাতা সহরে আসিয়া ভর করিয়া বসিলেন। কলিকাতায় তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয় মাতুল থাকিত। মামার স্ত্রীপুত্র কেহই নাই—পয়সা কড়িও কিছু ছিল—কিন্তু বড় কৃপণ। গোপালচাঁদ অকস্মাৎ বৃদ্ধ মাতুলের সেবকরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয়ের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া মামার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হইল,—ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। গোপাল মামার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"তোমার ছি-চরণ আশীর্ব্বাদে মাঠাকৃরুণ

আমাকে যা' দিয়ে থুয়ে গেছে, তা'তে আমার তিন পুরুষ ব'সে খেয়ে চ'ল্‌বে। দেশে পুকুর-বাগান-জমী-কোঠাবাড়ী—একা কত ভোগ করি বলুন? একবার চলুন—সব দেখে শুনে এসে—নিজের হাতে নিন্। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই। এই নিন্—হাতখরচার জন্যে একশো টাকা এনেছিলাম—" বলিয়া বৃদ্ধ কৃপণ মাতুল প্রেমচাঁদ মান্নার হাতে দশখানি দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন! বৃদ্ধের দন্তবিহীন মুখে আর হাসি ধরে না। সেই দিন হইতে গোপাল মাতুলের প্রাণের নিধি হইয়া পড়িল। জগদীশ্বরের অপার মহিমা! বৎসর না যাইতে যাইতে বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং উপযুক্ত ভাগিনেয় দুঁদে গোপাল, তাঁহার যাহা কিছু ছিল—সমস্তই অধিকার করিয়া বসিলেন।

সাঁইপাড়ার কেষ্ট নন্দীর পুত্র শৈশবের "দুধের" গোপাল এবং যৌবনের "দুঁদে" গোপাল,—সহরে প্রেমচাঁদের ভাগিনেয়রূপে আবির্ভাব হইয়া কার্য্যে ও নামে "দুঁদে" গোপাল বলিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুপরিচিত হইয়া পড়িল। যে পাড়ার যত নামজাদা বদমায়েস ছিল—মধুগন্ধে অলিকুলের ন্যায় একে একে সকলেই গোপালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে মারামারি, খুনোখুনি, লাঠীবাজী, দাঙ্গা—সেইখানেই দুঁদে গোপাল, নিদেন তাহার দলের কোন না কোন মহাপ্রভু সংশ্লিষ্ট। বৃদ্ধ প্রেমচাঁদের জীবদ্দশাতেই গোপাল শনৈঃ শনৈঃ মাতুলালয়ে

একটি আড্ডা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে আড্ডায় হেন পাপকার্য্য নাই—যাহা হইত না। গোপালের প্রধান বাহাদুরী—সে সহরে আসিয়াই পুলিশের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিয়াছিল। দেশের দারোগা মশাইয়ের ন্যায় হুদোর ইন্‌স্পেক্‌টারটিকে গোপাল সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একটি ব্রাণ্ডির বোতল চাদর ঢাকা দিয়া গোপাল ইন্‌স্পেক্টার বাহাদুরকে উপহার প্রদান করিত। মাঝে মাঝে সঙ্গে করিয়া লইয়া "এ পল্লী সে পল্লীতে" ঘুরাইয়া লইয়া আসিত। পাহারা-ওয়ালা সকলেই ফুঁদে গোপালের অনুগত; কারণ, দু' এক টাকা যাহার যখন আবশ্যক হইত—গোপাল বাবুর নিকট চাহিলেই বিনা সুদে ধার পাওয়া যাইত। কোথাও কোন রকম খুন, জখম, আত্মহত্যা, চুরী, জুয়াচুরী হইলে—পুলিসের অগ্রে গোপাল গিয়া মুরুব্বি দাঁড়াইত এবং যথাসাধ্য পুলিশের জন্য কিছু "ঘুস-ঘাসের" ব্যবস্থা করিয়া তাহার সঙ্গে নিজের উদরেও কিছু নিক্ষেপ করিয়া সকল দিক রক্ষা করিত। চোর, জুয়াচোর, খুনে, জালিয়াৎ ইত্যাদি দায়ে পড়িয়া সর্ব্বাগ্রে ফুঁদে গোপালের শরণাপন্ন হইত। পুলীশে চাকুরীর খাতায় নাম না লিখাইলেও, ফুঁদে গোপাল এক প্রকার পুলীশেরই কর্ম্মচারী ছিল। কোকেন্ ব্যবসায়ীদিগের আশা-ভরসা দিয়া যখনতখন টাকা আদায় করিত এবং আবশ্যক হইলে দলকে দলশুদ্ধ বামালসমেত ধরাইয়া দিয়া আপনি

তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিত। ইহা ছাড়া—গোপালচাঁদ ধোপ্‌দোস্ত কাপড়-জামা পরিধান করিয়া—দিব্য বাবু সাজিয়া—ঘড়ী-ঘড়ীর চেইন্‌ ঝুলাইয়া উকীলপাড়ায় অ্যাটর্ণীদের আফিসে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সন্ধান করিয়া কাপ্তেন ছোক্‌রা বাবুদের আনিয়া হ্যাণ্ডনোট কাটাইত, বাড়ী বিষয় জমিদারী বন্ধক দেওয়াইত। ফুঁদে গোপালের রোজগার অনেক; স্বদেশী হাঙ্গামার সময় গোপাল ভিতরে ভিতরে পুলীশের গোয়েন্দা-গিরি করিত,—কিন্তু প্রকাশ্যে আপনাকে একজন ঘোর স্বদেশী বলিয়া প্রচার করিত। প্রায় সকল স্বদেশীসভায় গোপাল উপস্থিত থাকিত,—বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিত না,—স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের সহিত স্বদেশীগান গাহিত, বিলাতি জিনিষ কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে তিরস্কার—অপমান করিত!

গোপাল বুঝিয়াছিল,—বৃদ্ধ মাতুল আর কয়দিনই বা বাঁচিবেন? সুতরাং প্রাণপণে তাঁহার সেবা-যত্ন-শুশ্রূষা করিত! কৃপণ প্রেমচাঁদ নেশার মধ্যে একটু আফিং খাইতেন,—কিন্তু এক ছটাক দুগ্ধ কখনও পান করিতেন না। গোপাল বৃদ্ধ মাতুলের জন্য টাকায় তিন সের খাঁটী দুধের ব্যবস্থা করিল; এ বেলা আধ সের,—ও বেলা আধ সের। প্রতিদিন ভাল ভাল সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়া পেট পুরিয়া মামাকে আহার করাইত। বৃদ্ধ জীবনে কখনও ভাল ক্ষীর, রাবড়ী, মালাই, সন্দেশ প্রভৃতি

আস্বাদন করেন নাই। পুত্রোপম ভাগিনেয়ের কল্যাণে এই সমস্ত আহার করিয়া—বৃদ্ধের পেটের পীড়া জন্মিল। প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"বাবা গোপাল! একবার দীনু ক'ব্‌রেজকে খবর দে!" গোপাল বলিল,—"ক'ব্‌রেজ কি হবে মামা? তোমার এ বয়েসে কি ওষুধ খেলে রোগ সার্‌বে? নাইতে খেতেই আফিংয়ের ধাতে সব রোগ আরাম হবে! আর, ক'ব্‌রেজ এসে তোমার আফিং বন্ধ ক'র্ব্বে—খাওয়া দাওয়া বন্ধ ক'র্ব্বে—তা' হ'লে তুমি কি একদিনও বাঁচ্‌বে মামা?" বৃদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে রোগ বাড়িতে লাগিল,—প্রেমচাঁদ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। গোপালকে দেখিলেই বৃদ্ধ প্রাণের মায়ায় ক্ষীণস্বরে বলিতেন,—"বাবা! এইবার একবার দীনুকে—নিদেন—মণি ডাক্তারকে ডেকে আন্ রে—"! গোপাল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিত,—"ডাক্তার-বদ্যি আব কেন মামা! হরিনাম কর-হরিনাম কর!" বৃদ্ধ যখন উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন—গোপাল তখন বাড়ীতে আড্ডা জম্‌কাইয়া দিল। দিবারাত্রি অনুচরবর্গকে লইয়া মদের বোতল খুলিয়া হৈ-হৈ-রৈ-রৈ আরম্ভ করিল। মাতুলের কাছে দিনান্তেও একবার যাইবার গোপালের অবসর রহিল না। এমন কি, বৃদ্ধের আফিং খাওয়া হয় না,—তৃষ্ণার সময় এক পাত্র জলও হাতের কাছে পায় না। গোপাল একদিন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া টলিতে টলিতে

রুগ্ন মাতুলের নিকট আসিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"লোহার সিন্দুকের চাবিটা দেখি মামা।" বৃদ্ধ কাতরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা গোপাল! একবার ক'বরেজকে ডেকে আন্‌লি নি বাবা—আমি যে মরি!" "হরিনাম কর মামা—হরিনাম কর! দাও—চাবিটা দাও!" বলিয়া গোপাল বৃদ্ধের কোমরের ঘুন্‌সী হইতে লোহার সিন্দুক, আল্‌মারি, বাক্‌স্‌-প্যাট্‌রার চাবিগুলি খুলিতে আরম্ভ করিল! বৃদ্ধ সজলনেত্রে বলিল,—"ওরে ওরে—লাগে রে! ওরে—ও কি করিস্‌!" "হরি-নাম কর মামা—হরি হরি বল! এদিকে আর চেও না—খালি হরি হরি কর।" বলিতে বলিতে চাবিগুলি লইয়া সেই কক্ষস্থিত সিন্ধুকাদি খুলিয়া সেই কৃপণ বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ মান্নার অনাহারসঞ্চিত নগদ টাকা কড়ি—অলঙ্কারাদি হস্তগত করিতে আরম্ভ করিল। নিরুপায় শক্তিশূন্য কৃপণ বৃদ্ধের এইবার যথার্থই যম-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল;—চক্ষের সম্মুখে আদরের ভাগিনেয় যথাসর্ব্বস্ব লইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ আকুলপ্রাণে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্ষীণ-কম্পিতকণ্ঠে এক একবার ডাকিতে লাগিলেন,—"অ গোপাল!"

গোপাল বৃদ্ধের টাকা গণিতে গণিতে এক একবার বলিতে লাগিল,—"হরি হরি বল মামা—হরি হরি বল!"

সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া গোপাল চাবিগুলি যত্নপূর্ব্বক নিজের ঘুন্‌সিতে রাখিয়া দিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল।

বৃদ্ধ তখনও সজলনয়নে কাতরদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন। গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এই নাও, জলের ঘটী কাছে রেখে গেলুম—একটু কষ্ট করে নিয়ে খেয়ো মামা! এইবার তুমিও নিশ্চিন্ত—আমিও নিশ্চিন্ত! এখন শুয়ে শুয়ে কেবল হরি হরি কর মামা—হরি হরি কর!" সেইদিন গোপাল বাড়াতে আমোদ-প্রমোদের রাজসূয় যজ্ঞ করিল। চীৎকারে পাড়ার লোক সমস্ত রাত্রি কেহ নিদ্রা যাইতে পারিল না। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গোপাল মাতুলের নিকট গিয়া দেখিল,—বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ অনন্তশয়নে শয়ন করিয়া কাষ্ঠখণ্ডবৎ হিমাঙ্গ শিবনেত্র হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নিদ্রাগত অনুচরবর্গকে তুলিয়া গোপাল বলিল, "চল্—মামা ব্যাটার সৎকার ক'রে আসি!" সকলে এক বাক্যে বলিল,—"গোপাল-দা! বড় খোঁয়াড়ি লেগেছে বাবা—এক্টু এক্টু ব্যবস্থা না ক'ল্লে তো উঠ্‌তে পাচ্ছি না!"

গোপাল বলিল,—"চল্—চল্, রাস্তায় যেতে যেতে হবে! এই দশটী টাকা মামার ছিল—এইতেই হবে না?"

সকলে মহানন্দে বলিল,—"উঃ—যথেষ্ট!" একজন খাট আনিয়া উপস্থিত হইল। যোগাড়-যন্ত্র করিয়া শব লইয়া বাহির হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। প্রায় সাত আট জন মিলিয়া মড়া লইয়া কাশীমিত্রের ঘাটে সৎকার করিতে চলিল। খানিক দূর

গিয়া খাট ভূতলে রাখিয়া দুই বোতল মদ্য কিনিয়া সবন্ধু গোপাল পথের এক পার্শ্বে বসিয়া খোঁয়াড়ী কাটাইতে স্থরু করিলেন। একজন বলিল,—"গোপাল দা! কিছু পয়সা দাও বাবা—বড় পেট জ্ব'লছে—কিছু চাটের ব্যবস্থা করি!" গোপালের নিকট হইতে আট গণ্ডা পয়সা লইয়া সে ব্যক্তি সম্মুখের চাটের দোকান হইতে-হাঁসের ডিমভাজা, কাঁকড়া চচ্চড়ী,—ঝাল দেওয়া ইলিশ মাছ ইত্যাদি লইয়া আসিল। গোপাল বলিল,—"ওগুলো খেতে খেতে যাই চল;—এখানে বসে মিছে দেরী ক'রে কাজ নেই!" এই বলিয়া মড়ার বিছানার নীচে সেই সমস্ত চাট্ রাখিয়া—সকলে খাইতে খাইতে ঘাট-অভিমুখে চলিল। আবার আধ ঘণ্টা আন্দাজ বহন করিয়া শুঁড়িখানার সম্মুখে বসিয়া মদ্য কিনিয়া সকলে মহানন্দে পান করিল। এইরূপে সকলে কাশীমিত্রের ঘাটে পৌছিল। তখন সকলেই প্রায় "মুদ্দোর" হইয়া পড়িবার উপক্রম। শ্মশানে খাট রাখিয়া পুনরায় সকলে মদ্যপানে নিযুক্ত হইল। সৎকারের কথা কাহারও মনে নাই। সকলেই বেহুঁস। একজন মুদ্দোফরাস আসিয়া বলিল,—"আরে বাবু! ভর্ রাত দারু পিকে মাতোয়ালা হো গিয়া,—মুদ্দোর জ্বালায় গা কি নেহি?" গোপালের তখন চৈতন্যের উদ্রেক হইল। তখন রাত্রি প্রায় অবসান। চিতা সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া দুঁদে গোপাল দেখিল, দশ টাকার মধ্যে সাত আনা পয়সা

মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। হায়—হায়—এখন উপায়? সঙ্গীগণ বলিল,—"চল দাদা—বাড়ী থেকে ফের টাকা নিয়ে আস্‌বে!' গোপাল বলিল, "আর টাকা কোথায় রে শালা! মদ খেয়ে তোরা সব ওড়ালি—আবার আমি দেবো টাকা?" একজন বিজ্ঞের মত বলিল,—"ভাব্‌ছ কেন গোপাল দা! চল—মিনি খরচায় তোমার মামার সৎকার করে দিচ্ছি!" এই বলিয়া সকলে গোপনে কি পরামর্শ করিল। সুচতুর গোপাল ঘাটের রেজিষ্ট্রার্‌কে বলিয়া কহিয়া—কৃপণ মাতুল প্রেমচাঁদ মান্নার শবদেহ কোম্পানীর "গাদার মড়ার" সহিত জ্বালাইয়া দিয়া মহানন্দে অনুচরবর্গের সহিত ভীষণ "হরিবোল" রবে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

আমরাও এইখানে "হরি হরি" বলিয়া শ্রীমান "ছুঁদেগোপাল চরিত" পালা শেষ করিলাম।

সাঁই মশাই

মধুসূদন ঘোষালকে পাড়ার সকলে সাঁই মশাই বলিয়া ডাকিত। শুধু নিজ পাড়ায় নয়, সহরের সর্ব্বত্র তিনি ঐ নামেই সুপরিচিত। তাঁহার বাড়ীর পাশে গিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—"মধুসূদন ঘোষালের বাড়ী কোথায়,—" তাহা হইলে কেহই বলিতে পারিত না। যতক্ষণ না "সাঁই মশাই" বলিয়া তিনি উল্লিখিত হইতেন—ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।

এ হেন সাঁই মশাইয়ের এইরূপ অদ্ভুত রকমের উপাধিলাভের একটা গুরুতর কারণ ছিল। মধুসূদন শৈশবকাল হইতেই সকল কার্য্যে সকল দলে অগ্রণী হইয়া বসিতেন। বোধ হয় তিনি কখনও—

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তি স্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে—"

এই হিতোপদেশ কাহারও নিকট শোনেন নাই—অথবা বিষ্ণু শর্ম্মার গ্রন্থেও পাঠ করেন নাই। সকল কার্য্যেই তিনি "মাথা" অর্থাৎ "মুরুব্বি" হইতে যাইতেন বটে,—কিন্তু কিছুতেই

কখনো কৃতকার্য্য হইতেন না। যে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, সে কার্য্যে একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিত। বিভ্রাট হউক্—কোন ফললাভ নাই হউক,—মধুসূদন ঘোষালকে কিন্তু সকল কার্য্যেই "চাঁই" হইতে হইবে। সুতরাং সকলে তাঁহাকে উপহাস করিয়া "চাঁই মশাই" বলিয়া ডাকিত। ক্রমে "চাঁই" হইতে তিনি "সাঁই" হইলেন—ক্রমে পৈতৃক নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

মধুসূদনের পিতা একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন; তাঁহার-আদি নিবাস কলিকাতায় নহে। খুলনা জেলায় রামরতনপুর গ্রামে ঘোষাল বংশ বহুকাল যাবৎ বিরাজ করিতেছেন। যজমান শিষ্যের বাড়ীতে পৌরহিত্য করাই ঘোষালবংশীয়দিগের পেশা। একটু আধটু সংস্কৃত হয়ত কাহারও কাহারও জানা ছিল; কিন্তু মোটের উপর সাড়ে পোনোর আনা ঘোষালবংশাবতংসগণের সহিত মা সরস্বতীর ভীষণ বাদ-বিসম্বাদ ছিল। এমন কি কাহারও কাহারও হাতে খড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই; সুতরাং বর্ণ-পরিচয়বিহীন এরূপ ব্রাহ্মণসন্তান অগত্যা জীবিকার্জ্জনের জন্য পৌরহিত্যব্যবসাই বা কিরূপে করিবেন? তাঁহারা শেষে হাতে হাতে "বেড়ী-খোন্তা" লইয়া রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন।

মধুসূদনের পিতা কয়েক বৎসর টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কথকতা অভ্যাস করিলেন। তাঁহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল;

সুতরাং, অতি অল্পদিনেই তিনি স্বদেশে একজন বিখ্যাত কথক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হয়? দেশে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জনের তেমন সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি একমাত্র পুত্র মধুসূদনকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অতি অল্পবয়সেই মধুসূদনের মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং মধুসূদন পিতার অত্যন্ত আদরের পুত্র ছিলেন। কথকতা করিয়া তাঁহার পিতা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ঘোষাল ঠাকুর মাতৃহীন একমাত্র প্রিয় পুত্রের কোন সাধই অপূর্ণ রাখিতেন না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া—বৃদ্ধ প্রাতঃকৃত্য সমাপনাদির পূর্ব্বে স্বয়ং গোয়ালাবাড়ী হইতে খাঁটি দুগ্ধ আনিয়া মধুসূদনকে পান করাইতেন। প্রতিদিন বাজার হইতে ভাল ভাল মৎস্য ফলমূলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া যত্নপূর্ব্বক মধুসূদনকে আহারাদি করাইতেন। বৃদ্ধ নিজে নগ্নপদে উত্তরীয় স্কন্ধে থান কাপড় পরিধানে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন—কিন্তু পুত্র মধুসূদন বেল্‌দার পাঞ্জাবী—পম্প্‌ সু—দিশি কালাপাড় ধুতি—সিল্কের চাদর ইত্যাদির দ্বারা অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। পিতার মুণ্ডিতমস্তক,—তাহাতে তিন ইঞ্চি "টিকি" দোদুল্যমান ছিল; মধুসূদন হেয়ার-কাটারের বাড়ী হইতে এক টাকা খরচ করিয়া (সম্মুখে চৌদ্দ আনা—পশ্চাতে দুই আনা) ছোট বড় চুল কাটিয়া—তাহাতে লম্বা তেড়ী কাটিয়া বেড়াইতেন।

মধুসূদন ইংরাজি স্কুলে পড়িতেন। কি পড়িতেন তাহা তিনিই জানেন ;—তবে প্রত্যহ বই বগ'লে,—দোক্তাপান গালে,—সিগারেট মুখে স্কুলে যাইতেন বটে। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষাশেষে বৃদ্ধ ঘোষাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে গিয়া—আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া হস্ত প্রসারিত পূর্ব্বক প্রিয়-পুত্রের "ক্লাশ্-প্রোমোশান্" ভিক্ষা করিতেন। কথক ঠাকুরকে সকলে ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত ; সুতরাং মধুসূদন বৎসর বৎসর নির্ব্বিবাদে ক্লাশ-প্রোমোশান পাইতেন। যথাসময়ে প্রিয়-পুত্রের বিবাহ দিয়া—সুন্দরী পুত্রবধূ গৃহে আনয়ন করিয়া কথক ঠাকুর পিতৃ-কর্ত্তব্যপালন করিলেন। মধুসূদন নববধূ পাইয়া আর স্কুলে যাইলেন না। পিতা-পুত্রে বহুদিন যাবৎ দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। কলিকাতায় একখানি একতলা বাটী ক্রয় করিয়া সকলে বাস করিতে লাগিলেন। যথাকালে একমাত্র পুত্রের হস্ত-প্রদত্ত অগ্নি মুখে লইয়া বৃদ্ধ কথক ঠাকুর কালের কবলে নিপতিত হইলেন। তদবধি মধুসূদন নিজসংসারে সর্ব্বে-সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।

মধুসূদনকে স্কুলে সকলে "বাঙ্গাল" বলিত। যদিও বাঙ্গালের মতন তাঁহার কথাবার্ত্তা ছিলনা,—কিন্তু তাঁহার পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়া ছেলেরা তাঁহাকে ঐ নামে উপহাস করিয়া ডাকিত। দারুণ গ্রীষ্মকালে মধুসূদন কাশ্মীয়ার ফুল্-ষ্টকিং পরিধান করিয়া

বেড়াইতেন। ফাল্গুন মাসের শেষে গরম কোট্—তাহার উপর শালের জোড়া ব্যবহার করিতেন। কোন সভায় যাইতে হইলে মধুস্থদন রঙ্গীন শিল্কের পাঞ্জাবী, চাদর—এমন কি "রেইন্-বো" রংএর রুমাল পর্য্যন্ত গলায় বাঁধিয়া বাহার দিতেন। সেই রঙ্গীন বেশ দেখিয়া লোকে হাসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত,—"বাঙ্গালটা খেপেছে রে!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল কার্য্যেই মধুস্থদন যোগদান করিতেন। কোথাও দলাদলি হইয়াছে,—মধুস্থদন সর্ব্বাগ্রে গিয়া তাহাদের মধ্যে "মোড়লি" আরম্ভ করিলেন এবং যে দল অধিক বলবান, সেই দলের "চাঁই" হইয়া মহোৎসাহে বিবাদকার্য্যটা বেশ পাকাইয়া তুলিতেন; তাহাতে ফল এই হইত,—শত্রুপক্ষীয়েরা সকলকে ত্যাগ করিয়া মধুস্থদনকে গিয়া ধরিত,—তাঁহার উপরই নিজ নিজ আক্রোশ মিটাইত।

কলিকাতার বন্দরে একবার একখানি খুব বৃহৎ যুদ্ধের জাহাজ (Man-of-war) আসিয়াছিল। সহরে সকল লোক—বিশেষতঃ স্কুলেব ছেলেরা দলে দলে সেই জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। মধুস্থদনও তাঁহার স্কুলের বালকবৃন্দের সহিত যুদ্ধজাহাজ দেখিতে বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুস্থদন বালকগণকে বলিলেন,—"তোমরা এইখানে দাঁড়াও—আমি একবার জাহাজে গিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি যে আমরা এখন দেখিতে পাইব

কি না !” বন্দুকধারী গোরা-প্রহরী দেখিয়া বালকগণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিল ; সুতরাং মধুস্থূদনের প্রস্তাবে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া —একটু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ মধুস্থূদন—কোমর বাঁধিয়া বুক ফুলাইয়া জেটী পার হইয়া সাহেবের নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কম্পিত-দেহে—কম্পিত-স্বরে—করজোড়ে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—“Sir, Sir—My Lord—we go—ship see ?” অর্থাৎ “ধর্ম্মবতার ! আমরা কি জাহাজ দেখিতে পাইব ?” সাহেব মধুস্থূদনের কথা আন্দাজে বুঝিতে পারিয়া কি উত্তর করিলেন,—শুনিবামাত্রই মধুস্থূদন ঊর্দ্ধশ্বাসে লাফাইতে লাফাইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া সঙ্গীদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত ভীত হইয়া বালকগণকে ঠেলিয়া গৃহাভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মধুস্থূদনের ভাব দেখিয়া বালকগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিল,—কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিল না—ব্যাপার কি. কিছুদূরে আসিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সকলে একস্থানে বসিয়া মধুস্থূদনকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হে মধু ! সাহেব কি ব’ল্লে ?”

মধুস্থূদন বলিলেন,—“সর্ব্বনাশ ভাই ! বড় ভাগ্যে প্রাণরক্ষা করেছি !”

বালকগণ সভয়ে বলিল—“কেন ? কেন ?”

মধু। আমি গিয়ে যেই জিজ্ঞাসা কল্লুম,—"সাহেব! আমরা কি জাহাজ দেখ্‌তে পাব!" সাহেব আমার কথা শুনে রেগে মুখ লাল ক'রে বল্লে "দাঁড়াও—তোমাদের জন্যে কামান ঠাস্‌ছে—এখুনি সকলকে তোপে উড়িয়ে দেবো!" এই বলিয়া মধুসূদন আবার দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিয়াছিল—তাহারা এ কথার সত্যাসত্য কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। কিন্তু সকলে তো আর মধুসূদনের ন্যায় বুদ্ধিমান নহে: অধিকাংশ বালক তাঁহার কথায় প্রত্যয় না করিয়া—পুনরায় জাহাজ দেখিতে বন্দরাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালকগণ পুনরায় তথায় উপনীত হইয়া দেখিল, একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক জাহাজ দেখিতে যাইতেছেন। তাহারা তাঁহাকে মধুসূদনের কথা সমস্ত বলাতে তিনি তো হাসিয়াই আকুল এবং বালকগণকে সঙ্গে লইয়া সেই বন্দুকধারী গোরা-প্রহরীকে জাহাজ দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাহেব বলিল,—"Come on Thursday—Babu!" ভদ্রলোক তখন বালকগণকে বুঝাইয়া দিলেন—যে "সাহেব কামান ঠাস্‌ছে" বলেননি! ব'ল্লেন "কাম্ অন্ থার্স্‌ডে"—অর্থাৎ "বৃহস্পতিবারে এসো!" শুনিয়া বালকগণও হাসিয়া আকুল!

• মধুসূদনের পাড়ায় একটী ভদ্রসন্তান-গঠিত সখের থিয়েটারের

দল ছিল। মধুসূদন সেই দলে গিয়া যোগদান করিলেন এবং লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া চাঁদা আদায় করা কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া অভিনয়রাত্রে কুলিদিগের সহিত মাচায় উঠিয়া সিন্ খাটানো কার্য্য পর্য্যন্ত বাদ দিতেন না। মধুসূদনের সাধ হইল,—একটী ভূমিকায় সাজিয়া অভিনয় করেন। কিন্তু—রঙ্গমঞ্চে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো বক্তৃতা করেন নাই; সুতরাং অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে বড় (Part) ভূমিকায় নামাইতে সাহস করিলেন না। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া—"বৃষকেতু" নাটকে মধুসূদনকে—একটী 'দূতের" ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেওয়া হইল। বক্তৃতা মাত্র এক লাইন। রাজসভায় গিয়া রাজাকে সংবাদ দিতে হইবে—"মহারাজ! হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি মাংস নাই!" মধুসূদন মহানন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে সেই বক্তৃতাটুকু কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। পথে ঘাটে হাটে মাঠে, শয়নে স্বপনে জাগরণে সেই অংশটুকু—(হাঁড়ী নাবিয়ে দেখি মাংস নেই—) ক্রমাগত অভ্যাস করিতে লাগিলেন। যেখানে পাঁচজন বসিয়া আছে—তাহাদের শুনাইয়া গর্ব্বের সহিত ব'লে—"এবার আমি নাটক অভিনয় ক'চ্ছি! একবার কি কাণ্ড কারখানা করি—দেখিস্—" বলিয়া হাত মুখ নাড়িয়া মাথা চালিয়া বক্তৃতা করিলেন—"মহারাজ! হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি মাংস নেই!" অভিনয়রাত্রে সিনের পাশে দাঁড়াইয়া পোষাকপরিচ্ছদ আঁটিয়া প্রস্তুত হইয়া তখনও আওড়া-

ইতে লাগিলেন,—"মহারাজ! হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি মাংস নাই!" ক্রমে তাঁহার আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হইল। রঙ্গমঞ্চে বাহির হইবার পূর্ব্বে মধুসূদনের মুখ শুকাইয়া আসিল,—পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল;—কিন্তু "চাই অর্থাৎ সাঁই মশাই" কিছুতেই ভয় পাইবার লোক নহেন। যথাসময়ে তাড়াতাড়ি রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, —"মহারাজ! মাংস নাবিয়ে দেখি হাঁড়ি নেই!" দর্শকবৃন্দ হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মধুসূদন ভাবিলেন—"বড্ড বক্তৃতা ক'রেছি!" পুনরায় চতুর্গুণ উৎসাহে বলিলেন,—"মহারাজ! মাংস নাবিয়ে দেখি—হাঁড়ি নেই!" দর্শকবৃন্দ যত হাসে—হাততালি দেয়—মধুসূদনও মহাস্ফূর্ত্তিতে গলা ছাড়িয়া তত বলে,—"মহারাজ! মাংস নাবিয়ে দেখি—হাঁড়ি নেই!" শেষে "মহারাজ" রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া—স্বয়ং উঠিয়া গলা ধরিয়া দূতকে ধাক্কা মারিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। সজ্জাগৃহের দলের নিকট মধুসূদনের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা রহিল না।

পৈতৃক কিছু অর্থ ছিল। উদ্যোগী পুরুষসিংহ মধুসূদন ভাবিলেন—"বাপের টাকায় শুধু বসিয়া খাওয়া উচিত নয়! বাবাও রোজগার করিয়াছেন—আমিও রোজগার করিব!" এই ভাবিয়া মধুসূদন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কি ব্যবসা করিবেন—একথা যদি কেহ জানিতে চাহেন—তাঁহার

প্রতি এই বক্তব্য যে, পৃথিবীতে হেন ব্যবসা নাই—যাহা মধুসূদন চেষ্টা করেন নাই। জুতা-সেলাই ব্যবসা হইতে শূকরের ব্যবসা পর্য্যন্ত মধুসূদন (ব্রাহ্মণসন্তান হইলেও) করিয়া দেখিলেন; কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলতঃ—পিতার নগদ অর্থ যাহা কিছু ছিল,—তাহাতো নষ্ট হইলই;—উপরন্তু মধুসূদন বিষম ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

আর হিঁদুয়ানি ভাল লাগেনা,—হিঁদুয়ানীতে তেমন স্থখ নাই বলিয়া মধুস্থদন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হইয়া চুপি-চুপি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। কথক ঠাকুরের পুত্র; সুতরাং "বাপ্‌কো বেটা—শিপাহীকো ঘোঁড়া—কূছ্ নেই তো থোড়া থোড়া" ভাবিয়া মধুস্থদন সঙ্গীত অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত যত শিক্ষা হউক্ নাই হউক্—তাঁহার মুদ্রাদোষ এবং ভীষণ আওয়াজে লোকজন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপর আর এক বিষম ব্যাপার! মধুস্থদন বহুদিন হইতে কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার কাব্য কখনো কোন মাসিক পত্রিকায় অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই এবং তাঁহার রচনা শুনিয়া কোন মূর্খ চাষা পর্য্যন্ত কখনও তুষ্ট হয় নাই—তথাপি মধুস্থদন আপনাকে একজন মস্ত কবি ঠাওরাইয়া ফেলিলেন। মধুস্থদন ব্রাহ্মসভায় খুব মুরুব্বি হইয়া চক্ষু মুদিয়া

বসিতেন এবং তানপুরা লইয়া গম্ভীরভাবে স্বরচিত সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন—

"তব গভীর অতল প্রেমকূপে আমি হে
মণ্ডূকপ্রায়।
লম্ফঝম্ফ করি,—পাড়ে পাড়ে ঘুরি—
মধ্যস্থলে যেতে হৃদয় শুকায়।
দীর্ঘ প্রেমরজ্জুতে বাঁধি প্রেমপাত্র,
কত প্রেমিক বারি তোলে অহোরাত্র,
দেখে ঈর্ষ্যায় দহে মম গাত্র,—
অনিদ্রায় রাত্র কাটে বিছানায়।"

সঙ্গীত শুনিয়া অনেকেই মনে মনে বিরক্ত হইতেন,—কিন্তু মধুসূদন,—আচার্য্য মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। এখন হইতে মধুসূদন "সাঁই মশাই" খেতাব পাইলেন। কেহ তাঁহাকে "মধুসূদন" অথবা "ঘোষাল মশাই" বলিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দিতেন না। লোকপরম্পরায় শুনা যায়—আচার্য্যমহাশয় "সাঁই মশাইয়ের" নিকট হইতে অনেক অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ক্রমে ঋণের দায়ে "সাঁই মশাই" আপনার পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু বিক্রয় করিলেন। এক্ষণে জীবিকার্জ্জনের উপায় কি? "সাঁই মশাই" আচার্য্য মহাশয়কে "ধরিয়া করিয়া" কোন একটী মাসিক পত্রিকার

সহকারী সম্পাদক হইয়া পড়িলেন। এইবার সাঁই মশাইয়ের মনের বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল। নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে "সাঁই মশাই" কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সম্পাদককে শাসাইতে লাগিলেন—"এরূপ ছেলেমানুষি যদি করেন—তাহা হইলে আমরা আপনার কাগজের আর গ্রাহক থাকিব না।" সম্পাদক "সাঁই মশাই"কে কবিতা লিখিতে বারণ করিলেন। কিন্তু সে কথা শোনে কে? আচার্য্য মহাশয়ের ভরসায় "সাঁই মশাই" কাব্যের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সাঁই মশাই ছোট কবিতা লিখিয়া ক্ষান্ত হইলেন না; এইবার রঘুবংশের ন্যায় একখানি বৃহৎ কাব্য মাসিক-পত্রিকায় ক্রমশঃ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার মুখবন্ধে লিখিলেন,—

খুবুঁচু গাছের ফল পাড়িবার তরে,
কোনও বেঁটে করে যদি খেঁটে উত্তোলন।
তা'রে দেখে লোকে যথা টিট্‌কারি মারে,
আমার দুর্দ্দশা বুঝি হোলো বা তেমন।
মূর্খ আমি—তবু সাধ হইল আমার,
চোদ্দ মিলাইয়ে পদ্দ করিব লিখন—
এর চেয়ে ধাষ্টামি বা কিবা আছে আর,
বেঁটের নার্কোল-পাড়া হয় কি কখন?"

ভূমিকায় এইরূপ মহাকাব্যের সূত্রপাত করিয়া সাঁই মশাই ভাবিলেন, "এইবার আমি যথার্থ ই কবি কালিদাস হইয়া পড়িলাম, —আর আমায় পায় কে ?" যথাসময়ে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইলে গ্রাহকগণ সে কাব্য পাঠ করিয়া দলে দলে আসিয়া এবং রাশি রাশি পত্র দিয়া গ্রাহক নাম কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সংবাদপত্রে তাহার তীব্র সমালোচনা হইতে লাগিল এবং লেখক ও সম্পাদককে সকলে যথেচ্ছা গালাগালি উপহাস করিতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সাঁই মশাইকে বলিলেন,—"এ সব আপনার হঁচ্ছে কি ?"

সাঁই। "কেন ?"

সম্পাদক। "এ কি লিখেছেন ? এর তো দেখ্ছি মাথাও নেই—মুণ্ডুও নেই !"

সাঁই। "আপনি যদি বুঝ্তে না পারেন,—সেটা কি আমার দোষ ?"

সম্পাদক মহাশয় ভয়ঙ্কর চটিলেন ; কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের খাতিরে তখনও চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন,—"আমি না হয় মূর্খ—গ্রাহকগণও সকলে কি তাই !"

সাঁই। "আলবৎ ! রঘুবংশের ভাব কটা লোকে বোঝে ? আপনি পড়েছেন কি—

"মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

মানে বোঝেন কি? আমার ভূমিকাটী অবিকল তারই অনুবাদ।"

সম্পা। "তা যেন বুঝ্‌লুম—কিন্তু "খুবুঁচু" কথাটার মানে কি? এটা কোন্ দিশি কথা? ফ্রেঞ্চ্ না জার্ম্মান্?"

সাঁই। "ছিঃ—ছিঃ—আপনি দেখছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকাটাও পড়েন নি। "খুবুঁচু"—বাংলা কথা; "খুঁব" ছিল "উঁচু" = খুবুঁচু। এটা আবার আপ্‌নাকে বোঝাতে হ'চ্ছে! হায়—হায়—এমন মূর্খ সম্পাদকের হাতে কাগজখানা প'ড়ে মাটী হ'তে ব'সেছে!"

সকল ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! সাঁই মশাইয়ের স্পর্দ্ধা ও আচরণ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না। আর আচার্য্য মহাশয়ের খাতির রক্ষা হইল না! তিনি তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সাঁই মহাশয়ের দুটী কর্ণ ধরিয়া একেবারে সদর রাস্তা পৌঁছাইয়া দিয়া ভিতর হইতে কার্য্যালয়ের অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন।

অগত্যা উপায়বিহীন সাঁই মশাই খুলনা জেলায় নিজগ্রাম রামরতনপুরে আসিয়া পৈতৃক পেশা পৌরহিত্য অবলম্বন করিলেন।

সমাপ্ত